বুভুক্ষা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬
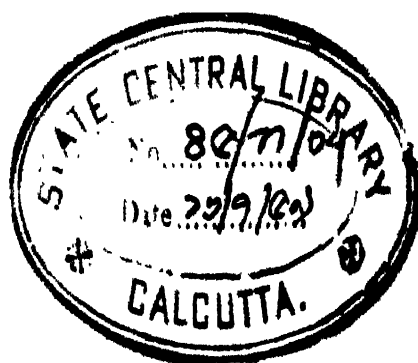
তৃতীয় সংস্করণ

১৩৫৭, ভাদ্র

মূল্য চার টাকা মাত্র

ডি. এম. লাইব্রেরি হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। শ্যামসুন্দর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচ্ছদ পট চিত্রিত।

'কল্লোল'-এর বন্ধুদের

উদ্দেশ্যে—

অনুবাদকের কথা

'বুভুক্ষা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালে। অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়, কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে পুনঃপ্রকাশ এতদিন সম্ভব হয় নি।

'বুভুক্ষা' বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ক্নুট হামসুনের 'সুল্‌ট্‌' বা 'হাঙ্গার'-এর অনুবাদ। অনুবাদ-সাহিত্য আমাদের দেশে খুব বেশি সমাদর এর আগে পায় নি। এর মূল কারণ, আমার মনে হয়, অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব কিংবা ভাষা—এ দু-এর একটা ধারাকে অবলম্বন করে। তার ফলে মূল সাহিত্যের সৌরভ ও সজীবতা অনুবাদ-সাহিত্যে বজায় থাকে না। 'বুভুক্ষা'য় ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

'বুভুক্ষা'র পরিচয় সম্পর্কে কোন কথা বলা যে নিষ্প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে যে, বর্তমান জগতে আজ যে সমস্যা উদগ্র আগুনের মত জ্বলে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, 'বুভুক্ষা' তারই বাস্তব রূপ। 'বুভুক্ষা'র এই বাস্তবতা কল্পনার বিলাস নয়, মানুষের বুকে যে দুর্বার ক্ষুধা তিলে তিলে জ্বালিয়ে তুলেছে পৃথিবীর শ্মশানে জীবন্তের চিতা, 'বুভুক্ষা' সেই দুর্বার ক্ষুধার নির্মম ইতিহাস।

'বুভুক্ষা' প্রকাশের অধিকার যাঁরা দিয়েছেন, এ সুযোগে তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি—বিশেষ ক'রে শ্রদ্ধাভাজন হামসুন ও তাঁর প্রকাশক কোপেন-হেগেন-এর প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী গিল্‌ডেন্‌ডাল্কে ভোগান্‌ডেল্‌ নয়ডিস্ক ফর্‌লাগ-কে।

প্রচ্ছদপট এবারে এঁকেছেন স্নেহাস্পদ আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

১১ই ভাদ্র,
১৩৫২ সাল

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৮৮ সাল। 'কোপেনহেগেন পলিটিকান' পত্রের বৃহৎ আপিসের দ্বারে জীর্ণবাস পরিহিত এক যুবক দাঁড়িয়ে। যুবক হয় ত জন্ম থেকেই পথচারী। সর্বাঙ্গে তার পান্থ-জীবনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে—ছেঁড়া জামায়, শুকনো মুখে, তামাটে রঙে, ক্ষুধিত দৃষ্টিতে।

যুবক বার কয়েক ইতস্তত করে অবশেষে আপিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা সম্পাদকের ঘরে গিয়ে উপস্থিত।

সম্পাদক এড্ওয়ার্ড ব্রাণ্ডেস ডেন্মার্কের খবরের কাগজ-জগতের নেতা।

সম্পাদক আপন মনে কাজ করছিলেন।

যুবক ছেঁড়া জামার ভেতর থেকে বার করল একখানি পাণ্ডুলিপি। অসীম সাহসে পাণ্ডুলিপিখানি টেবিলের উপর এগিয়ে দিল।

মুখ না তুলেই, পাণ্ডুলিপির আকার দেখে সম্পাদক তা ফিরিয়ে দিলেন। ফেরাতে গিয়ে দেখলেন—শ্রান্ত যৌবনের একটি রেখা-মূর্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। একেবারে টাটকা ছবি, কালির আঁচড়গুলোও এখনো পরিষ্কার করা হয় নি।

সম্পাদক পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে নিলেন প'ড়ে দেখবেন ব'লে।

পথে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে; শীতের সন্ধ্যা, কুয়াসায় গভীর।

যুবক পথ চলছিল।

কুয়াসার মধ্যে দিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল; কি যেন হারিয়ে ফেলেছে।

রাত্রি তখন গভীর; সে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল একটা বাড়ীর সামনে। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে নিল। ঘরে ঘরে আলো নিবে গেছে। দেখে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে গেল। হামাগুঁড়ি দিয়ে সে ঘরে গিয়ে উঠল। অথচ তারই ঘর, তবে সে ভাড়া দিতে পারে নি।

একটা শীর্ণ মোমবাতির বুকে একটুখানি আলো জ্বলে উঠল। সে আলোয় যুবক দেখল—একখানি ডাকের চিঠি, লেফাপা। লেফাপা

ছিঁড়তেই একখানি দশ-ক্রোনার নোট প'ড়ে গেল। দাতার নাম খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেল—এড্‌ওয়ার্ড ব্রাণ্ডেস।

সম্পাদক ব্রাণ্ডেস পাণ্ডুলিপিখানি বাড়ী নিয়ে গিয়ে পড়তে বসলেন। পাতা কয়েক পড়তে না পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন,—এ যে নব সূর্যোদয়।

গল্পের নায়ক যেখানে ঘর-ভাড়ার টাকা দিতে না পেয়ে রাত্রির অন্ধকারে হামাগুঁড়ি দিয়ে চোরের মত নিজের ঘরে ঢুকছে—সেইখানে আসতেই তাঁর মনে হ'ল, হয় ত ঠিক এমনই ক'রেই এ যুবকও আজ রাত্তিরে নিজের ঘরে ফিরবে! তৎক্ষণাৎ যুবকের ঠিকানায় তিনি একখানি দশ-ক্রোনার নোট পাঠিয়ে দিলেন।

সেই রাত্রেই সেই পাণ্ডুলিপি হাতে ক'রে সম্পাদক ব্রাণ্ডেস বিখ্যাত সমালোচক ও প্রকাশক লুণ্ডেগার্ড-এর বাড়ী উপস্থিত হলেন। পাণ্ডুলিপি হাতে দিয়ে বললেন, 'এ শুধু প্রতিভার দান নয়,—মানবাত্মার মর্মন্তুদ কাহিনী। ডস্টয়েভ্‌স্কির বংশধর।'

বিস্মিত সমালোচক বললেন, 'তাই না কি? কি নাম বইটার?'

'বুভুক্ষা।'

'লেখক?

'ক্নুট হাম্‌সুন্‌।'

লুণ্ডেগার্ডের সঙ্গে সেদিন সমগ্র জগতও একটি নতুন নাম শুনতে পেল; এবং স্মরণ ক'রে রাখল চিরদিনের জন্য।

পাঁচই অগ্রহায়ণ

১৩৩৫ সাল

বুভুক্ষা

তখন ক্রিশ্চিয়ানা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অনাহারে মৃতপ্রায়। এ শহরটি এমনই অদ্ভুত যে, একবার সেখানে গেলে প্রবাসের কোন-না-কোন স্মৃতি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেই।

*　　　*

সেদিন চিলে-কোঠার বিছানায় পড়েছিলাম। নীচের ঘড়িতে ছ'টা বেজে গেল। চারিদিক রোদে ভ'রে গেছে। সিঁড়িতে লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। দরজার পাশে দেওয়ালের যেখানটা পুরানো খবরের কাগজে মোড়া ছিল সেদিকে নজর পড়ল। তাতে বাতি-ঘরের বিজ্ঞাপন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তারই এক পাশে এক রুটিওয়ালার খুব জমকালো বিজ্ঞাপন ছিল। চোখ মেলতে-না-মেলতে অভ্যাসের বশে ভাবতে লাগলাম, আজকের দিনে কি আমার আনন্দ করবার কিছু মানে আছে? কিছু দিন থেকেই টাকাকড়ির টানাটানি বড় বেড়ে গেছে। জিনিসপত্তর যা-কিছু ছিল সবই একটির পর একটি খুড়োর ঘরে রেখে আসছি। শরীরটা যেমন কাহিল হয়ে পড়েছে, মেজাজও তেমনি তিরিক্ষি হচ্ছে। দিনকয়েক ত চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়ে থাকতাম; মাঝে মাঝে ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হ'ত, খবরের কাগজে গল্প লিখে কিছু কিছু পাওয়া যেত।

ঘরের ভিতর আলো আসতে লাগল, দরজার পাশের বিজ্ঞাপনগুলি তখন আরও স্পষ্ট পড়া যায়, এমন কি, ডান পাশে হাল-ফ্যাশানের জামা-কাপড়ের বিজ্ঞাপনের সরু সরু হরফগুলিও চোখ এড়াল না। কতক্ষণ

সেই দিকেই চেয়েছিলাম। নীচের ঘড়িতে আটটা বেজে গেল—আর বিছানায় পড়ে থাকা সম্ভব হ'ল না; জামাকাপড় প'রে জানালা খুলে বাইরে তাকাতেই খোলা মাঠটা চোখে পড়ল। তারই একটু দূরে আগুনে-পোড়া এক কামারশালার ভস্মাবশেষ দেখতে পেলাম। কারা তখন সেখানে জিনিসপত্তর গোছাতে ব্যস্ত ছিল। জানলার গরাদে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাইরের খোলা বাগানের দিকে তাকালাম। আকাশ দিব্য পরিষ্কার। শরতের শান্ত মূর্তি—প্রকৃতি চোখের ওপর নানা রঙের বিচিত্র খেলা খেলে যায়।

রাস্তার গোলমাল ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল, আমি আর তখন নিজেকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলাম না। আমার আসবাব-পত্তরহীন ঘরে কাঠের মেঝেতে পা ফেলতেই ভয় হ'ত, এই বুঝি ভেঙে পড়ল। তাকে বাসগৃহ না ব'লে অন্ধকার কবর বললেই চলে। দোরের আগল ত নেইই, এমন কি, শীতের কাঁপুনি থেকে বাঁচবার জন্যে হাত-পা গরম করবার চুলো পর্যন্ত নেই। রাত্তিরে মোজা প'রেই শুয়ে থাকতাম, তাতে শীত না কাটলেও ভিজে মোজা শুকিয়ে যেত! ঘরে আরাম-আয়াসের জন্যে একট মাত্র জিনিস ছিল—একখানা দোলনা-চেয়ার। সন্ধ্যে বেলা সেখানে বসে কত কথাই না ভাবি। যখন জোরে বাতাস বইত আর নীচের দরজা খোলা থাকত, তখন মনে হ'ত বায়ু-তরঙ্গের সঙ্গে যেন কত অভিশপ্ত আত্মার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপ্টায় দরজায় মোড়া কাগজগুলি টুকরা টুকরা হয়ে উড়ে যেত। বাতাসের শোঁ শোঁ কান্নার সঙ্গে কত অদ্ভুত শব্দই না শোনা যেত।

বিছানার এক কোণে একটা খাবারের পুঁটুলি ছিল, খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে কিছুই নেই। তখন আবার ফিরে গিয়ে জানলার সুমুখে দাঁড়ালাম।

মনে হ'ল, চাকরির খোঁজ ক'রে ভাগ্যে কিছু জুটবে কি-না ভগবানই জানেন। যেখানেই যাই সেখানেই বিরাট ব্যর্থতা, দারুণ নৈরাশ্য; কখনও বা অকথ্য অপমান। নিত্য নতুন আশাভঙ্গ হওয়ায় যেটুকু সাহস ছিল তাও আর ধরে রাখতে পারি নি। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এক মহাজনের আদায়-তহশিলের চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম; দরখাস্ত সময়ে পৌঁছয় নি, তা ছাড়া, জামিনের পঞ্চাশটা টাকার সংস্থানও করতে না পারায় সেখানেও নিরাশ হতে হ'ল। মাঝে মাঝে দু-একটা কাজ যে না জুটত তাও নয়। একবার দমকলের খালাসির চাকরির জন্যে দরখাস্ত করি। আপিসের দরজায় আমরা প্রায় পঞ্চাশজন উমেদার বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালাম, যেন আমাদের বাহুতে বল, বুকে সাহসের কিছুমাত্র অভাব নেই। একজন ইন্সপেক্টর এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পরীক্ষা করতে লাগল। আমাদের হাত-পা নেড়ে চেড়ে দেখে কাউকে বা দু-একটি প্রশ্ন করলে। আমার দিকে একবার শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আমার দৃষ্টিহীনতার জন্যে মাথা নেড়ে আমার আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে দিলে। তখন আর একবার চশমা খুলে দরখাস্ত পেশ করলাম। ভ্রূ কুঁচ্‌কিয়ে চোখে সূঁচের মত ধারালো দৃষ্টি হেনে দাঁড়ালাম। কিন্তু লোকটা এবারেও আমাকে চিনে ফেলল। হেসে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। এমন জামাকাপড় আর ছিল না যাতে ক'রে কোন ভদ্রসমাজে চাকরির চেষ্টায় বার হওয়া যায়। কাজেই অবস্থা দাঁড়াল আরও করুণ।

কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আমার আর্থিক অবস্থাটা দিন দিনই সঙ্গীন হয়ে পড়ছিল। এমন কি, অবশেষে ঘরের সব জিনিসই একটির পর একটি ক'রে বাঁধা পড়ে গেল; চুল আঁচড়াবার চিরুনিখানাও। একটু পড়াশুনা ক'রে যে মনটাকে বিষয়ান্তরে টেনে নিয়ে যাব তারও উপায় ছিল না; কেন না, বইগুলিও সব বিক্রি ক'রে খেয়ে বসে আছি। ফলে আমার দেহ-মন ক্রমেই নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল, গোটা

গ্রীষ্মকালটা গীর্জার ময়দানে বা কোন পার্কে বসে বসে খবরের কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতাম। নানা বিষয়ে রাশি রাশি রচনা মজুত হতে লাগল। এ সব লেখায় অদ্ভুত খেয়াল ও উদ্ভট কল্পনার খেলাই ছিল বেশি। আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক থেকে এর চাইতে ভাল লেখা বার হ'ত না। হতাশ হয়ে এমন সব অদ্ভুত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছি যার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। বলা বাহুল্য, এ সব লেখা কখনও মনোনীতও হয় নি। তবু ক্রমাগত লিখে যেতে লাগলাম, কিছুতেই হতাশ হই নি। মনে হ'ত, এক দিন না এক দিন আমার লেখার কদর হবেই। মাঝে মাঝে গোটা দুপুর মাথা ঘামিয়ে যা লিখতাম, তাতে দু-চারটে টাকাও যে রোজগার হ'ত না এ কথা বলা চলে না।

জানলা থেকে সরে এসে হাতমুখ ধুয়ে হাঁটুর উপরে পা-জামায় যে ময়লা জমেছিল, খানিকটা জল হাতে নিয়ে তা ধুয়ে মুছে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। তারপর কাগজ-পেন্সিল পকেটে গুঁজে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে পড়লাম। ভয়, পাছে বাড়ীওয়ালি টের পায়! ঘর-ভাড়ার অনেক টাকা তার পাওনা ; শোধ করবার কোন উপায় নেই।

ন'টা বেজে গেছে। রাস্তায় গাড়ীঘোড়া, লোকজনের বড্ডো ভিড়। এই বিপুল জনকোলাহলের মধ্যে পড়ে আমারও মনের অবসাদ কেটে গেল। ভোরবেলা হাওয়া খাওয়ার মতলবে আমি রাস্তায় বার হই নি ; আমার ফুস্ ফুস্ স্বাভাবতই সবল, সুতরাং নির্মল হাওয়ার তেমন দরকারও ছিল না। দেহে আমার অসুরের বল, বুনো হাতীকেও হেলায় হটাতে পারি। এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমাকে বিহ্বল ক'রে ফেললে। রাস্তার লোকগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরের বিভিন্ন রকমের পোস্টারগুলিও আমার চোখ এড়াল না। এমন কি, চলন্ত ট্রাম থেকে দু-একটি চঞ্চল চাউনিও চোখে পড়তে লাগল। পথে যাকিছু দেখতে পেলাম তা-ই আমার মনের উপর দাগ কেটে গেল

এমন সুন্দর দিনে স্ফূর্তিটা আরও জমাট বাঁধত যদি পেটেও এক মুঠো কিছু পড়ত। প্রভাতের প্রসন্ন মূর্তিতে আমি মনে-প্রাণে খুব খুশি হলাম। আমার পেটে তখন যদিও দারুণ ক্ষুধা, তবু কোন্ এক অজানা কারণে আপনা থেকে গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইতে আরম্ভ ক'রে দিলাম।

একটা মাংসের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা বুড়ী মাংস দর করছিল। তার পাশ দিয়ে যেতেই সে একবার আমার দিকে তাকালে। দেখতে পেলাম, তার মুখের সুমুখের দিকে কেবল একটি মাত্র দাঁত আছে। কিছু দিন থেকেই আমার মেজাজটা এমনই ধারা বিগড়ে গেছল যে, তার এই বিকট মূর্তি দেখে আমার মনটা এক দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণাও চলে গেল, সারা গা বমি-বমি করতে লাগল। বাজারে পৌঁছে ফোয়ারা থেকে আঁজল-ভরা জল পান ক'রে ক্ষুধাতৃষ্ণা তখনকার মত দূর করা গেল। গীর্জার ঘড়িতে তখন দশটা বেজে গেছে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত পথ চলেছি, যেন আমার ভাববার কিছুই নেই।

রাস্তার মোড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে সুমুখের গলিটায় বিনা প্রয়োজনে ঢুকে পড়লাম। সারাটা প্রভাত নিরুদ্দেশ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। চারিদিকেই নর-নারী সুখে দুঃখে ঘরকন্না করছে, এতেই যেন আমি পরম তৃপ্তি পাচ্ছি। ঊর্ধ্বে নির্মল আলোকোজ্জ্বল নীলাকাশ, তাই আমার মনে আঁধারের ছায়াও পথ পেলে না। আমার আগে আগে একটা বুড়ো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। তার এক হাতে একটা পুঁটুলি। পথ চলতেই যেন তার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে সে যে হাঁপাচ্ছিল তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে হ'ল, যদি কেউ তার পুঁটুলিটা বয়ে নিতে রাজী হয় ত তার কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়। কিন্তু তাই ব'লে আমি নিজেও তার কষ্টের লাঘব করতে এগুলাম না। বড় রাস্তায় পড়তেই একজন চেনা

লোক আমায় দেখে নমস্কার করল বটে কিন্তু কিছু না ব'লেই তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। তার যে এত কি তাড়া ছিল বুঝতে পারলাম না। তার কাছ থেকে টাকাপয়সা চাইবার অভিপ্রায় অবশ্য আমার মোটেই ছিল না, বরং কয় সপ্তাহ আগে তার কাছ থেকে যে একখানা গরম কম্বল ধার নিই, তাই ফিরিয়ে দেওয়ার মতলবে ছিলাম। তবু কেন সে এমন ক'রে পাশ কাটিয়ে গেল ?

দাঁড়াও না, একবার অবস্থাটার একটা সুরাহা ক'রে নিই, তারপর আর কারুর কাছে একটি পয়সাও ধার করব না, এমন কি একখানা কম্বলও না। হয় ত আজই আমি যে প্রবন্ধ লিখব ব'লে মনে মনে এঁচে নিয়েছি তার জন্যে অন্তত দশটি টাকা পাবই। ...

প্রবন্ধের কথা মনে হ'তেই লিখবার ঝোঁক চেপে বসল। মগজের ভিতর যে ভাবটা তখন গিজ গিজ করছিল তা বেরিয়ে না এলে যেন স্বস্তি ছিল না। পার্কের মধ্যে একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে এখখুনি লেখা শুরু করব, আর শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠব না।

কিন্তু সেই খোঁড়া বুড়োটা তখনও আমার আগে আগে যাচ্ছিল। এই দুর্বল হতভাগা লোকটাকে আমার চোখের সুমুখে চলতে দেখে মনটা বিষাদে ভ'রে গেল! ওর যেন পথের আর শেষ নেই, আমি যেখানে যাব, ও-ও হয় ত সেখানেই যাবে। সারাটা পথ হয় ত ওরই পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে গিয়েই ও এক একবার থামে, যেন আমি কোন্ দিকে যাই ও তাই লক্ষ্য করছে। আমি পিছনে যাচ্ছি দেখে ও-ও আবার পুঁটুলিটা তু'লে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে যায়। এই ক্লান্তক্লিষ্ট লোকটাকে যতই অনুসরণ করি, ততই ওর ওপর আমার একটা দারুণ বিরক্তি আসে।

বাইরের সৌন্দর্য, গাড়ীঘোড়া, লোকজনের অনাগোনায় মনটা যতটুকু প্রসন্ন হয়েছিল, কুৎসিত এই লোকটার সঙ্গে হেঁটে সেইটুকু ক্রমেই

কমে আসছিল। ও যেন একটা প্রকাণ্ড অজগড়ের মত সারাটা পথ জুড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে।

এমনই ক'রে আমরা যখন একটা পাহাড়ের উপর গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, তখন লোকটার হাত এড়াবার জন্যে আমি অন্য পথ ধরবার সংকল্প করলাম। একটা দোকানের সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকটা এই অবসরে অনেকটা পথ এগিয়ে যাবে ; কিন্তু মিনিট কয়েক পরে এগিয়ে গিয়ে দেখি লোকটা এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল, আমায় দেখতে পেয়ে আবার চলতে লাগল। আমি আর দ্বিধা না ক'রে খুব জোরে জোরে পা ফেলে ওকে ধরে ফেলে ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম। ও হঠাৎ চম্‌কে উঠে থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'চারটে পয়সা দেবেন ?'

আমি পকেট হাতড়ে বললাম, 'পয়সা ?—পয়সা আজাকাল এত সস্তা নয়। পয়সা নিয়ে কি করবে ?'

—'মশাই, দু-দিন কিছুই খেতে পাই নি, সঙ্গে একটা আধলাও নেই। কাজকর্মও কিছু জুটছে না।'

—'কি কাজ জান ?'

—'এই মেরামতের কাজ ?'

—'কি মেরামত ?'

—'জুতো। তৈরিও করতে পারি।'

—'ও! আচ্ছা। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি এখনি ঘুরে আসছি। তোমায় কিছু দেব।'

সোজাসুজি পা ফেলে এগিয়ে চললাম। কাছেই একটা পোদ্দারের বন্ধকী-দোকান আছে জানা ছিল, কিন্তু এর আগে তার সঙ্গে আমার কোনরকম কারবারই হয় নি।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠবার সময় তাড়াতাড়ি গা থেকে ওয়েস্ট কোটটা খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

পোদ্দার জামাটার দিকে একবার চেয়েই বললে, 'চোদ্দ আনা।'

আমি বললাম, 'বেশ বেশ, তাই দাও! সময়টা ভারী খারাপ যাচ্ছে, নইলে এ জামাটা বাঁধা দেবার কোনই কারণ ছিল না।'

চোদ্দ আনা পয়সা ও রসিদটা পকেটে ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম, জামাটা গেল বটে, এ বেলাটা ত পেট ভরে খাওয়া চলবে! তারপর সন্ধ্যের মধ্যেই লেখাটা যদি ঠিক মত শেষ করতে পারি, তা হ'লে আর চাই কি! ভবিষ্যৎটা তখন আমার চোখের সুমুখে বেশ উজ্জ্বল হয়েই দেখা দিল। লোকটা তখনও আমার প্রতীক্ষায় অদূরে ফুটপাথের উপর লাইট-পোস্ট হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে কাছে গিয়ে বললাম, 'এই যে, নাও!'

লোকটা হাত বাড়িয়ে আধুলিটা নিয়ে আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল।

কি দেখছিল ও?—আমার ছেঁড়া পা-জামাটা!—ওর ওরকম বেহায়াপনায় আমি মনে মনে ভারী পীড়িত হয়ে ওঠলাম। ও কি আমাকেও ওরই মত হতদরিদ্র মনে করেছে? আমি যে খবরের কাগজে লিখে টাকা পাই। তা ছাড়া, আমার ভবিষ্যতের ভাবনা কি? লোকটার নির্লজ্জতার জন্যে মনে মনে রাগ হচ্ছিল; একবার ইচ্ছে হ'ল, তাকে দুটো ঘুষি দিয়ে বিদায় করি। বললাম, 'হ্যাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছ?'

ও বিহ্বলের মত চেয়ে রইল! ওর মাথায় যেন কি গোল পাকিয়ে গেল। ও কি মনে ক'রে আধুলিটা আমায় ফিরিয়ে দিতে উদ্যত হ'তেই আমি ফুটপাথের উপর পা ঠুকে বললাম, 'ও আমি আর চাই নে। খুশি হয়েই তোমায় দিচ্ছি। তুমি এখন যাও।'

ও আস্তে আস্তে চলে গেল।

আমার তখন মনে হ'ল, নিশ্চয়ই আমি কোন-না-কোন দিন পয়সা কয় আনা ওর কাছে ধারতাম। এখন ওর সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে ওর প্রতি একটা অজানা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল। ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

ও লক্ষ্মীছাড়া লোকটা সামনে থেকে সরে যাওয়ায় ভারী একটা স্বস্তি বোধ করলাম। একটা পরম তৃপ্তির সঙ্গে আবার আমি পথ চলতে লাগলাম। খানিকটে এগিয়ে যেতেই একটা খাবারের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম দোকানে কত রকমেরই না খাবার সাজান রয়েছে। ভাবলাম, কিছু খাবার কেনা যাক।

দোকানে ঢুকেই রুটি-মাখন চেয়ে ছ-আনা পয়সা টেবিলে ছুঁড়ে দিলাম। পয়সা ক-আনা কুড়িয়ে নিয়ে দোকানী আমার দিকে না চেয়ে ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করলে, 'সব পয়সারই রুটি-মাখন ' কিছু না ভেবেই জবাব দিলাম, 'হাঁ, সব পয়সারই।'

হাত বাড়িয়ে খাবারগুলি নিয়ে দোকানীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা পার্কের দিকে এগিয়ে চললাম।

পার্কের এককোণে একখানা বেঞ্চির উপর বসে পড়েই খিদের জ্বালায় তাড়াতাড়ি অত রুটি-মাখন সব নিঃশেষে খেয়ে ফেললাম। বাঁচা গেল! অনেক দিন এমন পেট ভ'রে খেতে পাই নি। আস্তে আস্তে একটা তৃপ্তি এসে আমাকে অবসন্ন ক'রে ফেললে। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে চুপ করতে পেয়ে যেমন শান্তি আসে, ঠিক তেমনই শান্তি! পরম উৎসাহে আমার অন্তর দুলে উঠল। মনে হ'ল, সামান্য যা-তা সহজ কোন প্রবন্ধ লিখে মনের প্রসন্নতা আসবে না। ও রকম সোজা প্রবন্ধ একটা গণ্ড মূর্খেও লিখতে পারে। আমার তখন বেশ বড় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবার শক্তি এসে গেছে। এই উৎসাহে

উদ্বুদ্ধ হয়ে ঠিক করলাম, দার্শনিকাচার্যের চুলচেরা তর্কের গর্ব খর্ব ক'রে দিতেই হবে। কাগজপত্র পকেটেই ছিল, বার ক'রে লিখতে যাচ্ছি, দেখলাম পেন্সিলটি নেই। মনে পড়ল, বন্ধকী-দোকানে রেখে-আসা সেই ওয়েস্ট-কোটটার পকেটেই ত সেটা রয়েছে।

আজ কি আমায় সকল রকমে ব্যর্থ করবার জন্যেই চারি দিক থেকে ষড়যন্ত্র চলেছে! বেঞ্চি ছেড়ে বার কয়েক এদিক-ওদিক পাইচারি ক'রে বেড়ালাম। চারিদিক তখনও নিস্তব্ধ নীরব। যতদূর চোখ যায়, জনপ্রাণীও নেই। দূরে দুটি স্ত্রীলোক একটা ঠেলাগাড়ী টেনে ছেলেদের নিয়ে বেড়াচ্ছিল। মেজাজটা ভারী বিগড়ে গেল। বেঞ্চিটার সামনে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার মধ্যে একটা বিদ্রোহ এনে দিল। সামান্য একটা পেন্সিলের অভাবে আমার সমস্ত আশা-উদ্যম পণ্ড হবে? ভেবে দেখলাম, ফিরে গিয়ে পোদ্দারের দোকান থেকে পেন্সিলটা চেয়ে নিয়ে আসতে বেশি সময় লাগবে না। তারপর এখানে লোকজনের আনাগোনার আগেই অনেক ভাল ভাল জিনিস লিখে ফেলতে পারব। তাতে আর কারুর বিশেষ উপকার না হ'লেও তরুণদের অনেক কাজে আসবে হয় ত। পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, না, কাণ্টের দার্শনিকতার ওপর ঝাল ঝেড়ে কি হবে? তা না করলেও ত চলতে পারে। স্থান কাল সম্বন্ধে অনায়াসেই ত একটি ভাল লেখা হতে পারে। বৃদ্ধ দার্শনিক কি বলে, তার জবাব দিয়ে কি লাভ

যে-করেই হোক, লেখাটা আমায় শেষ করতেই হবে। কেন না, ঘরভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি। সকালে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বাড়ীওয়ালির সেই জিজ্ঞাসুদৃষ্টি চোখের উপর ভেসে উঠল। সেই কারণে সারাটা দিন মনটা ভারী হয়ে রয়েছে। তার ও চাউনিটা যখনই আমার মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা বেদনা এসে আমাকে বিঁধতে থাকে। এ

দুঃখের শেষ আজ করতেই হবে। এই মনে ক'রে পেন্সিলটার জন্তে আমি পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই পথে ছুটি মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যেতে একজনের হাতের সঙ্গে আমার হাতটা জোরে ঠুকে গেল। পিছন ফিরে একবার চেয়ে দেখলাম। মহিলাটির বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু মুখ চোখ একেবারে মলিন। কিন্তু তার চোখে চোখ পড়তেই তার গাল ছুটি লাল হয়ে উঠল। অপরূপ সুন্দর দেখাল ওকে। মেয়েটির গাল ছুটি কেন রাঙিয়ে গেল কে জানে! হয় ত আর কারুর কোন কথা শুনতে পেয়েছে, নয় ত নিজেরই কোন গোপন চিন্তা তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে, না, আমার স্পর্শেই সে অমন ক'রে উঠল! ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসে তার বুক কেঁপে ফুলে উঠতেই জোর ক'রে ও তার হাতের পুঁটুলিটা চেপে ধরল। ওর কি হয়েছে?

আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে ওকে আগে যাবার সুযোগ ক'রে দিলাম। মুহূর্তকাল একপাও এগোতে পারলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার চোখে কেমন অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ল। নানা কারণে মেজাজটাও ভাল ছিল না। কত আশা ছিল, লেখাটা শেষ করতে পারলেই আমার অভাবও খানিকটা দূর করতে পারব, কিন্তু কোথা থেকে এই পেন্সিল-বিভ্রাট এসে আমার সবকিছু মাটি ক'রে দিলে! নিজেরই উপর ভারী একটা ক্ষোভ এসে গেছল; তার উপর সুদীর্ঘ বাট ঘণ্টা উপোসে কাটিয়ে একসঙ্গে অতটা রুটি-মাখন খেয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

সহসা একটা উদ্ভট খেয়াল এসে আমাকে পেয়ে বসল। স্থির করলাম, মেয়েটির পিছু নিয়ে ওকে নানা রকমে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে হবে। এই মনে ক'রে আমি ওর পিছু নিলাম। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাতেই একটা অদ্ভুত নাম শুনতে পেলাম। ও যখন

আমার কাছে এসে পড়ল তখন আমি ব'লে উঠলাম, 'আপনার বইখানা যে পড়ে গেল !'

বলতে গিয়ে বুকটা আমার কেঁপে উঠল।

'আমার বই ?' ব'লে ও ওর সঙ্গিনীর মুখের দিকে চাইল, তারপর আবার দুজনে এগিয়ে চলল।

আমার যেন খুন চেপে গেল। আবার তাদের পিছু নিলাম। আমার তখন বেশ জ্ঞান ছিল, আমি তখন উন্মাদ খেলায় মেতে উঠেছি শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায়, খেয়ালের বশে। ভাগ্যবিপর্যয়ে এমনই দশাই হয় ! উন্মাদ প্রবৃত্তিকে দমন করবার আমার এতটুকু শক্তি ছিল না। ওদের পিছু পিছু গিয়ে খক্‌খক্ ক'রে বিকট আওয়াজ ক'রেই ওদের পিছনে ফেলে আমি এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে মনে হ'ল, মেয়েটি যেন তখনও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কি জানি কেন লজ্জায় আমার মাথাটা নুয়ে পড়ল ; মনে হ'ল, আমি যেন কোন্ অজানা অচেনা দূর দেশে চলেছি, তখন আমার চেতনা অর্ধেক লোপ পেয়ে গেছে !

খানিকটা চ'লে ওরা একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। ওদের আগেই গিয়ে সেই দোকানের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার পাশ দিয়ে যখন ওরা যায়, আমি একটু ঝুঁকে পড়ে ওকে বল্‌লাম, 'আপনার বইটে যে পথের মাঝে পড়ে রইল !'

'বই ? না !' ভয়ে ভয়ে মেয়েটি এই কথা ব'লে ওর সঙ্গিনীকে শুধালে, 'কি বইয়ের কথা বলছে বলতে পার ?' ব'লেই ও থেমে গেল।

তার বিহ্বলতা দেখে আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ওর চাউনিতে সংশয়-দোলায়িত ব্যাকুলতা আমার বড় ভাল লাগল। আমার সংক্ষিপ্ত অনুরাগের সুর তার মর্ম স্পর্শ করল না। ওর সঙ্গে

কোন বই, এমন কি, বইয়ের পাতাও ছিল না। তবু ও ওর পকেট একবার হাতড়াল, বার বার নিজের হাত দুখানির দিকে চেয়ে দেখল, একবার পিছন ফিরে চাইল রাস্তায়; কোন্ বইয়ের কথা বলছি তা আবিষ্কার করবার জন্যে ক্ষুদ্র মস্তিকে কূলকিনারা মিলল না। ক্ষণে ক্ষণে ওর মুখের রঙ বদলাতে লাগল এবং ওর নিশ্বাস এত জোরে জোরে পড়ছিল যে, শুনতে পাচ্ছিলাম। এমন কি, ওর গাউনের বোতামগুলিও যেন ভয়ে আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে!

সঙ্গিনী ওর হাত ধরে বললে, 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মাতাল, দেখছিস না, লোকটা মাতাল!'

এ অবস্থাটা আমার নিজের কাছেই খুব অদ্ভুত লাগছিল। কিন্তু কি করব? আমার ভিতরকার এক অদৃশ্য শক্তি আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার কি দোষ! তা সত্ত্বেও বাইরের কোন বস্তুই আমার চোখ এড়িয়ে যায় নি। একটা মেটে কুকুর রাস্তার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে একটা ঝি দোতলার জানলার শার্সি পরিষ্কার করছে—সবই দেখতে পাচ্ছি। আমার মাথা খুব পরিষ্কার, জ্ঞান টন্‌টনে। উজ্জ্বল দীপালোকে যেমন সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় তেমনই সব কিছু সুস্পষ্টভাবে আমার নজরে আসে। মেয়ে দুটির মাথার টুপির নীল পালক, গলায় সাদা রেশমী ফিতে দেখেই বেশ বুঝতে পারলাম যে তারা উভয়ের সিস্টর।

ওরা একটা বাজনাওয়ালার দোকানে ঢুকে কি বলাবলি করল। আমি দাঁড়ালাম। ওরা দুজনেই বার হয়ে এসে রাস্তা ধরে চলতে লাগল, আমার সুমুখ দিয়ে গিয়ে মোড় ফিরে আর একটা রাস্তা ধরল। আমিও সারাক্ষণ যতটা কাছাকাছি সম্ভব ওদের পিছনে পিছনেই চলতে লাগলাম। ওরা একবার পিছন ফিরে আধ-ভীতু আধ-জিজ্ঞাসু

দৃষ্টিতে চাইল, ওদের সে চাউনিতে রাগ বা বিরক্তির কোন লক্ষণই আমি দেখতে পেলাম না।

আমার এই অনুচিত আচরণে ওদের অসীম সহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে আমি নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা নুয়ে পড়ল। আমি আর ওদের বিরক্ত করব না। যতক্ষণ না ওরা কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয় ততক্ষণ কেবল নিছক কৃতজ্ঞতার খাতিরে ওদের দিকে নজর রাখব।

একখানা চারতলা বাড়ীতে গিয়ে ওরা প্রবেশ করল। বাড়ীর সদর দরজায় বাড়ীর নম্বর লেখা রয়েছে—দুই। ওরা ঢুকতে গিয়ে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। কাছেই একটা লাইট-পোস্ট ছিল, তাতে ঠেস্ দিয়ে ওদের পদশব্দ শুনতে লাগলাম। খানিক পরেই পদশব্দ মিলিয়ে গেল। দোতালা পর্যন্ত শব্দ পেলাম। লাইট পোস্টের কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে একবার উপরের দিকে মুখ তুলে বাড়ীটা দেখে নিলাম। তারপর একটা ভারী মজার কাণ্ড হ'ল কিন্তু। উপরের একটা জানলার পর্দাটা একবার নড়ে উঠল, পাশের জানলাটা খুলে গেল এবং ফাঁক দিয়ে একটি মাথা দেখা গেল, এক জোড়া উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ দেখতে পেলাম। বিড়বিড় ক'রে সেই নামটা—ল্যাজালি—অনুচ্চ স্বরে আওড়াতেই আমার সারাটা দেহ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

কই, ও ত সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকলে না, ফুলের একটা টবও ত উপরের থেকে আমার মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারতে পারত, তাও ত করল না; তা ছাড়া, উপরে উঠে কাউকে পাঠিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিতে ত পারত, কিন্তু ও ত এর কিছুই করল না। আমরা উভয়ে প্রায় মিনিট খানেক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কেউ একটু নড়লাম পর্যন্ত। রাস্তা থেকে সেই জানলায় নিঃশব্দে কি কথা বলাবলি হয়ে

গেল। সে জানলা থেকে সরে যেতেই আমার শিরা-উপশিরা সব যেন বেদনায় টন্‌টন্‌ ক'রে উঠল। যাবার সময় মাথাটাও নেড়ে গেল। মনে হ'ল যেন ও আমায় অভিবাদন জানাল। একটা না-জানা পুলকে আমার সারা দেহমন অনুরণিত হ'তে লাগল। আবার পথ চললাম।

পিছন ফিরে আর একবার তাকাতেও সাহস হ'ল না। সে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কি-না তাও জানতে পারলাম না। এ সম্বন্ধে যতই ভাবতে লাগলাম ততই সব কিছু আমার মাথার মধ্যে এমনই তাল পাকিয়ে গেল যে, স্থির হতে পারলাম না। কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, হয় ত মেয়েটি এখনও জানলার সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার পথ চলা দেখছে। পিছন থেকে কেউ দেখছে মনে হতেও মনে কম অস্বস্তি হয় না। আমার যেন কোন দিকেই লক্ষ্য নেই, এটা প্রমাণ করবার জন্যেই আমি পা-দুটো বাঁকিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে নানা ভঙ্গী ক'রে পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই ভয় দূর হচ্ছিল না, কেবলই মনে হচ্ছিল, কে যেন পিছনে তাকিয়ে আছে; বুকটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় দুরু দুরু করছিল। খানিকটা যেতেই পাশ ফিরে আর একটা রাস্তা ধ'রে এগিয়ে গিয়েই বন্ধকী-দোকানে হাজির হলাম।

পেন্সিলটা পেতে অবশ্য একটু অসুবিধা হ'ল না। জামাটা এনে লোকটা আমায় দিয়ে বললে, 'পকেটগুলি ভাল ক'রে খুঁজে পেতে দেখে নাও।' পেন্সিলের টুকরোটার সঙ্গে খানকয়েক বন্ধকী-রসিদও পাওয়া গেল। দোকানীর শিষ্টতার জন্যে তাকে সাধুবাদ দিয়ে চলে এলাম। আমার পরিচয়টা না দিয়ে চ'লে আসতে মন উঠছিল না। একটা অছিলা ক'রে দরজা থেকে ফের ফিরে গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম, যেন কিছু ভুল হয়ে গেছে। মনে হ'ল তাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলে যাওয়া দরকার। লোকটির মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে একটা শব্দ করলাম। তারপর পেন্সিলটা দেখিয়ে তাকে বললাম

'এর যদি কোন বিশেষত্ব না থাকত তা হ'লে সামান্ত একটুকরা পেন্সিলের জন্তে আমি এতদূর কথনও আসতাম না। এর একটা বিশেষ কারণ আছে। এ পেন্সিলটা যতই তুচ্ছ হোক না, একদিন এটা জগতের কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।'

আর কিছু বললাম না, লোকটাও ততক্ষণে কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সে জবাব দিল, 'তাই নাকি!' ব'লে আমার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

আমি সোজা ব'লে গেলাম, 'এই পেন্সিলটা দিয়েই আমি তিন খণ্ডে আমার দার্শনিক মতামত লিখেছি।' কাজেই এটা যে আমার কাছে এতটা দামি এবং সেই টুকরোটা ফিরে পেতে আমার আগ্রহ হওয়া যে খুবই স্বাভাবিক তা জেনে নিশ্চয়ই সে অবাক না হয়ে পারে না। পেন্সিলটার দাম এখন যত তুচ্ছই হোক না, আমি যে কিছুতেই এটাকে হাত ছাড়া করতে পারি নে। কেন-না, আমার কাছে একটা জীবনের যে দাম, এ পেন্সিলটা তার চেয়ে কম দামি নয়। সে যাই হোক, লোকটির সৌজন্তে আমি অত্যন্ত প্রীত হলাম, জীবনে তার কথা কথনও ভুলতে পারব না। হাঁ সত্যি, সত্যি তার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই, আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই আমার স্বভাব। আর লোকটিও নাকি নেহাৎ ভাল লোক। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এমন ভাব দেখিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম যে, মনে হয় আমি যে দরের লোক, তাতে ইচ্ছে করলেই, যে-কোন লোককে যখন তখন একটা বড় কাজ জুটিয়ে দিতে পারি, নিদেন দমকলের আপিসে ত নিশ্চয়ই পারি। চলে আসতেই লোকটি ত্বার সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা নীচু ক'রে আমায় অভিবাদন জানালে, আমি মুখ ফিরিয়ে আবার তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

সিঁড়িতে একটি মহিলাকে ব্যাগ হাতে উপরে উঠতে দেখলাম। আমায় পথ ছেড়ে দেবার জন্যে সে সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে চেয়ে রইল। তাকে কিছু দিবার জন্য খেয়ালের মাথায় পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, কিন্তু কিছুই না পেয়ে লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে চলে এলাম। একটা শব্দ হ'ল, বুঝলাম, সে আপিসের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। তার কিছু পরে টাকার ঝনছনানিও কানে এল।

সূর্য তখন দক্ষিণে হেলেছে, প্রায় বারটা বেজে গেছে। রাস্তায় এখানে সেখানে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে, গোটা শহরটাই জেগে উঠেছে যেন; শৌখিন লোকেরা তখন সাজগোজ করতেই ব্যস্ত। রাস্তায় কত রকম লোকেরই না আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়েছে— কেউ হাসছে কেউ গল্প-গুজব করছে। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম, দু-একজন চেনা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, তারা মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকজনের চলাচল দেখছিল। আমি পাশের একটা নতুন রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে চিন্তার জালে জড়িয়ে গেলাম।

মনে হ'ল, এই যে লোকগুলা রাস্তায় চলেছে, এরা কি সুখী! নিজেদের আনন্দেই এরা একান্ত বিভোর! একজনের মুখ দেখেও ত এটা মনে হয় না যে, এদের কারুর মনে এতটুকু দুঃখ আছে। কেউ বোঝাও বয়ে যাচ্ছে না, হয় ত কারুর মনে এতটুকু দুশ্চিন্তার মেঘও জমে নি, হয় ত এদের কারুর প্রাণে এতটুকু গোপন ব্যথাও নেই, এরা সত্যিই সুখী! আর আমি? এদেরই সঙ্গে চলেছি, আমার বয়সই বা আর কত! এদেরই মত যুবক আমি, অথচ সুখের ছায়া আমার মধ্যে খুঁজলেও মিলবে না।

পথ চলতে চলতে এই সব কথাই খালি মনে হচ্ছিল। মনে হ'ল, এ একটা বিরাট অবিচার। কি দুঃসহ দুঃখেই না আমার দিনগুলি কাটছে। কোন দিন যে জীবনে কিছুমাত্র সুখের স্বাদ পেয়েছি, তা

মনেও হয় না ; বরং যেখানে গেছি সব দিক থেকেই তাড়া খেয়েছি, কেউ এতটুকু সহানুভূতি দেখায় নি। নিরিবিলিতে কোথাও বসে যে একটু চিন্তা করব, তার জো নাই ! রাস্তায় বেরুলেই একটা না একটা ঘটনায় আমার মনের সমস্ত স্থৈর্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, আর কিছু করবারই শক্তি থাকে না। রাস্তায় একটা কুকুরের গায়ের উপরই গিয়ে পড়ি, কি কোন লোকের কোটের বুক পকেটের গোলাপ ফুলটাই দেখি, আমার মানসিক চাঞ্চল্য অতি সামান্য কারণেই বেড়ে যায় !

আচ্ছা, কেন আমার এই দুর্দশা ? ভগবান কি আমার উপর বিরূপ হয়েছেন ? কিন্তু কেবল মাত্র আমার উপরই কেন এ শাস্তির ব্যবস্থা ? দুনিয়ায় ত আরও কত লোক কাছে, তাদের কারুর উপর ত তাঁর এ অবিচার দেখতে পাওয়া যায় না ? এ সম্বন্ধে যতই ভাবি, কোন কূল-কিনারাই পাই না। দুনিয়ায় এত লোক থাকতে বিধাতা তাঁর খেয়াল মেটাতে আমাকেই কেন পছন্দ করছেন তা কিছুতেই বুঝিতে পারছি নে। বিশ্বের আর সবাইকে বাদ দিয়ে আমার উপরই যে কেন এ জুলুম, তা কে জানে ? আচ্ছা, বইয়ের প্রকাশক পাশা বা জাহাজ কোম্পানীর বড় সাহেব হেনচেনকেও ত পছন্দ করতে পারতেন ? কই, তাদের ত দিন দিনই ভুঁড়ি ফুলছে।

পথ চলতে চলতে যতই এ বিষয়টা তন্ন তন্ন ক'রে ভাবতে লাগলাম, ততই এ চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। দুনিয়াশুদ্ধ সকলের পাপের শাস্তি একমাত্র আমার ঘাড়ে চাপানোর বিরুদ্ধে বড় বড় যুক্তিও মিলে গেল। এটা স্রষ্টার খামখেয়ালের একটা চরম দৃষ্টান্ত। সামনেই বসবার একটা আসন পেয়ে ব'সে পড়লাম, কিন্তু তবু প্রশ্নটা আমায় ছাড়ল না, একেবারে পেয়ে বসল, আর কোন কথাই ভাবতে পারলাম না। সেই যে মে মাস থেকে আমার ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হ'ল, সেই দিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন থেকেই

দিন দিন আমার দুর্বলতা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে, কোথাও যেতে স্বভাবতই আমার ক্লান্তি আসে। এক ঝাঁক ছোট ছোট পোকা যেন কোন রকমে আমার দেহের মধ্যে ঢুকে আমায় ফাঁপা ক'রে ফেলছে।

তবে কি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমায় লোপ করতে চান? আসন ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলাম।

এই সময় আমার সকল সত্তা একেবারে চরম নির্বেদ ভোগ করছিল। বাহু দুটো দারুণ ব্যথায় টন্ টন্ করছিল, নাড়া-চাড়াও যেন করতে পারছিলাম না, কোন রকম অবস্থায় রেখেই এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। দীর্ঘকাল উপোস থেকে পেট ভ'রে খেয়ে অবধি ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল,—খাওয়াটা সত্যিই বেশি হয়েছে, কোন দিকে না চেয়ে সামনে পিছনে পায়চারি করতে লাগলাম। লোকজন সুমুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, অস্পষ্টভাবে তা নজরে আসছে। কখন্ যে দুটা লোক এসে আসনটা জুড়ে বসেছে তা টেরও পাইনি। তারা চুরুট ধরিয়ে জোরে জোরে কথাবার্তা জুড়ে দিতেই নজরে পড়ল। আমার বেশ রাগ হ'ল এবং তাদের কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কি মনে ক'রে আত্মসংবরণ করলাম। পার্কের অপর দিকে গিয়ে আর একটা আসন খালি পেলাম। তাতেই বসে পড়লাম।

ভগবানের চিন্তাটা আমার মনকে একেবারে জুড়ে বসল। যখনই কিছু করতে যাই, তখনই দেখি তিনি এসে বাদ সাধেন। আমি ত আর বেশি কিছু চাই নে, কোন রকমে দু-বেলা দু-মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে চাই, তাও কি পাব না?

যখনই অনেকদিন অনাহারে কেটেছে, তখনই মনে হয়েছে মাথায় যেন আর কিছুই নেই, মাথাটা যেন খুলি-সার, তার মধ্যে মস্তিষ্ক নামক পদার্থের এতটুকু অস্তিত্ব নেই। মাথাটা এত হালকা হ'য়ে পড়েছিল যে, কাঁধের উপরে তার অবস্থিতিটাই অনুভূত হচ্ছিল না। কোন দিকে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে দূরে নিবদ্ধ হয়, সেটা জানা ছিল।

বসে বসে এই সব ভাবছি। এহেন অবিচারের দরুন উত্তরোত্তর আমার মেজাজ বিধাতার বিরুদ্ধে বিলক্ষণ বিরূপ হয়ে উঠল। এমনি ক'রে শাস্তি দিয়েই যদি আমাকে তাঁর দিকে টানছেন ব'লে মনে ক'রে থাকেন তা হ'লে নিশ্চয়ই বলতে পারি যে, তিনি কিঞ্চিৎ ভুল বুঝেছেন। এক রকম চেঁচিয়েই আকাশের দিকে চেয়ে স্পর্ধা ভরে কথাগুলি আওড়ালাম, ছেলেবেলার শিক্ষার খানিক আবছা মনে হ'ল। সেই সুর ক'রে স্তব পাঠ করা—এখনও যেন কানে লেগে রয়েছে। অবজ্ঞা ভরে চেয়ে রইলাম। খেতে যে পাই নে সেটাই আমার দুঃখের কারণ নয়, কিন্তু এই দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আহারের সন্ধানেই বা কোথায় যাই? লোকে বলে, ভগবান সকলের জন্যই আহার যুগিয়ে থাকেন, তবে আমার জন্যও নিশ্চয়ই যুগিয়ে রেখেছেন। তাঁরই স্নেহস্পর্শ যেন অহরহ অনুভব করছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

দূর থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল। দুটো বেজে গেছে। লিখবার জন্যে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে গেলাম। পকেটে হাত দিয়ে খুঁজে পেলাম কামাবার টিকিটের খাতাখানা।* গুণে দেখলাম, আরও ছয়দিন কামানো চলবে। আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, তবু যাহোক, আরও হপ্তা দুই কামানো চলবে। এ কথা ভাবতেই একটু আরাম বোধ করলাম এই মনে করে যে, এখনও আমার সম্পত্তির মধ্যে এই নগণ্য সম্পদের অস্তিত্ব রয়েছে। খাতাখানা তখন আমার কাছে পরম বিত্ত, তাই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পকেটে রেখে দিলাম।

---

* নরওয়েতে খুব কম লোকেই নিজে নিজে কামায়। নাপিতেরা সস্তায় এক মাসের জন্যে টিকেট বিক্রি করে।

কিন্তু লিখতে পারলাম না। কয়েক পংক্তি লিখতে না লিখতেই চিন্তার ধারা বিভিন্ন খাদে চারিয়ে গেল এবং শত চেষ্টাতেও তাকে আর নিয়ন্ত্রিত কবতে পারলাম না।

সকল জিনিসই আমাকে একেবারে পেয়ে বসল এবং ক্রমে আমার মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সব কিছুই যেন নতুন ক'রে মনের মধ্যে রেখাপাত করে। মশামাছিও কম বিরক্ত করে না, যতই তাদের তাড়াতে চাই, তারা ততই জেঁকে এসে আমায় বিরক্ত করতে শুরু করলে। তাদের হাত থেকে যেন নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। অনেকক্ষণ ধরে এরা আমায় বিরক্ত করলে। কখন যে পা মেলে তাদের খেলা দেখতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলাম, জানতেও পারি নি। হঠাৎ একসঙ্গে পার্কের ব্যাণ্ড বেজে উঠল। চিন্তার ধারা নতুন খাদে ধেয়ে চলল।

লেখাটা শেষ করতে না পারায় নিরাশ হয়ে কাগজ-পেন্সিল পকেটে রেখে কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথাটা আমার তখন এত পরিষ্কার যে, অতি তুচ্ছ চিন্তার সূত্রও যেন অনায়াসে অনুসরণ করতে পারি। হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আমারই পায়ের দিকে। শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পাও যে কাঁপছে তা লক্ষ্য করলাম। একবার উঠে পায়ের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম— একটা ঝিম-ঝিমানি এসে আমার দেহ-মনকে এক অপূর্ব অবসাদে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে—এ রকমটা আর কখনও অনুভব করি নি। আপনা আপনিই চোখ জলে ভ'রে এল। এ কি দুর্বলতা? আপন মনে প্রশ্ন ক'রে হাত মুঠো ক'রে আপনার মনেই বার বার আওড়ালাম —দুর্বলতা! দুর্বলতা! এই ছেলেমানুষির জন্যে পরক্ষণেই নিজেকে উপহাস না ক'রে পারলাম না। চোখের জল রুদ্ধ করবার জন্যে চোখ বুজলাম।

পায়ের জুতা জোড়া যেন কখনও দেখি নি—এমনই ভাবে তাদের গড়ন বিশিষ্টতা ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। পা নেড়ে নেড়ে তাদের সেই শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করলাম, বর্তমান অবস্থা থেকে সে যে কোন্ রঙের ছিল, কোন্ আদিকালে তাদের বুরুস দিয়ে কালি লাগিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছিল, তা যেন এখন নিতান্ত বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। আমার প্রকৃতিটাও কতকটা এই জুতা জোড়ারই মত হয়ে গেছে, জুতা জোড়াই যেন আমার মনের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে, আমার মধ্যে যেন একটা উপদেবতার ভর্ হয়েছে।

অনেকক্ষণ এইসব ছেলেমানুষি নিয়ে আপন মনে বসে বসে খেলা করলাম। অজ্ঞাতে কখন্ এক ক্ষীণকায় বৃদ্ধ এসে বেঞ্চিখানার অপর পাশে বসেই আপনার মনে গুন্ গুন্ ক'রে একটা গানের কলি অস্পষ্টভাবে গাইতে লাগল।

তার এই অত্যদ্ভুত কণ্ঠস্বরে আঁৎকে উঠলাম। জুতার ভাবনা জুতাই ভাবুক। আমার এই যে চিত্ত-বিক্ষোভ তা গত দু-তিন বছর থেকেই আস্তে আস্তে আমায় পেয়ে বসেছে। মন থেকে সে ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে পাশের বৃদ্ধটিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আচ্ছা, এ লোকটির উপস্থিতি কি আমার মনে এতটুকুও রেখাপাত করেছে?—না ত, কিছুমাত্রও না। দেখলাম তার হাতে একখানা পুরানো খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপনগুলি আমার নজরে আসছিল, কৌতূহলও হ'ল, নজর ফিরাতে পারলাম না। কেবলই যেন মনে হচ্ছিল, খবরের কাগজখানা নেহাৎই অভিনব। কৌতূহল বেড়েই চলল, সামনে পিছনে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা দেখছিলাম। কি জানি কেন আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছিল, এ খবরের কাগজখানায় একটা প্রচণ্ড ষড়যন্ত্রের কাহিনী ছাপা রয়েছে।

লোকটা নীরবে চেয়ে ছিল। আচ্ছা, সকলের খবরের কাগজেই ত দেখতে পাই কাগজের নামটা বড় বড় অক্ষরে মুখপাতেই লেখা থাকে, এটায় ত কই নাম দেখছি নে। নিশ্চয়ই এর পিছনে একটা শয়তানি মতলব উঁকি মারছে। মনে হচ্ছিল, সে যেন দুনিয়ার কোন সম্পদের বিনিময়েই কাগজখানা হাতছাড়া করতে রাজী নয়, আবার পকেটে রাখতেও যেন সাহসে কুলোচ্ছিল না। বাজী রেখে বলতে পারি, ও কাগজখানার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছেই। কাগজখানার মধ্যে কি আছে তা জানবার সম্ভাবনা যতই নেই মনে হচ্ছিল, ততই আমার মন কৌতূহলে বিক্ষোভিত হয়ে উঠছিল। লোকটার সঙ্গে আলাপ করবার সূত্র বার করবার জন্যে তাকে একটা কিছু দিব মনে ক'রে পকেট হাতড়াতে লাগলাম। কামানর টিকেট বইখানাই হাতে উঠল, কিন্তু সেটা ফের্ পকেটেই রেখে দিলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, ও রকম ভাবে কিছু একটা দিতে চাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা হবে, তাই সহসা খালি বুক পকেটে চাপড় দিয়ে বললাম, 'একটা সিগারেট খাবে?'

'ধন্যবাদ! আমি সিগারেট খাইনে।'

লোকটি প্রায়-অন্ধ। চোখ বাঁচাতে গিয়ে ধূম্রপান ছাড়তে হয়েছে। ওর দৃষ্টিশক্তি কি অনেক দিন থেকেই খারাপ? তাই যদি হয়, ও ত কিছুই পড়তে পারে না, খবরের কাগজও নয়। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। ও আমার দিকে তাকাল; ওর সেই দুর্বল চোখ দুটিতে ক্ষীণ অসহায় দৃষ্টি। ভারী অস্বস্তি বোধ করলাম।

ও বললে, 'তুমি এখানে নতুন এসেছ?'

'হাঁ।'

ও কি ওর হাতের কাগজখানার নামও পড়তে পারে না?

তা হবে। সেই জন্যই ওর শোনার শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। আর সেই কারণেই আমি যে নবাগত সেটা ও শুনতে পেল।

ও বল্লে, 'আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি কোথায় থাক ?'

হঠাৎ মাথায় একটা মিথ্যা কথা যোগাল, আপনা থেকেই নির্বিকার-ভাবে মিথ্যা ব'লে গেলাম, '২ নং সস্ত ওলেভ প্লেস-এর প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে পর্যন্ত পরিচিত। সেখানে একটা ফোয়ারা, গোটা কয়েক লাইট পোস্ট, কয়েকটা গাছ আছে ; ওর সব মনে আছে।

'কয় নম্বরের বাড়ীতে থাক ?' ও আবার আমাক জিজ্ঞাস করল।

লোকটার হাত এড়াবার জন্যে উঠে পড়লাম। ওর ওই খবরের কাগজটাই আমার মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়েছে। তাই মন থেকে তা ছেড়ে ফেলবার সংকল্প করলাম, পড়তেই যখন পার না, তখন কাগজটা দিয়ে কি করবে ?'

আমার কথায় কান না দিয়ে লোকটা বললে, 'দু নম্বরে থাক বলছিলে না ? একদিন ছিল যখন দু নম্বরের প্রত্যেকটি লোককে আমি জানতাম। তোমার বাড়ীওয়ালার নাম কি ?'

ওর হাত এড়াবার জন্যে তৎক্ষণাৎ যা-তা একটা নাম বানিয়ে ব'লে তার মুখ বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু নাম শুনে ও ব'লে উঠল, 'তাই নাকি ?'

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। লোকটা আমার কাল্পনিক নামটা এমন সুরে আওড়ালে যে, নামটা যেন ওর নেহাৎই জানা।

ইতিমধ্যে লোকটা কাগজের বাণ্ডিলটা বেঞ্চির উপর রাখল, আমার কৌতূহল আবার জেগে উঠল। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, কাগজের মধ্যে এখানে দু চারটা মোম বাতিব দাগ রয়েছে।

ও জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, তোমার বাড়ীওয়ালা নাবিকের কাজ করে, না ?' তার কথার সুরে চাপা বিদ্রূপের কোন আভাসই পেলাম না।

ও আবার বললে, 'আমার যেন মনে হচ্ছে সে ওই কাজই করত বটে।'

'নাবিক'—মাপ করতে হচ্ছে। তুমি যার কথা বলছ, সে ওর ভাই হয় ত। ইনি অন্য কাজ করেন।'

মনে হ'ল, হয় ত এইখানেই শেষ হবে, কিন্তু যা-কিছু বলছি তাতেই দেখছি ওর যথেষ্ট অনুরাগ। মনে হ'ল ও নাম না ব'লে আর একটা অদ্ভুত গোছের নাম বললেও হয় ত ওর কোনই সন্দেহ জাগত না।

ও বললে, 'শুনেছি তিনি একজন কৃতী লোক!'

জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়! বেশ করিতকর্মা লোক। ব্যবসা বাণিজ্য বেশ বোঝেন, অনেক কিছুরই কারবার করেন। চীন দেশ থেকে জাম, রুশিয়া থেকে পাখীর পালক, তা ছাড়া, চামড়া, ভূষি, লিখবার কালি, আরও কত কি!'

লোকটি উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠল, 'তাই নাকি!'

ব্যাপারটা ভারী মজার হয়ে দাঁড়াল। আমি একটার পর একটা মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে ব'লে যেতে লাগলাম। আবার ব'সে পড়লাম, তখন আর খবরের কাগজের কথা আমার মনেও ছিল না। লোকটার অতিমাত্র সরলতা আমাকে বোকা বানিয়ে দিল। একটার পর একটা মিথ্যা ব'লে লোকটাকে স্তম্ভিত ক'রে দিচ্ছিলাম। ও আমার প্রত্যেকটা কথাই বিশ্বাস করছিল এবং তার জন্যে ওকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। আমি কিন্তু এতে ক'রে একটু নিরাশ না হয়েও পারলাম না। আমার ধারণা ছিল, লোকটা আমার বানানো কাহিনী শুনে একেবারে থ হয়ে যাবে কিন্তু আসলে সে সব কথাই মেনে নিল।

খুঁজেপেতে আরও গুটিকয়েক মিথ্যা মগজ থেকে আন্‌কোরা বার করলাম। লোকটাকে বললাম, 'আমার বাড়ীওয়ালা ন-বছর পারস্যের মন্ত্রীগিরি করেছেন। মন্ত্রী কাকে বলে তা হয় ত তোমার ধারণাই

নেই। ছোটখাট রাজা বা বাদশাহ বললেই চলে। বাড়ীওয়ালা একাই রাজ্যের সব কাজ করেছেন। তাঁর মেয়ে ল্যাজালি স্বর্গের অপ্সরী, একেবারে রাজকন্যার মত। তার তিন শ দাসী আছে। সে কৌচের উপর বসে থাকে। তার চাইতে সুন্দরী আমি আর দেখি নি।'

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'তাই নাকি? সত্যি সে অত সুন্দরী?' বলেই ও মাটির দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'সুন্দরী? সাংঘাতিক সুন্দরী, ভয়ানক সুন্দরী, চোখ দুটি উজ্জ্বল ডাগর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বাহু দুটি সুডৌল। তাঁর দৃষ্টিই যেন চুম্বন। সে যখন হেসে আমার দিকে তাকিয়ে ডাকে তখন আমার মধ্যে একটা ওলটপালট হয়ে যায়। আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকি। সে অপ্সরী, পরী, রাজকন্যা—'

লোকটা কিন্তু কিছুমাত্র দিশেহারা হ'ল না; কেবল বললে, 'তাই নাকি?'—ব'লেই আবার চুপ ক'রে গেল। ওর এই নীরবতা আমার ভাল লাগছিল না। নিজের কণ্ঠস্বরেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। গম্ভীরভাবে কথা বলতে লাগলাম, খবরের কাগজ বা তার মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের কাহিনী রয়েছে সে কথা একদম ভুলে গেলাম। কাগজের বোস্তানিটা তখনও আমার আর লোকটার মাঝখানে রয়েছে। বোস্তানির মধ্যে কি আছে জানবার এতটুকু আগ্রহও আর আমার নেই। লোকটাকে ভোগা দিতে গিয়ে যে কাহিনী গড়ে তুলছিলাম, তাতেই একেবারে ডুবে গেলাম। দেহের সমস্ত রক্তস্রোত মাথার মধ্যে চড়াও হ'ল। আমি থামাকাই অট্টহাসি হেসে উঠলাম।

লোকটা যেন তখনই চ'লে যাবে মনে হ'ল। উঠে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভেঙে বললে, 'আচ্ছা, তোমার বাড়ীওয়ালা কি জমিদার?'

ওর বেহায়াপানা আমাকে উত্যক্ত ক'রে তুললে। নামটা একবারও

ভুল হ'ল না। আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। লোকটার উপর বিতৃষ্ণাও হয়, আবার অনুকম্পাও আসে।

তাই জবাব দিলাম, 'আমি তা জানি নে।'

আমার উগ্রতা দেখে লোকটা চুপ ক'রে গেল। মনে মনে বললাম, 'যাও না, একবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রে এ'স। চাটুকার কোথাকার!'

লোকটা কি অদ্ভুত, আমার প্রত্যেকটা মিথ্যা খবরকেই সে সত্যি বলে মেনে নিয়েছে। বেশি কথাও বলে নি, পাছে আমি রেগে যাই।

কিন্তু সত্যি সত্যিই আমি রেগে গেলাম। গর্জন ক'রে বলে উঠলাম, 'পাজি কোথাকার! ভেবেছ, আমি এখানে ব'সে ব'সে যত সব গাঁজাখুরি নিছক মিথ্যে বুলি কেবল আউড়ে যাব! তোমার মত পাজির পা-ঝাড়া লোক ত কস্মিনকালেও দেখি নি! মতলবটা কি? তুমি কি ভেবেছ, আমি তোমারই মত লক্ষ্মীছাড়া ভিকিরী? তাই যদি ভেবে থাক ত জেনে রাখ যে, আমি সে অপমান কিছুতেই সইব না, —তা তুমি যেই হও না কেন!'

লোকটা বোকার মত মুখ কাচুমাচু ক'রে উঠে পড়ল এবং আমার কথাগুলি যেন নিঃশ্বাস না ফেলেই গিলে ফেললে, তারপর হঠাৎ বেঞ্চির উপর থেকে খবরের কাগজের বোস্তানিটা তুলে নিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমি ঝুঁকে পড়ে লোকটার যাওয়া দেখছিলাম। বুড়ো মানুষ যেমন ছোট ছোট পা ফেলে ত্রস্ত হাঁটে, লোকটাও ঠিক তেমনই হেঁটে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার মনে কেমন ক'রে যেন এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, এর মত বদমাশ দুনিয়ায় আর একটি নেই। ওকে যে তীব্র ভৎর্সনা করলাম, তার জন্তে মনে কোনরূপ ক্ষোভই হ'ল না।

দিনের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছিল—সূর্য পাটে বসেছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ এসে পড়েছে। বড়ঘরের আয়ারা সব এতক্ষণ গাছের ছায়ায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে গুলতান করছিল—এইবার তারা ঠেলাগাড়ীতে বাবা-লোগদের চড়িয়ে নিয়ে একে একে বাড়ী ফিরতে লাগল। আমার মেজাজ তখন বেশ শরিফ্। মনের যত-কিছু উষ্মা যত-কিছু উত্তেজনা আস্তে আস্তে যতই মিইয়ে আসছিল, ততই পা-টা যেন নেতিয়ে পড়তে লাগল, ক্লান্তিতে, অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। এতগুলি রুটি-মাখন খাওয়ার জন্যে আইঢাই ভাবটাও আর ছিল না। বেঞ্চির হাতলে মাথা দিয়ে কাৎ হয়ে চোখ বুজে ঝিমুতে লাগলাম। কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়্লাম জানতেও পারি নি, কিন্তু তখনই বাগানের একটা চৌকিদার এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, 'এখানে ব'সে ব'সে ঘুমোন চল্‌বে না বাবু' এটা শোয়ার জায়গা নয়, সরে পড়!'

'বেশ!' ধড়ফড় ক'রে উঠে দাঁড়াতেই দুর্ভাগ্যের কথাটা মনে পড়ে গেল। এ রকম আলসেমি করলে ত হবে না। কিছু যে করতেই হবে। এ ভাবে ত আর চলে না। চকরিই বা কোথায় পাই। চেষ্টারও ত কিছু কসুর করছি নে। প্রশংসাপত্রগুলিও নাড়াচাড়া করতে করতে পুরান হয়ে গেল। সেগুলি এমন সব লোকের দেওয়া যাদের বড় একটা কেউ চেনেও না, তাই সেগুলি কাজেও আসছিল না। সারাটা গ্রীষ্ম ভ'রেই ত কত জায়গায় উমেদারি করলাম, কিন্তু কই, কি হল? সব জায়গা থেকেই ত মিলেছে তীব্র ব্যর্থতা। ফলে কতকটা নিরাশ হয়েই পড়েছিলাম। ঘরভাড়া এখনও বাকী, আর দেরি করলে চলবে না। যেমন ক'রেই হোক, ভাড়াটা চুকিয়ে দিতেই হবে; তারপর, দিন যদি একবার পাই!

এক রকম অনিচ্ছার সঙ্গেই আবার কাগজ পেন্সিল হাতে তুলে

নিলাম। এবং কাগজের চার কোণে যন্ত্রচালিতের মত ১৮৪৮ সালটা কেন না-জানি লিখে ফেললাম। যদি আমার অজ্ঞাত চিন্তার একটা কণা ভাষা হয়ে একবার বেরিয়ে পড়ে তা হ'লেই ত হল। কেন, এমন দিনও ত গেছে, বড় বড় প্রবন্ধ আমি অনায়াসেই লিখে ফেলেছি, আর তা কিছুমাত্র খারাপও হয় নি।

বেঞ্চিতে বসে বসে সারা কাগজটা ভ'রে কেবল ১৮৪৮ সালটাই অসংখ্য বার লিখলাম। যত রকম কায়দায় সম্ভব, অক্ষরগুলি সাজিয়ে গেলাম—যদি সেই ফাঁকে মাথায় কিছু আসে তা হলে লিখে ফেলব কিন্তু কতকগুলি খাপছাড়া চিন্তা মাথায় এসে বায়োস্কোপের ছবির মত মিলিয়ে গেল। দিনের আলো যে শেষ হয়ে আসছে এই ভাবনায় আমার মাথা লজ্জায় নুয়ে আসছিল। শরৎকাল এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই যেন অসাড় নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। পোকা থেকেই শুরু। গাছপালায় মাঠে সর্বত্র ওদের সেই বেঁচে থাকার জন্মে কঠোর প্রচেষ্টা গুন্ গুন্ স্বরে প্রচারিত হচ্ছে। ওরা মরতে চায় না, বাঁচতে চায়; তার জন্মে ওদের সে কি আকুল আগ্রহ! চিরপদদলিত পতঙ্গকুল বেঁচে থাকবার জন্মে কি চেষ্টাই না করছে! ওদের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে। ওরা ওদের সবুজ মাথা ঘাসের গোড়ায় ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে কাঠ মেরে যাচ্ছে, তারপর সামান্য বাতাসে এখানে সেখানে গিয়ে উড়ে পড়ছে।

. প্রত্যেক বাড়ন্ত জিনিসেরই একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, শীতের প্রারম্ভে তার সেই ঠাণ্ডা হাওয়া বেশ আরাম দেয়। গাছের পাতা ঝড়ে পড়ে—মনে হয় যেন গুটিপোকা।

শরতের মর্ম্ম। আবার মহোৎসব লেগে গেছে। গোলাপ বাগিচায় চলেছে রঙের হেঁয়ালি।

জীবনের মূলে মরণের টান বড় বেশি ক'রেই যেন অনুভব করতে লাগলাম। প্রাণশক্তি যেন আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে আসছে।

বেঁচে থাকবার প্রয়োজনও যেন নেই আর। ভাগ্যের এই নির্মম মূর্তি কল্পনা ক'রে আমি আঁতকে উঠে দাঁড়ালাম। এবং সামনের রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড পদবিক্ষেপ শুরু করলাম। দু-হাত জোরে জোরে চেপে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠলাম, 'না,—তা হবে না! এর শেষ কোথায় দেখতে হবেই।' আবার বেঞ্চিতে বসে পড়লাম এবং কাগজ পেন্সিল নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে একটা প্রবন্ধ লিখতে শুরু ক'রে দিলাম।

এ ছাড়া যে কোন উপায় নেই—কল্পনায় দেখছিলাম, বাড়ীভাড়া যেন তার সেই ভীষণ মূর্তি নিয়ে আমার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে।

ধীরে—অতি ধীরে ভাবগুলা বিধিবদ্ধ হ'ল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলাম এবং অনায়াসে লিখেও গেলাম। লেখাও যে ভালই হ'ল তাও বুঝতে পারছিলাম। ভূমিকাস্বরূপ কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এ লেখাটি যে-কোন লেখার গোড়াতেই বসান যায়। হয় একটা ভ্রমণকাহিনী, নয় ত একটা রাজনৈতিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখব বলেই স্থির করলাম। মোট কথা, যে-কোন একটা ভাল লেখার গোড়াপত্তন এর দ্বারা হতে পারে। কাজেই কোন্ বিষয় নিয়ে কলম চালাব তাই মনের মধ্যে আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজতে লাগলাম। কেবল একটা ঘটনা বা কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য ক'রে লেখা চলতে পারে; কিন্তু মাথায় কিছুই আসছিল না। তার উপর এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিধা, আবার সঙ্কোচ এসে আমার কেন্দ্রীভূত চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল। মনে হ'ল, মাথা একেবারে খালি, তাতে মগজ যেন এতটুকুও নেই। মাথাটা নেহাৎই অনাবশ্যক-ভাবে কাঁধের উপর বসে আছে। যেন কিছু করবার সঙ্গতিই নেই। সকল ইন্দ্রিয় দিয়েই অনুভব করছিলাম যে, মাথার খুলি একেবারে ফাঁপা। দেহের কোথাও যেন কিছু নেই—সবই যেন ফাঁপা, সবই যেন ফক্কুর।

গভীর বেদনায় আমি চীৎকার ক'রে বলে উঠলাম, 'হা ঈশ্বর, এ কি করলে!'

বার বার কথাটা আওড়াতে লাগলাম।

শন্ শন্ ক'রে হাওয়া বইছিল। ভাবলাম, ঝড় হবে। আরও খানিকক্ষণ সেখানে ব'সে ব'সে লেখা কাগজগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কেন্দ্রীভূত চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে কাগজগুলি ভাঁজ ক'রে পকেটে রেখে দিলাম। ঠাণ্ডা লাগছিল, ওয়েস্ট কোটটাও গায়ে নেই, কোটের সবগুলা বোতাম বেশ ক'রে এঁটে দিলাম। পকেটে হাত ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলাম।

এই সময়টায় যদি প্রবন্ধটা লিখতে পারতাম, যদি শেষ করতে পারতাম একবার! দুই-দুইবার বাড়ীওয়ালি আমার দিকে দৃষ্টি হেনে বাড়ীভাড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। অনুপায় হয়ে লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে! কিন্তু কত দিন আর এমনই ক'রে পালিয়ে পালিয়ে থাকব? এবারে যখন তার চোখের সামনে পড়ব তখন কি জবাব দিব নিজেকে?—না, এ আর চলতে পারে না।

পার্কের ফটকের কাছে এসে পৌছতেই দেখতে পেলাম, সেই বুড়োটা—যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—একটা বেঞ্চিতে বসে জিরোচ্ছে। সেই রহস্যের আধার খবরের কাগজখানা তার পাশেই খোলা পড়ে রয়েছে, তাতে নানা রকম খাবার রয়েছে, সম্ভবত সে তখন খাচ্ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে আমি যে দুর্ব্যবহার করেছি তার জন্যে তার কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু তার খাওয়া দেখেই বাধা পেলাম। সে তখন তার জীর্ণ হাতে মাখম-মাখানো রুটিগুলা অসভ্যের মত গিলছিল। আঙুল ত নয়, থাবা! মনটা কেমন হয়ে গেল, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই বার হয়ে গেলাম। সে কিন্তু আমায় চিনতে পারে

নি ; সে তার ছুটো চোখ দিয়েই আমার দিকে কট্‌মট ক'রে তাকালো। সে দৃষ্টি একেবারে প্রাণহীন, মুখের কোন অংশ একটুকুও কুঞ্চিত হ'ল না।

অনায়াসে পথ চলতে লাগলাম। অভ্যাস মত পথে যতগুলি খবরের কাগজের প্রাচীরপত্র দেখতে পেলাম, সেগুলি পড়বার জন্যে খানিকক্ষণ ক'রে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলাম। আশা, যদি কোথাও চাকরি খালি থাকে। সুখের বিষয়, আমি চেষ্টা করতে পারি এমন একটি বিজ্ঞাপনও আমার নজরে পড়ে গেল।

এক মুদীর দোকানে খাতাপত্র লিখবার জন্যে একজন মুহুরি দরকার। সপ্তাহে ঘণ্টা কয়েক মাত্র খাটুনি। দেখা ক'রে মাইনে ঠিক করতে হবে। মুদীর নাম ও ঠিকানা টুকে নিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে নীরবে আবেদন জানালাম—কাজটি যেন হয়। এ কাজের জন্যে অন্যে যা দাবি করবে আমি তার চাইতে কমই চাইব নিশ্চয়। যত কমই হোক না, বর্তমান অবস্থায়, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট বলতে হবে।

বাড়ী গিয়ে আমার টেবিলের উপর বাড়ীওয়ালির এক তাগিদ চিরকুট দেখলাম। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে, অতঃপর ঘরভাড়া তিনি আগাম চান। আমার অসুবিধে হ'লে অবিলম্বে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। এতে অবশ্য আমার ক্ষুণ্ণ হবার কোনই কারণ নেই, এ ছাড়া যে তারও আর কোন উপায় ছিল না। বাড়ীওয়ালি লোকটা ভাল সন্দেহ নেই।

যে যাই হোক, দরখাস্ত একখানা লিখে লেপাফা দুরস্ত ক'রে তখুনিই ডাকে দিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে আমার দোলনা-চেয়ারখানায় বসে কত কি ভাবতে লাগলাম। ক্রমে অন্ধকার জমে আসছিল। বেশি ক্ষণ থাকাও সম্ভব ছিল না।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখি

তখনও বেশ আঁধার আছে। একটু পরেই নীচের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা বেজে গেল। আমি আবার ঘুমুতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম আর এল না। তখন রাজ্যের ভাবনা-চিন্তা এসে আমাকে পেয়ে বসল।

হঠাৎ আমার মাথায় এমন গোটাকয়েক কথা এসে গেল, যা একটা ছোটগল্পের ভূমিকায় বেশ লাগসই। যেমন তার ভাষার বাঁধুনি, তেমনই সৌন্দর্য—এমনটা কিন্তু আর কখনো হয় নি। শুয়ে শুয়ে কথাগুলি বার বার আওড়াতে লাগলাম। পর পর আর কতগুলি এসে এদের সঙ্গে ভিড় ক'রে জুটে গেল। আমি বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠলাম। লাফ দিয়ে উঠে ভাঙা টেবিল থেকে কাগজ-পেন্সিল কুড়িয়ে নিলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, না লিখলে যেন আমার একটা শিরা ছিঁড়ে যাবে; শব্দের পর শব্দ যোজনা ক'রে অল্প সময়ের মধ্যেই একটা লেখা শেষ ক'রে ফেললাম। কত কথা আমার মাথায় এসে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যেতে লাগল; আমার মন তখন একটা পরিপূর্ণ খুশিতে ভ'রে গেল। আমি যেন সব মুখস্থ কথা লিখছি, এমনই তাড়াতাড়ি লিখে চললাম—মুহূর্তের জন্যও আমার কলম থামছিল না।

ভাবগুলি আমার মাথায় এত দ্রুতগতিতে আসছিল যে, পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলম চালিয়েও আমার মনের সে ভাবসম্পদকে অক্ষরে ধরে রাখতে পারছিলাম না। অনেক ভাল ভাল জিনিসই হাতছাড়া হয়ে গেল। ভাবগুলি যেন আমার চারিদিক থেকে আক্রমণ করেছে; বিষয়টি আমার সম্পূর্ণ অধিগত, এবং তার প্রত্যেকটি শব্দই যেন ঝরনাধারার মতই বার হয়ে আসছিল। এই অত্যদ্ভুত ভাবটি বেশ খানিকক্ষণ আমার অধিকারে রইল—এবং শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমানে তা সচল ছিল। পনর-বিশ পৃষ্ঠা লেখা হ'য়ে গেল, তখন লেখা থামিয়ে পেন্সিলটি একপাশে রেখে দিলাম। এই লেখাটি যে অমূল্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আমার ছিল না। কাজেই চট্ ক'রে জামা-

কাপড় পরবার জন্যে উঠে পড়লাম। তখন বেশ ফরসা হয়ে আসছিল—সেই আলোকে দরজার পাশে দেয়ালে মোড়া খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন স্পষ্ট পড়তে পারছিলাম। কষ্টেস্বষ্টে লেখাপড়া করা যেতে পারে। লেখাটা পরিষ্কার ক'রে টুকে ফেলতে আরম্ভ ক'রে দিলাম।

আমার এই কল্পনাগুলি থেকে আলো ও রঙের এক অদ্ভুত উগ্র বাষ্প বার হতে লাগল। লেখার মধ্যে একটির পর একটি সুন্দর জিনিস দেখে মনটা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল এবং আপনার মনে এ কথা স্বীকার না ক'রে পারছিলাম না যে, এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু আমি পড়ি নি। মাথাটা যেন খুশির স্রোতে ভাসতে লাগল। খুশিতে আমি একেবারে ফুলে উঠলাম; শব্দসম্পদ যেন হঠাৎ আমার অসম্ভব রকম বেড়ে উঠল।

লেখাটা বার কয়েক নেড়ে চেড়ে আপনার মনে তার মূল্য-নিরূপণ করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। আমার মনে হ'ল যে, অন্তত পাঁচ টাকা যে লেখাটা দেওয়া মাত্রই পাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পাঁচ টাকা সম্বন্ধে যে দর কষাকষি হতে পারে এ কথা কারুর মনেই আসে না—কেন না, লেখার তুলনায় দশ টাকা হ'লেও খুব সস্তা বলেই মনে হবে।

এ রকম চমৎকার লেখা বিনি পয়সায় ছাড়ার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না। আমি বেশ জানি যে, এ রকম গল্প যার-তার কলম থেকে যখন তখন মিলে না, কাজেই দশটা টাকা অন্তত চাই-ই।

ক্রমে ঘরে আলো এসে পড়ল—দেয়ালের গায়ের খবরের কাগজের ছোট ছোট হরফগুলি পড়তেও আমার এতটুকু কষ্ট হচ্ছিল না। তখন ঘড়িতে মাত্র ছয়টা বেজেছে।

মেঝের উপর দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলাম, বাড়ীওয়ালির তাগিদ ঠিক সময়েই এসেছে; এ ঘরটা সত্যিই আমার মত লোকের বাসের

যোগ্য নয়, জানলায় নেহাৎ সাধারণ নীল রঙের পর্দা, দেওয়াল খবরের কাগজে মোড়া ; খেতে জোটে না, এক কোণে যে তথাকথিত দোলা চেয়ারখানা রয়েছে তাকেও দোলা-চেয়ারই বলতে হচ্ছে, অথচ যার মাথায় এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান আছে, সে-ই এ চেয়ারটাকে দেখে হেসে উঠবে। কেন না, বয়স্কের পক্ষে চেয়ারখানা নেহাৎই নীচু এবং একবার কষ্টেসৃষ্টে বসলে উঠতে হয় একান্তই কায়ক্লেশে। এক কথায় বলতে গেলে এ ঘরটার চারপাশে এমন একটা আবহাওয়া আছে—যাতে জ্ঞানার্জনের পথ একান্তই রুদ্ধ। এই কারণে ঘরটা ছেড়ে দেব ছেড়ে দেবই মনে করছি। এ ঘর কিছুতেই আর রাখা চলতে পারে না। নিজের উপর এতদিন অবিচারই করেছি ; না, আর না, এই গহ্বরে বাস করা আর চলবে না কিছুতেই।

লেখাটা বার বার পকেট থেকে বের ক'রে প'ড়ে আশায় আনন্দে আমার মন ভরে উঠছিল। এবারে মন দিয়েই আমায় লেখা শুরু করতে হবে, তা ছাড়া উপায় নেই ! কাগজের বোস্তানিটা, গোটা কয়েক কলার, রুটি-মোড়া খানকয়েক পুরোনো খবরের কাগজের টুকরো—সবকিছু লাল রঙের একখানা রুমালে বেঁধে ফেললাম। কম্বলখানা গুটিয়ে নিয়ে সাদা কাগজ ক'খানা ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখলাম। তারপর ঘরের প্রত্যেক কোণ আঁতিপাতি ক'রে খুঁজে দেখলাম—কিছু রয়ে গেল কি-না। কিছুই যখন নজরে পড়ল না, তখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একবার বাইরে তাকালাম।

সকালটা বিষণ্ণ। আগুনে পোড়া কামারশালায় কাউকে দেখা গেল না। উঠানে ভিজা কাপড় তখনও ঝুলছিল। সবই আমার চির-পরিচিত। জানলা থেকে স'রে এসে ভাঁজ করা কম্বলখানা কাঁধে তুলে নিয়ে দেয়ালে মোড়া খবরের কাগজে সেই বাতি-ঘর ও রুটিওয়ালার বিজ্ঞাপনের সামনে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলাম। দরজা খুলে ঘরের

বার হব, এমন সময় সহসা বাড়ীওয়ালির কথা মনে প'ড়ে গেল, তাকে ত না জানিয়ে যাওয়া চলে না ; সে জানুক, দরিদ্র হ'লেও একটি সৎ লোককেই সে এতদিন ঘর ভাড়া দিয়েছিল।

সে যে আমাকে দিন কয়েক বেশি থাকতে দিয়েছে এজন্যে তাকে লিখে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হ'ল। কিছু দিনের মত ত আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এই নিশ্চিন্ত ভাবটা আমার মনে নিশ্চিত হয়েই দেখা দিল, কাজেই তাকে একদিন পাঁচ শিলিং দেব বলে প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিলাম, লিখলাম, এ পথ দিয়ে যেতে আসতে একদিন এসে টাকাটা দিয়ে যাব।

তা ছাড়া, এতদিন তার ঘর যে ব্যক্তি ভাড়া নিয়েছিল সে যে সত্যি সত্যিই একজন সাউকার লোক, এটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

টেবিলের উপর চিঠিখানা রেখে ঘরের বার হয়ে পড়লাম।

ঘরের বাইরে এসে দরজার সামনে আর একবার দাঁড়ালাম, পিছন ফিরে তাকিয়ে চারিদিকে নজর দিতেই স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কথা মনে পড়ে গেল। আমার প্রতি তাঁর অসীম করুণার জন্যে তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে প্রাণের একান্ত শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করলাম।

আমি জানতাম—জানতাম, তাঁর করুণার জন্যে কাল যে আকুল প্রার্থনা করেছিলাম, আজ তার ফলেই আমার প্রাণে লিখবার এই প্রেরণা এসেছে। এ একান্তই দৈব-প্রেরণা।

আপন মনে ব'লে উঠলাম—এ ভগবানের দান, এ তাঁরই দান। বলতে বলতে আনন্দে আমার কান্না এল। কান খাড়া ক'রে শুনলাম, সিঁড়িতে কারুর পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে কি না ? এবারে যাত্রার জন্যে তৈরি হলাম। নিঃশব্দে গা-ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর বার হয়ে পড়লাম।

অতি ভোরে বৃষ্টি হয়েছিল। পথঘাট তখনও পিছল হয়ে চক্‌চক্‌ করছিল। সারা শহরটার উপর এঁদো আকাশটা যেন ঝুলে রয়েছে। কোথাও এক ফোঁটা রোদ দেখা যাচ্ছে না। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—এমন দিনে কি মিলবে! টাউন হলের দিকে হেঁটে চললাম। দেখি তখন সবে সাড়ে আটটা বেজেছে। এখন আরও ঘণ্টা কয়েক ঘুরে বেড়াতে হবে; কেন না, দশটা-এগারটার আগে সম্পাদকের কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই—ততক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে, কিছু খেয়ে নিতে পারলে অবশ্য ভাল হত। সে যাই হোক, আজও যে না-খেয়েই রাত কাটাতে হবে না এ ভরসা রয়েছে। সেদিন আর নেই। ভগবানের অসীম করুণা! দারুণ দুঃস্বপ্নের মত যেন দু-দিন কেটে গেছে। আজ আমি এ সবের একটু উপরে!

কিন্তু কম্বলটা নিয়ে খুব মুশ্‌কিলেই পড়ে গেলাম। হাজার লোকের চোখের সামনে দিয়ে এইভাবে কম্বলটা বয়ে বেড়াতে ভারি সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল। লোকে না-জানি কি ভাবছে! চলতে চলতে মনে হ'ল, আচ্ছা, এটা কোথাও রেখে দেওয়া চলে না? হঠাৎ মনে হ'ল, কোন একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে বেশ ক'রে 'প্যাক' করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাতে যে শুধু দেখতেই ভাল হবে তাই নয়, ব'য়ে বেড়াতেও আর লজ্জা করবার কিছুই থাকবে না।

সামনের একটা দোকান দেখে ঢুকে পড়লাম। একটি ছোক্‌রাকে কম্বলটা প্যাক্‌ ক'রে দিতে হুকুম করলাম।

ছেলেটা প্রথমে কম্বলটার দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে। মনে হ'ল, সে আমার হাত থেকে কম্বলটা নিয়ে আপন মনে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। আমার মেজাজটা চড়ে গেল। আমি তাকে এক রকম চীৎকার ক'রেই বললাম, 'ওহে ছোকরা, একটু ভব্যতা শেখো। যে রকম হেলাফেলার সঙ্গে কম্বলটা নাড়াচাড়া করছ, তাতে ওর মধ্যে

দামি যে ঠুন্‌কো জিনিস আছে তা ভেঙে যাবে। মোড়কটা, আমায় এ ডাকেই স্মার্না পাঠাতে হবে।'

কথাটা বেশ কাজে এল। ছেলেটা তার অঙ্গ চালনায় এমন ভাব দেখাল যেন কম্বলটার মধ্যে যে ঠুন্‌কো কিছু থাকতে পারে সেটা তার মনেই হয় নি। ছেলেটি সযত্নে কম্বলখানা 'প্যাক' ক'রে আমার সামনে ধ'রে দিল। আমি তাকে এমনই ভাবে ধন্যবাদ দিলাম যেন স্মার্নাতে আমি হামেসাই দামি জিনিসপত্র পাঠিয়ে থাকি। দোকান থেকে, বেরিয়ে আসবার সময় ছেলেটি আমায় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দু-দুবার সেলাম করলে।

বাজারে ঢুকে যে দিকে মেয়ে-দোকানীরা পণ্যদ্রব্য নিয়ে দিক আলো ক'রে বসে রয়েছে সেই দিক দিয়েই আমি ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। এক জায়গায় দেখলাম, একটি মেয়ে কতকগুলো গাঢ় লাল গোলাপ ফুল নিয়ে বসে আছে। তার কাছ থেকে জোর করে একটি গোলাপ ছিনিয়ে নেবার দুষ্প্রবৃত্তি হল। মেয়েটির নিকটতম সান্নিধ্য পাবার আশায় খামকা দাম জিজ্ঞাসা করলাম।

ট্যাকে আর্জ পয়সা থাকলে নিশ্চয়ই একটি ফুল কিনতাম। এখন থেকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সঞ্চয় না করলে আর চলছে না।

দশটা বেজে গেছে। খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি সহকারী সম্পাদক মহাশয় কাঁচি হাতে ভারি ব্যস্ত হয়ে এ-কাগজ সে-কাগজ থেকে লেখা কেটে কেটে ছাপতে দিচ্ছেন। সম্পাদক তখনও এসে পৌছন নি। সহকারী চোখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রয়োজন? জবাবে লেখাটি তার সম্মুখে ধরে দিলাম। লেখাটা যে সত্যিই একটু অসাধারণ সেই ভাবটা হাবভাবে প্রকাশ না ক'রে পারলাম না। তাকে বললাম, "সম্পাদক' মশায় আসা মাত্রই যেন এটা তাঁকে দেওয়া হয়।"

লেখাটা মনোনীত হল কি-না জানবার জন্তে বিকেলের দিকে আবার এসে খবর নিয়ে যাব এ কথাও বলে এলাম।

লোকটা মাথা না তুলতেই বললে, 'বেশ, তাই হবে।' এই বলে ফের ঘাড় গুঁজে কাজে মন দিলে।

মনে হ'ল, লোকটা যেন লেখাটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই গ্রহণ করলে; কিন্তু আমি আর কিছু না ব'লে অভ্যাস মত অভিবাদন ক'রে চলে এলাম।

হাতে এখন অঢেল সময়। একবার যদি লেখাটা পছন্দ হয়!

দিনটা ভারী বিশ্রী—হাওয়াও নেই, স্বস্তিও নেই, যেন কেমন একটা মনমরা ভাব। পাছে জল হয় এই আশঙ্কায় মেয়েরা ছাতা হাতে নিয়ে চলেছেন, লোকগুলির মাথায় পশমের টুপি—দেখতে ভারি বীভৎস; মানুষের উৎসাহকে একদম দমিয়ে দেয়। বাজারটা আর একবার ঘুরে এলাম। শাকসবজি ও গোলাপ ফুলের দোকানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত স্বরে কে একজন অভিবাদন ক'রে কাঁধে হাত দিলে। পিছন ফিরে প্রত্যভিবাদন ক'রে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। লোকটা কে?

সন্ত প্যাক-করা পুঁটলিটা আমার হাতে দেখে একটু কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মধ্যে কি আছে?'

'ও, জামার-কাপড় নিয়ে এলাম।' আমার স্বরে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। তাকে বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, 'কাঁধে হাত দেওয়া আমি পছন্দ করি নে, জান?'

লোকটা একটু অবাক্ হয়ে আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। একটু পর জিজ্ঞেস করলে, 'ভাল কথা, আজকাল কেমন আছ?

'বেশ আছি।'

'তা হ'লে কাজ পেয়েছ বল

'কাজ ?—হাঁ, তোমাদের আশীর্বাদে সওদাগরী আপিসের হিসাব বিভাগে একটি ভাল কাজই পেয়ে গেছি।

'তাই নাকি ? বেশ বেশ, ভাল !' বলেই সে আরও খানিকটা এগিয়ে এল ! তার পর বললে, 'খবরটায় সত্যিই খুব খুশি হলাম। এখন দানখয়রাতে টাকাটা উড়িয়ে না দাও তবেই মঙ্গল। তা হ'লে আসি !'

এই বলেই সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মুহূর্ত পরেই মুখ ফিরিয়ে সামনে এসে বল্‌লে, 'জামা তৈরি করতে চাও ত আমাদের দর্জিকে ব'লে দিতে পারি। তার চেয়ে ভাল দর্জি তুমি পাবে না, এ কথা জোর ক'রেই বলা যেতে পারে। বল ত তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েও দিতে পারি।'

আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। কে তার পরামর্শ চায় ? আমি কোন্‌ দর্জি দিয়ে জামা করাব তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা কেন ? সেই টেকো নবাব-পুত্তুরের গায়ে-পড়া ব্যবহারে আমার মেজাজ ক্রমেই চড়ে যাচ্ছিল, তাই অনেকদিন আগে সে আমার কাছ থেকে যে পাঁচটা টাকা ধার নিয়েছিল সেই কথাটাই একটু অকরুণ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিলাম। কিন্তু সে জবাব দেবার আগেই তাগাদা করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললাম, 'কিছু মনে ক'রো না ভাই !' আমার তখন ভারী লজ্জা করতে লাগল, আমি আর তার চোখে চোখে চাইতে পারছিলাম না ; ঠিক এমনই সময় একটি মহিলা এসে পড়ায় তাকে পথ দিবার জন্যে তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়ালাম এবং এই সুযোগে পথ চলতে শুরু ক'রে দিলাম।

দেরি আমায় করতেই হবে, অথচ এই দীর্ঘ সময়টা যে কি করে কাটাব—ভেবে পাচ্ছিলাম না। কোন একটা চায়ের দোকানে গিয়ে যে সময়টা কাটিয়ে দেব তারও জো নেই—ট্যাঁকে একটি পয়সাও নেই। তা ছাড়া, এমন কোন আলাপী লোক নেই যার সঙ্গে দেখা ক'রে সময়টা

কাটিয়ে দিতে পারি। যাদের বাড়ী যেতে পারতাম তারা সকলেই এখন কাজে চলে গেছে। তাই আপন মনে সিধে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। একটা খবরের কাগজের অপিসের সামনে গিয়ে সেদিনকার টাঙানো কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে গীর্জা'র পাশের বাগানটায় ঢুকে একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। সেখানে তখন লোকজন বড় কেউ ছিল না।

সেই ঘুমন্ত নিস্তব্ধতার মাঝে শিশ্রী স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় বসে অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম। হেঁটে হেঁটে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, দারুণ অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছিল, চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। এদিকে শীতে সর্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপে।

মনে হ'ল, গল্পটা কি সত্যই খুব ভাল হয়েছে? কে জানে! লেখাটার জায়গায় জায়গায় যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারি না। গল্পটা ওরা নেবেই এমন কথাও বলা চলে না। হয় ত একান্ত খেলো গল্পই হয়েছে, হয় ত বা কিছুই হয় নি। ইতিমধ্যেই যে লেখাটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় পায় নি তারই বা নিশ্চয়তা কি? এতক্ষণ ভরসায় ছিলাম, কিন্তু এখন যেন মনটা সন্দেহাকুল হয়ে পড়ে। লাফ দিয়ে উঠে ঝড়ের বেগে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

একটা দোকানে উঁকি মেরে দেখলাম। সবে দুপুর পার হয়েছে। বিকেল চারটার আগে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা ক'রে কোন লাভ নেই। গল্পটার কি গতি হ'ল জানবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। লেখাটা সম্বন্ধে যতই ভাবতে লাগলাম ততই মনে হল যে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় অস্থির মস্তিষ্ক নিয়ে তাড়াতাড়ি যে লেখা লিখেছি তা মনোনীত না হওয়াই সম্ভব। হয় ত মিছেমিছি সারাটা সকাল আমি নিজেকে প্রতারিত করে খুশি ছিলাম! ... তাই কি! ... আর কিছু মনে না ক'রে ত্রস্তপদে রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে খোলা ময়দানে এসে পড়লাম।

এ-ধারে ও-ধারে পড়ো জমি, দু-একটায় চাষবাসও হয় ত কিছু কিছু হয়েছে। শহর ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে এসে পড়লাম। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ।

ঠিক করলাম, এখানেই থেমে ফিরে যাব। এতটা পথ হেঁটে আমার গা দিয়ে গরম ছুটতে লাগল। মাথা নীচু ক'রে ধীরে ধীরে ফিরে চললাম। রাস্তায় দুটো খড়-বোঝাই গাড়ী চলেছে। গাড়োয়ান দুটো খড়ের গাদার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে গান ধরে দিয়েছে। দু'জনারই মাথায় টুপি নেই ; গোলগাল মুখ। দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়েই যে তাদের জীবনস্রোত বয়ে চলেছে, তাদের চেহারাতেই সেটা বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তাদের কাছাকাছি যেতেই আমার মনে হ'ল যে, তারা নিশ্চয় আমাকে সম্ভাষণ করবে, ঠাট্টা বিদ্রূপও করতে পারে। প্রথম গাড়ীখানা সামনে এসে পড়তেই গাড়োয়ান আমার হাতে যে পুঁটুলিটা রয়েছে তাতে কি আছে জানতে চাইল।

'একটা কম্বল !'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'টা বেজেছে মশায় ?'

ঠিক বলতে পারলাম না, তবে গোটা তিনেক হবে হয় ত।'

জবাব শুনে তারা দুজনেই হেসে উঠল এবং গাড়ী হাঁকিয়ে চলল। সেই মুহূর্তে আমি যেন একটা তীব্র কশাঘাত অনুভব করলাম। টুপিটা একবার নড়েই মাথা থেকে পড়ে গেল। নগণ্য গাড়োয়ানও আমার সঙ্গে একটু তামাসা না ক'রে ছাড়লে না ! কি করব, ঠিক করতে না পেরে একটা হাত মাথায় বুলিয়ে রাস্তার একপাশে থেকে ধূলো-মাথা টুপিটা তুলে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগলাম। খানিকটা এসে একটা লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, চারটা বেজে গেছে। চারটা বেজে গেছে ! এরই মধ্যে চারটা বেজে গেল ! আমি একরকম দৌড়েই শহরের দিকে ছুটতে লাগলাম এবং খবরের কাগজের আপিসের পথ ধরলাম।

সম্পাদক মশায় সম্ভবত অনেকক্ষণ আপিসে এসেছেন; হয় ত ইতিমধ্যে কাজ শেষ ক'রে চলেও গেছেন। আমি দৌড়তে লাগলাম, রাস্তার পথচল্‌তি লোক ও গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়ে সকলকে পিছনে ফেলে পাগলের মত হাঁপাতে হাঁপাতে আপিসে গিয়ে পৌঁছলাম। দরজা ভেজান ছিল, কোন রকমে খুলে ভিতরে ঢুকে চার লাফে সিঁড়িগুলা ডিঙিয়ে উপরে গিয়ে হাজির হলাম। এবং দরজায় আঘাত করলাম।

কোন সাড়া শব্দ এল না।

সম্পাদক তা হ'লে চলে গেছেন। চলে গেছেন! সত্যি? আর একবার দরজায় ঘা দিয়েই ভিতরে ঢুকে গেলাম। সম্পাদকপ্রবর তাঁর আসনেই বসে আছেন, সামনে প্রকাণ্ড টেবিল, হাতে কলম, জানলার দিকে চেয়ে আছেন। কি যেন লিখবেন, সেই সম্বন্ধে ভাবছেন। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁকে সম্ভাষণ করলাম, তিনি আমার দিকে ফিরে আড়চোখে একবার তাকালেন এবং মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনার লেখাটা পড়ে উঠতে পারি নি।'

সম্পাদকের জবাবে আমি বরং খুশিই হলাম, কেন না, লেখাটা তাহ'লে অমনোনীত হয় নি! বললাম, 'বেশ! আমার তাড়াহুড়ো কিছু নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই—'

হাঁ, তা হবে। তাছাড়া আপনার ঠিকানাও ত লেখার সঙ্গে রয়েছে। আসতে হবে না, আমিই খবর পাঠাব।'

তাকে বলতে পারলাম না যে, আমার এখন আর কোন ঠিকানা নেই। কিন্তু সে কথা ত আর তাঁকে বলা যায় না। অভিবাদন ক'রে চলে এলাম। আবার আশা হ'ল। এখনও আশা আছে— হয় ত লেখাটা ওঁর মনোমতই হবে। অজ্ঞাতসারে কখন্ যে আমার মাথায় এল, সুরলোকে আমার লেখা নিয়ে এক পরামর্শ-বৈঠক বসেছে। লেখাটার জন্যে দশটা টাকা নিশ্চয়ই পাব।

রাত্রে কোথায় থাকি! এত রাত্রে থাকবার একটা আস্তানা কোথায় পাই, সেই চিন্তা আমায় এতটা পেয়ে বসল যে, মাঝ-রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। স্থানকাল সব ভুলে গেলাম। যেন সাগরের বুকে একটা অনড় পাহাড় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, আর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ সেই পাহাড়ের গায়ে নিষ্ফল আঘাত ক'রে গর্জন করছে।

খবরেব কাগজের এক ফেরিওয়ালা ছোকরা আমায় একখানা কাগজ দিতে চাইল।

বললে, 'দেখুন না মশাই, চমৎকার লেখা সব। আপনার পয়সা বাজে খরচ হবে না।'

ছেলেটার দিকে একবার চেয়ে চলতে লাগলাম ; ঘুরে ফিরে আবার সেই দোকানটার সম্মুখে এসে পড়লাম, এই দোকানটা থেকেই কম্বলখানা মুড়িয়ে নিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি ডান দিকে পাশ কেটে চললাম—হাতে তখনও সেই পুলিন্দাটা, মনে মনে লজ্জা ও ভয়—পাছে জানালা দিয়ে দোকান থেকে কেউ দেখে ফেলে! সামনেই আর একটা দোকান, তারপরই থিয়েটার সব ছাড়িয়ে সমুদ্রের দিকে পথ ধরে চললাম। সামনেই প্রকাণ্ড দুর্গটা। পথের পাশে একখানা বেঞ্চি রয়েছে; আর একবার জিরিয়ে অবস্থাটা ভেবে নিতে বসলাম।

আজকের রাতটা কোথায় আশ্রয় নিই।

এই রাতে মাথা গুঁজবার মত কি এতটুকু জায়গা পাব না? পুরানো বাসায় গেলে মানহানির আশঙ্কা আছে—সেখানে আর যাব না বলেই লিখে রেখে এসেছি। কাজেই স্পর্ধার সঙ্গে সে সংকল্প ত্যাগ করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার সেই পরিত্যক্ত দোলনা চেয়ারখানার কথা মনে হতেই গর্বের সঙ্গে হেসে উঠলাম। উঠাৎ কেমন ক'রে জানি নে, এককালে যে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস

করেছিলাম তারই স্মৃতি মনের মধ্যে জেঁকে বসল। কল্পনায় দেখতে লাগলাম, সেই বাড়ীতে টেবিলের সামনে আমি বসে আছি আর আমার সামনে প্রচুর রুটিমাখন রয়েছে। একটু পরেই আবার সে দৃশ্য বদ্‌লে গেল; দেখতে না দেখতে কোথা থেকে এল মাংস, এল কাঁটা-চামচ। দোর খুলে গেল, বাড়ীওয়ালি ঘরে ঢুকল এবং আমায় আরও খানিকটা চা খেতে অনুরোধ করল।

স্বপ্ন, অর্থহীন স্বপ্ন মাত্র! আপন মনে বললাম, 'এখন যদি কিছু খাই তা হলে মাথা ঘুরবে, মস্তিষ্কে জ্বর অনুভব করব এবং আবার কত কি বাজে উদ্ভট কল্পনার রঙীন নেশায় মশগুল হয়ে পড়ব। কোন জিনিসই যে আর ভাল হজম করতে পারি নে, মুশকিল ত ওইখানেই।

হয় ত রাত্তিরের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়ও কোথা একটা জুটে যেতে পারে। এত তাড়া কিসের, আর যদি কোথাও মাথা গুঁজবার এতটুকু জায়গা নাও মিলে ত একটা গাছের তলায় বসে বসে ত রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব। তা ছাড়া, শহরতলিতে কোথাও একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া অসম্ভব হবে না। আর শীতও ত তেমন অসহ্য কন্‌কনে নয়।

শহরের এক প্রান্ত থেকে সাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের শোঁ শোঁ শব্দ কানে আসছিল, এখানে সেখানে জাহাজগুলি যেন ইতস্তত ছড়ান রয়েছে, চিমনি থেকে গোলাকার ধোঁয়ার কুণ্ডলী শূন্যে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—চারদিকে কেমন একটা নিরানন্দ নিস্তেজ ভাব। মাঝে মাঝে জাহাজের ইঞ্জিন থেকে একটা একঘেয়ে শব্দ এসে মনটাকে আরও দাবিয়ে দিচ্ছিল। সূর্যও ওঠে নি, বাতাসও এক ফোঁটা নেই, আমার পিছনে যে সারিসারি গাছগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে তা যেন একেবারেই ভিজে; এমন কি, যে-বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম—তাও।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি শ্রান্ত হয়ে বসে বসে ঝিমুতে লাগলাম। এর মধ্যে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। একটু পরেই ঘুমে আমার চোখ দুটো বুজে এল এবং চোখ বুজেই রইলাম।...

জেগে দেখি চারিদিক আঁধার হয়ে গেছে। কি করব স্থির করতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে পুঁটলি তুলে নিয়ে হেঁটে চললাম। শরীরটা গরম করবার জন্যে জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে হাততালি ও পা ঘষতে ঘষতে চললাম। শীতে সর্বদেহ এতটা অসাড় হয়ে গেছল যে, কম্বলের ভারও যেন আর সইতে পারছিলাম না। অনেক কষ্টে দমকলের আস্তানায় গিয়ে পৌছলাম। রাত্তির তখন নয়টা বেজে গেছে। তা হ'লে ঘণ্টা কয়েকই ঘুমিয়েছি।

নিজেকে নিয়ে এখন কি করি? কোথাও যেতেই হয়। সেখানে সেই দমকলের আপিসের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি কোন রকমে এত বড় প্রকাণ্ড বাড়ীটার এককোণে একটু জায়গা ক'রে নিতে পারি। বাড়ীতে ঢুকেই দরোয়ানের সঙ্গে আলাপ করব ঠিক করলাম। সে আমায় দেখতে পেয়েই সঙীন উঁচিয়ে আমি কি চাই জানবার জন্যে চোখ পাকিয়ে তাকাল। তার সেই বন্দুকটা দেখে আমার ভীতু মন আঁত্‌কে উঠল। কিছু না বলেই পিছন হটে হটে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে এলাম এবং কপালে হাত রেখে এমন ভাবখানা করলাম, যেন ভুল ক'রেই আমি সে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। যা হোক্, ফুটপাথে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যেন একটা সাংঘাতিক বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছি।

দারুণ শীতে ও ক্ষুধায় ক্রমেই আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এক রকম ঊর্ধ্বশ্বাসেই আমি ছুটে এসে পার্লামেণ্ট গৃহের সম্মুখে পৌছলাম। নিজেকে গালাগালি দিতে দিতে চললাম, কেউ শুনলে কি-না সেদিকে আমার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ আমার এক তরুণ শিল্পী-বন্ধুর

কথা মনে হল, এক সময়ে যথেষ্ট উপকার করেছিলাম। মনে হতেই তাঁর বাড়ীর দিকে দ্রুত চললাম এবং গিয়ে দেখি বাড়ীর দরজায় তাঁর নাম আঁটা রয়েছে। দ্বারে আঘাত করতেই বন্ধুবর বার হয়ে এলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে মদ ও চুরুটের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করছে!

'এই যে ভাল ত, নমস্কার!'—হাত তুলে তাঁকে অভিবাদন করলাম।

'আরে তুমি! অসময়ে কোত্থেকে?··· সেটা ঢের বদল হয়ে গেছে ভাই, দিনের বেলা না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না। এখন দেখে ত কোন লাভ নেই।'

'তা হোক, এখনই একবার দেখাতে হবে।'—আমি জবাব দিলাম। কিন্তু কোন্ ছবির কথা বলছে তা আমার মনেই ছিল না।

সে উত্তর করল, 'অসম্ভব! এখন ছবিটা কিছুই বোঝা যাবে না, খালি হল্‌দে রঙের ছড়াছড়ি দেখতে পাবে; তাছাড়া আর একটা কথাও আছে—' এই বলে সে আমার আরও কাছে স'রে এসে চুপি চুপি বললে, 'এক তরুণী আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, সুতরাং একেবারে অসম্ভব!···'

'ও, ত হ'লে অবশ্য কোন কথাই নেই!'

এই ব'লেই আমি বন্ধুবরকে 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে এলাম।

এখানেও যখন কিছু সুবিধা হ'ল না তখন বনেই অগত্যা আজকের মত রাত কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সেখানকার মাটিও যে স্যাঁৎসেঁতে। অথচ আর কোন উপায় নেই! হাতের কম্বলটাকে একটু চেপে মনে হ'ল, তবে সত্যিই ঘুমোতে পাব? একটু আশ্রয় পাবার জন্যে শহরে কত চেষ্টাই না করলাম, ফলে ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়া কিছুই মিলল না। একটু বিশ্রাম করতে পাব, হাত-পা ছড়িয়ে টান হতে পাব—এই সম্ভাবনাটা আমার মনে একটা নিবিড় আনন্দ এনে

দিল। ঝিমোতে ঝিমোতে চললাম, মনে তখন কোন চিন্তাই রইল না। রাস্তার এক পাশে একটা খাবারের দোকানে সারি সারি কত কি খাবার সব সাজিয়ে রেখেছে, দরজার একপাশে একটা বেরাল ঘুমিয়ে আছে। খাবারের বড় বড় পাত্রগুলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকালাম, কিন্তু পকেটে একটিও পয়সা নেই। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। খানিকটা এগিয়ে এসেই ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম, কতক্ষণ যে চলেছি তা ঠিক বলতে পারি নে, তবে ঘণ্টা কয়েক যে হবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বনে এসেই উপস্থিত হ্লাম।

একটু এগিয়েই একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় বসে পড়লাম। জায়গাটা বেশ পছন্দ হ'ল। আশপাশ থেকে কতকগুলো খড়পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যেখানটা একটু খট্‌খটে মনে হ'ল সেখানটায় দিব্য এক শয্যা রচনা ক'রে ফেললাম। কম্বলের খানিকটা বিছিয়ে বাকিটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম, অতিরিক্ত দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমে আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলাম। কিন্তু শুয়েও সহজে ঘুম আসছিল না। কান দিয়ে গরম ছুটছিল, তা ছাড়া, শয্যা সামগ্রীও গায়ে বিঁধছিল। জুতা জোড়া খুলে মাথার দিকে রেখে দিলাম এবং কম্বল-বাঁধা কাগজখানা দিয়ে ঢেকে রাখলাম।

চারিদিকে তখন দারুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ··· নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু দূরে থেকে বাতাসের একঘেয়ে শোঁ শোঁ শব্দ অশ্রান্ত ভেসে আসতে লাগল। অনেকক্ষণ কান পেতে এই অস্পষ্ট শোঁ শোঁ ধ্বনি শোনলাম, এ যেন স্বর্গ-থেকে-ভেসে আসা সঙ্গীতধারা, এ যেন নক্ষত্র সভার সঙ্গীত। ···

মনে মনে বলে উঠলাম, 'যদি তাই হয় তাতেই বা আমার কি !— মনটাকে চাঙ্গা ক'রে তুলবার জন্যে হেসে উঠলাম। এ নিশ্চয়ই পেচকের কলকণ্ঠ !

উঠে জুতা পায়ে দিয়ে বনের মধ্যে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালাম। মনের সঙ্গে দস্তুর মত লড়াই ক'রে প্রায় শেষ রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * * *

চোখ মেলতেই দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে, ভাল ক'রে তাকিয়ে বুঝলাম যে দুপুর হতে চলেছে।

জুতা জোড়াটা প'রে কম্বলখানা ভাঁজ ক'রে বেঁধে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হলাম। সূর্যদেবের দর্শন আজ মিলবার জো নেই। শীতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছি, পা দুটা যেন অবশ হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল—যেন দিনের আলো সইতে পারছে না।

বেলা তিনটা বেজেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা বড় বেশি উৎপীড়ন আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। মাথাটা ঘুরছে, মনে হ'ল, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব এবং মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে হেঁচকিও আসছিল। একটা সস্তা খাবারের দোকানের সুমুখে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। খাবারের মূল্য-তালিকাটা একবার পড়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দোকানীর মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এমনিভাবে মাথাটা নাড়লাম যে, এ সব সামান্য জিনিস আমার মত লোকের খাদ্যই নয়। সেখান থেকে রেল স্টেশনে এসে পৌছুলাম।

এমন একটা ভাব আমাকে এসে অধিকার ক'রে বসল যে, মাথাটা যেন একদম গুলিয়ে গেল। একবার হোঁচট খেলাম, মাথাটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টাও করলাম কিন্তু অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হতে লাগল। শেষটায় একটা র'কের উপর বসে পড়তে বাধ্য হলাম। আমার ভিতরে যেন কি একটা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, হয় ত মাথাটা চৌচিড় হয়েই ফেটে পড়বে।

জ্ঞান তখনও অবশ্য হারাই নি, কানে সব কিছুই আসছিল, এমন কি, চেনা লোককেও যেতে দেখে চিনতে পারছিলাম এবং তাদের প্রতি-নমস্কার দিতেও ভুল হচ্ছিল না।

কেন এমন হ'ল? বনের মধ্যে শুয়েই কি হ'ল, না, সারা দিনে কিছু খেতে পাই নি—তাই? সোজাসুজি দেখলে ত এ রকম জীবনের কোন অর্থ খুঁজেই পাওয়া যায় না। আমি যে এরূপ বিশেষ নির্যাতন সইবার উপযুক্ত তাও ত আমার মনে হ'ল না। মনে মনে ব'লে উঠলাম, 'না, আর ভালমানুষীতে চলবে না।' খুড়োর কাছে কম্বল নিয়ে গিয়ে হাজির হওয়াই উচিত ব'লে মনে হ'ল। এটা বাঁধা রেখে একটা টাকা পাওয়া যাবেই, তা হ'লে তিন বেলা ভরপেট খাওয়া আর কে ঠেকায়! আর সেই ফাঁকে একটা কিছু করবার মত ভেবে নিতে পারবই। ব্যাটাকে ঠকাতেই হবে; এই মনে ক'রে পোদ্দারের দোকানের দিকেই চলেছিলাম কিন্তু দোকানের বাইরে এসেই থেমে গেলাম, মাথা নেড়ে সেখান থেকে সরে পড়লাম। যতই দূরে সরছিলাম, মনটা যেন ততই চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল। এই প্রচণ্ড প্রলোভনকে জয় করবার আনন্দে আমি বিভোর হয়ে পড়লাম। আমি যে এত দুঃখেও মাথা সোজা রেখে সম্মানকে ক্ষুণ্ণ না ক'রেও টিকে আছি, এ কথাটা ভেবেই আমার মনে হ'ল, হ্যাঁ, এই ত চাই, একেই বলে চরিত্র। এ যেন ঠিক সমুদ্রে ডুবে-যাওয়া একটা জাহাজের মাস্তুল—এখনও সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। সবই তলিয়ে গেছে, কেবল মাস্তুলটা এখনও উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তুচ্ছ দু-মুঠো খাবারের জন্যে অন্যের একটা জিনিস বাঁধা দেওয়া—এর চাইতে মানুষের শোচনীয় অধোগতি, আর কিছুই হতে পারে না। দুর্নামের কথা ছেড়ে দিলেও এমনই ক'রেই মানুষের চরিত্র দেউলে হয়ে পড়ে। না, না, কখনও তা হবে না, হতে পারে না! সত্যি সত্যিই ত আমি কখন এ কাজ করতে পারি নে। এ কাজের জন্যে ত আমি কখন কারুর কাছে জবাবদিহি করতে পারি নে। এই সব নানা বিশ্রী চিন্তায় আমার মাথাটা গুলিয়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল, এই চিন্তাটাই

যেন আমাকে খুন ক'রে ফেলবে। যে জিনিস আমার নয় তা এমনি ক'রে এ অবস্থায় বয়ে নিয়ে বেড়াতেও যেন আর ইচ্ছে হচ্ছিল না।

ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, তখন এক দিক দিয়ে না একদিক দিয়ে সাহায্য মিলবেই। আচ্ছা ও-পাড়ার দোকানীর না একটা লোক দরকার, সেখানে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। খোঁজও ত আর নিই নি। চেষ্টা করতে দোষ কি? কাজটা লেগেও ত যেতে পারে।

হয়ত এবারে অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েছে, কে বলবে? আমি দোকানের দিকেই চলতে লাগলাম।

সম্প্রতি যে দারুণ উত্তেজনা আমায় অভিভূত ক'রে ফেলেছিল তার ফলে মাথাটা যেন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই জোরে চলতে পারছিলাম না। দোকানীর কাছে গিয়ে কি ভাবে প্রস্তাব করব তাই ভেবে নিচ্ছিলাম।

লোকটা ভদ্রই হবে ত। শুনেছি খেয়ালের ঝোঁকে নাকি না চাইলেও অনেক সময় টাকাটা-সিকেটা আগামও দিয়ে বসে। এ ধরনের লোকের মাথায় সময় সময় চমৎকার খেয়াল এসে যায়।

একটা দোর দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে থুথু দিয়ে পা-জামাটার খানিকটা বিবর্ণ করে ফেললাম এবং তাতে ক'রে চেহারাটা ঠিক উমেদারের উপযোগী হয়ে দাঁড়াল। কম্বলের পুঁটলিটা ভাঙ্গা একটা কাঠের বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে রেখে ছোট্ট দোকানখানায় ঢুকে পড়লাম।

একটা লোক পুরানো খবরের কাগজ নিয়ে ঠোঙা তৈরি করছিল। তাকেই বললাম, 'মিঃ ক্রাইস্টির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

লোকটা ঔৎসুক্যের সঙ্গে জবাব দিল, 'বলুন কি চাই, আমিই ক্রাইস্টি!'

'তাই নাকি! তা বেশ, ভালই হ'ল। দেখুন, আমার নাম অমুক।

আপনার কাছে একখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সে দরখাস্তের কি হ'ল না হ'ল আজও তা জানতে পারলাম না।'

আমি যে নামটা বলেছিলাম লোকটা বারকতক সেই নামটা আওড়াল, তারপরই হাসতে শুরু ক'রে দিল। বুক-পকেট থেকে আমার দরখাস্তখানা বার ক'রে বললে, 'এই দেখুন না মশাই, আপনার চিঠির তারিখ। তারিখ লিখতে গিয়ে লিখে বসেছেন ১৮৪৮ সাল!' এই বলে লোকটা অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

আমি বিশেষ লজ্জিত হয়ে জবাব দিলাম, 'তাই ত দেখছি, বেজায় ভুল হয়ে গেছে।' মনে মনে নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেরই উপর ভারী অপ্রসন্ন হয়ে পড়লাম।

দোকানী বললে, 'আমার একজন লোক চাই বটে। কিন্তু এমন লোক চাই যে-লোকের হিসাবে কখনও ভুলত্রুটি হবে না। আপনার হাতের লেখা বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার। দরখাস্তটা পড়েও আমার বেশ ভালই লেগেছিল কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে—

আমি একটু অপেক্ষা করলাম কেন না, আমার মনে হ'ল যে এই তার চরম সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে। সে কিন্তু আবার নিজের কাজে মন দিলে।

তখন নিজে থেকেই আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললাম, 'তার জন্যে আমি বিশেষ লজ্জিত। তবে একথা আপনাকে বলতে পারি যে, এ রকম ভুল আর কখনও আমার হবে না। আর তাও বলি, এ সামান্য ভুলের জন্য আমাকে মুহুরির কাজের অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।'

দোকানী জবাব দিল, 'না, আমি তা ত বলি নি। তবে এ দেখে আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি যে, আর একজন কাউকে রাখাই ঠিক হবে।'

'তা হ'লে লোক নেওয়া হয়ে গেছে?'

'হাঁ।'

'তবে—তবে এ সম্বন্ধে আর কিছু বিবেচনা করবার নেই?'

'কি করব বলুন!'

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে তখনই বার হয়ে এলাম। রাগে দুঃখে আমার সর্ব শরীর রি-রি করতে লাগল। আমি সেইখান থেকে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে হন্ হন্ ক'রে রাস্তা দিয়ে ছুটলাম। কত লোককে মাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে চললাম। অথচ, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই, ত্রুটির জন্য মৌখিক দুঃখ প্রকাশটা পর্যন্ত আমার আসছিল না।

হঠাৎ এক জায়গায় একটা লোক আমার অশিষ্টতার জন্যে একটু সহবৎ শিক্ষা দিয়ে দিল। আমি অস্পষ্ট অর্থহীন কি সব কথা বিড় বিড় ক'রে আউড়ে আর একটা রাস্তা ধ'রে চলতে লাগলাম। রাগের মাথায় এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে পড়লাম। লোকটার নাক লক্ষ্য ক'রে যে মুষ্টিটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল তা তখনও মুঠি করাই ছিল। রাগে আমার সর্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিল।

লোকটা পাহারাওয়ালাকে ডাকল। আমি দেখলাম, মুহূর্ত মধ্যে একটা অঘটন ঘটে যাবে। তাই ওর পিছনে পড়বার মতলবে খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। কিন্তু সে আর এল না।... একটা লোকের একান্ত কামনা ও প্রচেষ্টা যে এমনই ধারা ব্যর্থ হবে এর কারণ কি, কে বলতে পারে? আচ্ছা, আমি কেন '১৮৪৮ সালটা' লিখতে গেলাম? আমাকে কি ভূতে পেয়েছিল? একান্ত ক'রে এ সালটাই আমার মনে আসার কি কারণ থাকতে পারে? আমি না-খেয়ে মরছি, নাড়িভুঁড়ি সব কুঁকড়ে কাঠ হয়ে আছে, এ অবস্থায় অদৃষ্টের কি পরিহাস! এ কি তাঁরই বিধান?

দেহে মনে ক্রমেই কাবু হয়ে পড়ছি। দিন দিনই আমি অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন আর মিথ্যে বলতে আমার একটুকুও বাধে

না, অন্যের সম্পত্তি—কম্বলখানা—তাও বাঁধা দিয়ে খেতে চাই! এর চাইতে মানুষ আর কত হীন হতে পারে? বিবেক বলতে যেন আর কিছুই নেই।

দুষ্টগ্রহ যেন আমায় পেয়ে বসেছে। অথচ ঐ শূন্যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বসে বসে আমার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছেন। আমার ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার কোন ব্যতিক্রমই যেন তিনি হতে দেবেন না, ঠিক করেছেন।

হয় ত নরকের কর্তা আমার উপর ভারী চটে আছেন, কেন না, আমার যেতে নেহাৎই বিলম্ব হচ্ছে, একটা কিছু সাংঘাতিক মহা অপরাধ না করলেও ন্যায়বিচারক আমায় নরকে নিক্ষেপ করতে পারছেন না।—

পা চালিয়ে চললাম, বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে হন্ হন্ ক'রে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা আলোকিত বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাগে উত্তেজনায় কখন্ যে আমি একটা রঙচঙে চিত্রবিচিত্র বাড়ীর গলি-পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছি তা টেরও পাই নি। এক মুহূর্তও ভাবতে হ'ল না, দ্বারের অদ্ভুত চিত্র-বৈচিত্র্য আমায় তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট ক'রে ফেললে। সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মানস-নয়নে কারুকার্যের সমস্ত খুটিনাটিই আমার নজরে এল। দোতলায় উঠে জোরে জোরে কড়া নাড়লাম। দোতলায়ই কেন যে উঠে ঐ দোরটার কড়াই নাড়লাম, তার কারণ কিন্তু আজও আমার অজানা রয়ে গেছে।

ধূসর রঙের পোশাক পরা একটি তরুণী দ্বার খুলে বাইরে এল। মুহূর্ত কয়েক সে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললে, 'না, এখানে ত আজ কিছু হবে না।' বলেই সে দোর বন্ধ করতে উদ্যত হল।

এ বেচারীর উপর উপদ্রব করবার কি কারণ থাকতে পারে! কোন কথাই আমায় জিজ্ঞাসা করলে না, অথচ ঠিক ভিখিরী ব'লেই ধ'রে নিলে।

ইতিমধ্যে মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, কাজেই সুবুদ্ধি ফিরে এল। টুপিটা তুলে শ্রদ্ধাভরে একবার মাথা নীচু ক'রে তাঁকে অভিবাদন করলাম। এবং তাঁর কথা বুঝতে পারি নি এই ভাবটি দেখিয়ে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করছি, আমায় ক্ষমা করবেন। এই বাড়ীতেই না এক পঙ্গু ভদ্রলোক তার ঠেলা-গাড়ী টানবার একজন লোকের জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন?'

তরুণী খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে এ বানানো কথায় কি মনে করলে কে জানে? শেষটায় সে বললে, 'না, এখানে ত সে রকম কেউ থাকেন না।'

'তাই নাকি! এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক—দিনে দু-ঘণ্টা কাজ করবার জন্যে তাঁর একজন লোক চাই—বারো আনা রোজ মাইনে দিতে চেয়েছেন।'

'না।'

'তা হলে আমায় মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম। তিনি হয় ত একতলায় থাকেন, তাই হবে। আমার চেনা একজনের জন্য একটা কাজের সুপারিশ করতে চাই। তাকে যে-কোন একটা কাজ ঠিক ক'রে দেওয়া দরকার। আমার নাম ওয়েডেলজালসবার্গ।'* এই বলে তরুণীকে ফের অভিবাদন জানিয়ে বার হয়ে এলাম।' সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এবং এ হেন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সেস্থান থেকে সে নড়তে পর্যন্ত পারল না।

---

*নরওয়ের সর্বশেষ অভিজাত বংশের নাম।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সে তখনও সেইভাবে আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে।

আমার ভিতরকার শান্তভাবটা ফিরে এল, মাথাটাও তখন খুব পরিষ্কার। তরুণীর সেই—'এখানে ত আজ কিছু হবে না'—আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বরফের কাজ করল। অবস্থাটা তখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে-কোন লোক আমায় দেখিয়ে বলতে পারে, ওই একটা ভিখিরী যাচ্ছে, পাঁচ জনের দাক্ষিণ্যে ওর উদরান্নের সংস্থান হয়!

মলার স্ট্রীটে একটা খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে তখন মাংস রান্না হচ্ছিল, চারদিকে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে। গন্ধটা আমিও পেলাম। অজ্ঞাতসারে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়েই ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার ট্যাঁকের কথা মনে পড়ে গেল, তাই যথাসময়ে সেখান থেকে সরে পড়লাম। বাজারে পৌঁছে কোথাও একটু জিরিয়ে নেব মনে ক'রে একটা জায়গার সন্ধান করলাম। দেখলাম, বাজারের সবগুলি বেঞ্চিই লোকে ভর্তি হয়ে রয়েছে। গীর্জার চার পাশে বৃথাই একটু জনবিরল জায়গা খুঁজলাম।

তখন আপনা আপনিই বিষণ্ণ হয়ে বার কয়েক বলে উঠলাম—আপনা আপনি; তারপর হাঁটতে শুরু করলাম। বাজারে ওই কোণটায় যে ফোয়ারাটা আছে সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলাম। পেট ভরে আঁজলা ক'রে জলও খেয়ে নিলাম। তারপর আবার এক-পা দু-পা ক'রে চলতে লাগলাম এবং প্রত্যেকটা দোকানের সামনে খানিকক্ষণ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেমে থেমে প্রতিখানা চলতি গাড়ী লক্ষ্য করতে লাগলাম। চারিদিক যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে, কপালের দু-পাশে কি যেন স্পন্দিত হতে লাগল। জলটা খেয়ে আমি আইঢাই করতে লাগলাম। এখানে সেখানে থামতে হ'ল, কেন না, কেবলি হেঁচকি উঠছিল। আমার সে শোচনীয়

অবস্থাকে অন্যের কাছ থেকে গোপন ক'রে চলতে কত কৌশল না করছি। এমনি ক'রে ক'রে এসে কবরখানায় পৌছুলাম।

কনুই দুটো হাঁটুতে থুয়ে হাতের তালুতে গাল রেখে বসে রইলাম। এ ভাবে বসে বেশ আরামই পাচ্ছিলাম, বুকের মধ্যে যে একটা হাঁপ ধরেছিল তা এভাবে বসে থাকায় আর তেমন নেই বলেই মনে হ'ল।

পাশেই এক ভাস্কর কোলের উপর পাথর রেখে কি একটা লিপি খোদাই করছিল। চোখে তার নীল চশমা। তাকে দেখে আমার এক প্রায়-ভুলে-যাওয়া আলাপী লোকের কথা মনে পড়ে গেল।

যদি লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে সব কথা জানাতে পারতাম যে, বেঁচে থাকা এখন আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে আমার কামানোর টিকিট বইখানা দিতে পারি, যদি সে আমায় বিনিময়ে কিছু দেয়!

কামানোর টিকিট বইখানা দিব! কেন?—অসম্ভব! এখনও তা দিয়ে আট-দশ দিন কামানো চলতে পারে। ব্যাকুল আগ্রহে আমার সেই পরমসম্পদ খুঁজতে লাগলাম। পকেটে হাত দিয়েই প্রথমটা তা পাই নি, তাই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ভয়ে ভয়ে ফের খুঁজতে লেগে গেলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুক পকেটে পেলাম সেটা অন্যান্য প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কাগজের সঙ্গে। কি পরমসম্পদই আমার!

বইখানা নেড়েচেড়ে বার বার টিকিটগুলি গুণে দেখলাম, এখনও ছখানা টিকিট আছে, অনেক দিন আগেই তা ফুরিয়ে যাবার কথা, কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার না করায় এখনও রয়ে গেছে। মেজাজ এমনই হয়ে গেছে যে, এখন আর কামানোর দিকেও তেমন আগ্রহ নেই। কি অদ্ভুত খেয়াল।

এখনও তা হ'লে আমার ছ আনা পয়সা রয়েছে! ভাবতে কি আরাম! খুশির সঙ্গে ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কেটে গেল বড় বড়

বাদামগাছগুলির ফাঁক দিয়ে জোরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দিনের আলো নিভে আসছে।

পকেটের কাগজগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, অনাবশ্যক কিছু আছে কি-না কিন্তু কিছুই মিলল না। সবই যেন দরকারী। 'টাই'টার উপযোগিতা কিছুই নেই। সুতরাং সেটা কাউকে অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে। কোটের গলার বোতাম খুব এঁটেই দিতে হয়, কেন না, ওয়েস্ট কোটটা ত অনেক আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। কাজেই 'টাইটা' ঝেড়ে ফুড়ে একখানা কাগজে বেশ করে ভাঁজ ক'রে কামনোর টিকিট বইয়ের সঙ্গে পকেটস্থ করলাম। তারপর ওপল্যাণ্ড কাফিখানার দিকে রওনা হলাম। বিকেলে ব্যাঙ্কের ছুটি হবার পরই ত সেই কেরানীবাবুটির সঙ্গে সেখানে দেখা হবার কথা।

টাউন হলের ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে গেছে। জোরে জোরে কাফিখানার সামনে দিয়ে পাইচারী করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাফিখানায় যারা ঢুকছিল ও বার হ'য়ে আসছিল তাদের দিকেও নজর রাখছিলাম। অবশেষে প্রায় আটটার সময় সে তরুণ যুবক বেশ ফিটফাট পোশাক পরে কাফিখানায় এসে ঢুকল। বুকটা একবার কেঁপে উঠল, কিন্তু কোন রকম সম্ভাষণ না ক'রেই তাকে বলে উঠলাম, 'ছ আনা মাত্র!' এই বলে আমার সেই পরমসম্পদ টিকেটবই ও টাইশুদ্ধ পুলিন্দাটি তার হাতে দিয়ে ফের বললাম, 'এরই দাম ছ আনা।'

সে জবাব দিল, 'কিন্তু টাকা ত পাই নি! সত্যি বলছি, একটি পয়সাও এখন নেই আমার!' এই বলেই তার পকেট ছুটো ঝেড়ে আমাকে দেখালে, ব্যাগের মধ্যেও কিছু নেই। 'কাল রাত্তিরটা বাইরে কাটিয়েছি, কাজেই হাতে যা-কিছু সামান্য ছিল সবই ফুঁকে দিয়েছি। বিশ্বাস কর ভাই, সত্যি একটি পয়সাও নেই আজ।'

তার কথা অবিশ্বাস করার কোনই কারণ ছিল না, তাই বললাম,

'তা বেশ ত, তোমার কথা ত অবিশ্বাস করছি নে। সবদিনই কি সকলের হাতে পয়সা থাকে!' সত্যিই ত, সামান্য ক-আনার জন্যে তার মিছে কথা বলার কি দরকার? এটাও লক্ষ্য করলাম, সে যখন এ-পকেট সে-পকেট আঁতিপাতি ক'রে খুঁজে দেখছিল তখন তার চোখ দুটি সজল হ'য়ে উঠেছিল। পিছন ফিরে চলতে চলতে বললাম, 'মাপ ক'রো ভাই তোমায় বিরক্ত করলাম। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে কি-না।' এই বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, খানিকটা যেতেই পুলিন্দাটি ফেরত দিবার জন্যে সে আমায় ডাকল। আমি বললাম, 'না, না, থাক, তুমিই নাও! ওতে নেই তেমন বিশেষ কিছু, খানকয়েক কামাবার টিকিট আর একটি মাত্র টাই, আর ওই আমার শেষ সম্পদ!' নিজের কথায় নিজেই অভিভূত হয়ে পড়লাম—কেন না, সেই আসন্ন সন্ধ্যায় নিজের কানেই তা বড় করুণ শোনাল। আমার কান্না পাচ্ছিল।—

বাতাস বেগে বইতে লাগল, আকাশে মেঘের দল উন্মাদ হয়ে ছুটোছুটি লাগিয়েছে, অন্ধকার যতই জমে আসছিল ততই যেন বেশি ঠাণ্ডা লাগছিল। রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চললাম, নিজের জন্যে ভারী দুঃখও হল। চোখের জল আর কিছুতেই মানা মানছিল না। আপনার মনে অস্পষ্ট ভাষায় গোটা কয়েক শব্দ আওড়ে যাচ্ছিলাম, 'কি দুর্ভাগ্য আমার! আর যে জীবনভার বইতে পারি নে ঠাকুর!'

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল, সময়টা যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। মার্কেট স্টাটে ঘোরাফেরা ক'রে অনেকক্ষণ কাটালাম, কাউকে আসতে দেখলেই একপাশে নিজেকে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা বা দোকানের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চেয়ে বিকিকিনি দেখা—এই ছিল কাজ। অবশেষে একটা গুদামের এক পাশে থাকবার মত একটু আশ্রয় বেছে নিলাম।

না, আজও আবার সেই বনে গিয়ে থাকতে পারব না। অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক। বনে যাবার মত শক্তিও আজ আর নেই, পথও ত কম নয়। রাতটা একরকমে না-একরকমে কাটিয়ে দিলেই হ'ল। আজ আর নড়ছি নে। শীত যদি খুব বেশিই মনে হয়, তখন না হয় গীর্জাটার চারিদিকে হেঁটে শীত দূর করা যাবে। আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সেখানেই একটা, কেরোসিন কাঠের ভাঙা বাক্সে হেলান দিয়ে আমি ঝিমুতে শুরু ক'রে দিলাম।

রাত তখন বেশ হয়েছে, জনকোলাহল অনেকটা শান্ত, দোকান-পাটও সব বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজনের পথচলার শব্দ বড় একটা শোনা যায় না। সামনের বাড়ীর একটা জানলা দিয়েও আর আলো দেখা যায় না। চোখ মেলে দেখি সামনে কে দাঁড়িয়ে। লোকটার জামার বোতাম অন্ধকারেও ঝক্ ঝক্ করছিল, তাতেই বুঝতে পারলাম— পাহারাওয়ালা। তার মুখ কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম না।

সে বললে, 'নমস্কার মশায়!'

ভয় পেয়ে জবাব দিলাম, 'নমস্কার!'

পুনরায় প্রশ্ন হল, 'কোথায় থাকা হয়?'

অভ্যাস বশে কিছু না ভেবেই আমার সেই পুরোনো চিলকোঠার ঠিকানাটা বলে ফেললাম।

সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু অপরাধ করেছি?'

সে বললে, 'না, তবে রাত অনেক হয়েছে কি না, এবারে ঘরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাটাও আজ বেশ পড়েছে।'

'হাঁ, বেশ ঠাণ্ডাই পরেছে।' সেলাম ক'রে অভ্যাস মত সেই পুরোনো বাড়ীর দিকেই চলতে শুরু করলাম। কাউকে না জানিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলাম, সাত-আট ধাপ মাত্র বাকি, এমন সময় সিঁড়িটা

একবার ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে উঠল। দরজার পাশে জুতো খুলে আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেলাম। চারদিক নিস্তব্ধ, কেবল কোন্ ঘরে যেন শিশু কেঁদে উঠল। তার পরই সব চুপচাপ। যেমন ক'রে দরজাটা ভেঁজিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, তেমনই রয়ে গেছে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। এবং নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম।

যেখানকার যা সবই ঠিক আছে। জানালার পর্দাটা বাতাসে দুলছে। ভাঙা লোহার খাটের উপর কোন রকম বিছানাই নেই। টেবিলের উপর একখানা কাগজে কি লেখা চাপা দেওয়া পড়ে রয়েছে। সম্ভবত বাড়ীওয়ালিকে আমি যে ছোট্ট চিরকুটখানা লিখে রেখে গিয়েছিলাম তাই পড়ে আছে। হয় ত আমার চলে যাবার পরে আর সে উপরে আসে নি।

টেবিলের সেই সাদা কাগজখানার উপর হাত বুলিয়ে বুঝলাম যে, সেখানা একখানা চিঠি। অবাক হয়ে গেলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও যেন এ বাড়ীতে না ঢুকি এই মর্মে বাড়ীওয়ালি এক নিশেধাজ্ঞা জারি করে গেছে হয় ত।

আবার ধীরে ধীরে ঘরের বার হয়ে গেলাম,—এক হাতে জুতো জোড়া, অন্য হাতে চিঠিখানা নিয়ে আর কম্বলখানা কাঁধের উপর ফেলে। দাঁতে দাঁতে চেপে মচমচে সিঁড়ি বেয়ে নিরাপদে নীচে নেমে এলাম। এসে দেউড়ির একপাশে দাঁড়িয়ে জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে চিঠিখানা হাতে নিয়ে উদ্দেশ্যহীনের মত পথ চলতে শুরু করলাম।

রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলি টিম টিম ক'রে জ্বলছিল। সটান একটা গ্যাস-পোস্টের কাছে গিয়ে চিঠিখানা খুলে পড়লাম। আলো যথেষ্ট ছিল না, তাই কষ্টেসৃষ্টে চিঠিখানা পড়ে ফেললাম। হঠাৎ বুক ফেটে যেন একটা আশার ফুলকি উদ্দাম বেগে ঠিকরে বেরিয়ে এল। আপনার মনেই উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলাম। চিঠিখানা এসেছে সম্পাদকের

কাছ থেকে।—গল্পটা মনোনীত হয়েছে, টাইপ করা হচ্ছে, একবার গিয়ে সেটা দেখে দেবার জন্তে সম্পাদক অনুরোধ জানিয়েছেন ! সামান্ত কিছু অদলবদল দরকার হবে—সামান্ত ক'টা ভুল সম্পাদক নিজেই শুধরে নিয়েছেন।··· লিখেছেন, লেখাটায় নাকি শক্তির যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। কালকেই ছাপা হবে, দশ টাকা পাওয়া যাবে।

একসঙ্গে হাসি ও কান্না দুটোই আমায় পেয়ে বসল। সারাটা রাস্তা পাগলের মত দৌড়দৌড়ি শুরু ক'রে দিলাম। নিজেই নিজের উরু চাপড়ে দিলাম, আপন মনে কত কি জোরে জোরে বলে গেলাম। এমনই ক'রে রাত কাটতে লাগল।

সারাটা রাত আমি গোটা রাস্তাটা যেন চষে ফেললাম এবং বার বার কেবল এই কথাটাই আওড়ালাম যে, লেখাটায় শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে, প্রকাশভঙ্গিও সুন্দর। আর সেই সঙ্গে দশটি টাকা !

আর চাই কি !

২

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা।

সে দিন সন্ধ্যায় পথে বার হয়ে পড়েছি। গীর্জার ময়দানে ব'সে খবরের কাগজের জন্যে একটা প্রবন্ধ রচনায় নিবিষ্ট ছিলাম। লেখা নিয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে ভাবতে রাত আটটা বেজে গেল। চারিদিকে তখন আঁধার হয়ে এসেছে। ময়দানের ফটক বন্ধ করবার সময় হয়ে এল।

ভারী খিদে পেয়েছে তখন—পেটে যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে। সেই যে গল্পটা লিখে দশটা টাকা পেয়েছিলাম, তা দু-দিনেই ফুরিয়ে গেছে। প্রায় তিন দিন হতে চলল কিছুই খেতে পাই নি। ভারী দুর্বল হয়ে পড়েছি; পেন্সিলটা হাতে ধ'রে রাখতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। পকেটে আছে একখানা ভাঙা পেন্সিল-কাটা ছুরি আর এক গোছা চাবি, কিন্তু একটি আধলাও নেই।

ময়দানের ফটক বন্ধ হতেই সোজা ঘরের দিকে যাব ভাবছিলাম কিন্তু ঘরের কথা মনে হতেই একটা অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা এসে আমায় পেয়ে বসল। কেন না, আজকাল যেখানে থাকি সেটাকে ঘর কিছুতেই বলা চলে না। কে একজন পিতল-কাঁসার বাসন মেরামতের দোকান করেছিল, ক'দিন আগে সে দোকান তুলে নিয়ে গেছে, সম্প্রতি সেই অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরেই কিছু দিন বাস করবার অনুমতি নিয়েছি। কোথায় চলেছি স্থির না ক'রে টলতে টলতে টউন হল্‌ ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে চললাম। অদূরেই সমুদ্র, রেলওয়ে ব্রিজের সামনে একখানা বেঞ্চিতে গিয়ে ব'সে পড়লাম।

তখন কোন দুঃশ্চিন্তাই আমার মনে নেই। দুঃখকষ্টের কথা একদম ভুলে গেছি, সাগরের সেই অন্ধকার অস্পষ্ট প্রশান্ত দৃশ্য দেখে আমার মনও অনেকটা শান্ত হয়ে পড়েছে। অভ্যাসের বশে এতক্ষণ চেষ্টা ক'রে যেটুকু লিখেছিলাম তা পড়ে দেখলাম। আমার তখনকার উৎপীড়িত মস্তিষ্কে শুধু মনে হ'ল যে, এ রকম লেখা আমার কলম থেকে ইতিপূর্বে আর কখনও বেরোয় নি।

পকেট থেকে লেখাটা বার ক'রে পাঠোদ্ধারে মনোনিবেশ করলাম। চোখের সামনে লেখাটা ধ'রে আগাগোড়া প্রতিটি পংক্তিতে চোখ বুলিয়ে গেলাম। শেষটায় ক্লান্ত হয়ে লেখাটা আবার পকেটস্থ করলাম। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। সম্মুখে উদার অসীম নীল সমুদ্র। ছোট পাখীরা নিঃশব্দে উড়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে।

দূরে একটা পাহারাওয়ালা পাইচারি করছে; এ ছাড়া, আর জন-মানবের সারা শব্দ নাই। গোটা বন্দরটা যেন একেবারে মরে আছে।

আর একবার যথাসর্বস্ব গুণে দেখলাম। ভাঙা একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি আর একগোছা চাবি, কিন্তু একটি আধলাও নেই।

হঠাৎ কেন পকেটে হাত দিয়ে লেখাটা আবার বার ক'রে নিলাম। এ যেন আপনা থেকেই, যেন স্নায়ুমণ্ডলীর একটা অজানা চাঞ্চল্য মাত্র। কাগজের তাড়া থেকে একখানা সাদা কাগজ বেছে নিয়ে একটি ঠোঙা বানিয়ে সেটিকে এমন ভাবে ঢাকা দিলাম, যেন তাতে কিছু রয়েছে এবং তার পর সেটিকে ফুটপাথের উপর একধারে রেখে দিলাম। কেন যে এ পাগলামি হ'ল, ভগবানই জানেন। বাতাসে ঠোঙাটা প্রথমে একটু উড়ে যেতে চাইল, কিন্তু খানিকবাদেই অনড় হয়ে পড়ে রইল।

এদিকে পেটের জ্বালায় আমি ত একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। ব'সে ব'সে সেই কাগজের ঠোঙার দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হ'ল, যেন ওটা ফেটে প'ড়ে ওর থেকে ঝকঝকে কতগুলি টাকা বার হয়ে

পড়েবে। সত্য সত্যই আমার মনে হচ্ছিল যে, ওর মধ্যে কিছু না-কিছু আছেই। ঠোঙাটার মধ্যে কত আছে তা অনুমান করবার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না; অনুমানটা ঠিক হ'লে যে টাকাটা আমিই পাব সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নেই।

কল্পনার জোরে ঠোঙার মধ্যে চকচকে আনি দুয়ানিগুলো যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম! গোটা ঠোঙাটাই হয় ত টাকা আনায় একদম ভর্তি! বসে বসে বিস্ফারিত চক্ষে ঠোঙাটার দিকে তাকালাম এবং তা চুরি করবার জন্তে নিজেকে ঠেলতে লাগলাম।

অদূরে পাহারাওয়ালাটা খক্ খক্ ক'রে কেসে উঠল। আমারও কাসবার প্রবৃত্তি এলো কোথা থেকে, কে বলবে? উঠে দাঁড়িয়ে পাহারাওয়ালাটা যেন শুনতে পায় এই মতলবে তিন-তিনবার কাসলাম। সে কি তার সাংকেতিক বাঁশিটায় ফুঁ দেবে! নিজের চালাকিতে মনে মনে হেসে উঠলাম; আনন্দে হাত কচ্‌লিয়ে আপনার মনেই লোকটাকে গালাগালি দিতে লাগলাম। ব্যাটা পাজি, এসে কি ঠকাটাই না ঠকবে! ও ব্যাটাছেলে নিশ্চয় মরে ওর দুষ্কৃতির জন্তে নরকে অতিবড় শাস্তি সব ভোগ করবে। অনাহারে আমি তখন মস্ত অবশ, ক্ষুধায় উন্মাদ।

মিনিট কয়েক বাদে পাহারাওয়ালাটা ওর লোহার নাল দেওয়া নাগরা জুতোর খট্ খট্ শব্দ ক'রে নিস্তব্ধতা ভেঙে এসে উপস্থিত হ'ল। সারা রাতই হয় ত তাকে এমনি ধারা জেগে পাহারা দিতে হবে। ঠোঙাটার একান্ত কাছে না-আসা পর্যন্ত সেটা তার নজরে এল না। নজর পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে সে ঠোঙাটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। ঠোঙাটা সাদা ধব্ ধব্ করছে, হয় ত তার মধ্যে কিছু আছে—কিছু টাকা কি কয়েকটা রেজকি? ... সে আস্তে আস্তে ঠোঙাটা কুড়িয়ে নিল। অনেক আশায় ঠোঙাটা দেখলে। অদূরে বসে বসে আমি তা

দেখছিলাম এবং আপনার মনে হেসে উঠলাম, উরু চাপড়িয়ে পাগলের মত সে কি হাসি! একটি কথাও কিন্তু আমার মুখ থেকে বার হ'ল না, হাসি থেমে যেতেই চোখের জলে বান ডেকে আসে।

ফুটপাতের উপর আবার খট্ খট্ শব্দ ক'রে পাহারাওয়ালা রকের সিঁড়ির দিকে গেল। আমি সজল চোখে সেখানে বসে বসে হাসি চাপতে লাগলাম। উল্লাসে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছি। সরবে ঠোঙার কাহিনীটা আপনাকে আপনি বললাম, হতভাগা পাহারা-ওয়ালাটার হাবভাব অনুকরণ করলাম, আর নিজের খালি হাতটাও একবার তাকিয়ে দেখলাম এবং বার বার আবৃত্তি করলাম—ও কিন্তু কেসেই ঠোঙাটা নেড়ে ফেলে দিলে। এই কথাগুলি অদল-বদল ক'রে এবং তার সঙ্গে আরও নতুন নতুন শব্দ যোগ ক'রে এক চমৎকার গল্প বানিয়ে ফেললাম। পাহারাওয়ালা আবার খক্ খক্ ক'রে উঠল।

যতদূর শক্তিতে কুলোয় ও-কথাগুলিকে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে এক অদ্ভুত খিঁচুড়ি পাকিয়ে তুললাম। এই খেয়ালের খুশিতে মশগুল হয়ে যে কতক্ষণ ছিলাম, জানতেও পারি নি; ওদিকে যে রাত হয়ে যাচ্ছে সে দিকে নজরই ছিল না। সর্বদেহ এলিয়ে আসছে, ক্লান্তিকে যেন কিছুতেই দমন করিতে পারছিলাম না। চারদিকে ঘোর অন্ধকার, মৃদু বায়ুহিল্লোলে নীল সমুদ্র আন্দোলিত হচ্ছে। দূরে জাহাজ আর মাস্তলগুলো যেন নির্বাক দানবের মত বুক ফুলিয়ে আমারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার কোন যন্ত্রণা নেই—খিদে মরে আসছে, কেবল তাই নয়, খালি পেটে যেন বেশ হালকাই বোধ করছি। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই। কেউ যে আমায় লক্ষ্য করবার নেই এতে বেশ একটু স্বস্তি বোধ করলাম। বেঞ্চির উপর পা তুলে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সত্যিকারের নির্জনতার যে কি মাধুর্য তা বেশ বুঝতে পারলাম। আমার মনের আকাশে তখন মেঘের লেশমাত্র নেই, এতটুকুও অস্বস্তি নেই।

যতটা মনে হয়, তখন কোন খামখেয়ালিও মনে জেগে নেই, এমন কি কোন অতৃপ্ত অকৃতার্থ আকাঙ্ক্ষাও আর আমার ছিল না। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিলাম। কোনও সাড়াশব্দও আমায় বিরক্ত করছিল না। ধীরে ধীরে একটা অন্ধকারের পর্দা যেন নেমে এসে আমার দৃষ্টি থেকে পৃথিবীটাকে ঢেকে ফেললে, আর আমি সেই কাল্পনিক জগতে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। নির্জনতার সেই একঘেয়ে অস্পষ্ট শব্দ আমার কানে এসে বাজছিল এবং রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার দৈত্যারা আকাশে টেনে নিয়ে সেই সুদূর সাগরের বুকে ফেলবে। কত অজানা জনশূন্য দেশের মধ্যে দিয়ে আমায় নিয়ে রাজকুমারী ল্যাজ্রালির প্রাসাদে পৌছে দেবে। ভাবতেও-পারি-নে-এমন সব জাঁকজমক যেন আমারই প্রতীক্ষায় রয়েছে। আমি যেন সেখানে তুনিয়ার মীরমজলিশ। রাজকুমারী ল্যাজালি দীপালোকিত এক সুবৃহৎ ঘরে পাণ্ডুর গোলাপের সিংহাসনে বসে আছে। আমায় দেখতে পেয়ে দু-বাহু বাড়িয়ে দেবে; হেসে হাঁটু গেড়ে আমায় সাদর অভ্যর্থনা করে বলবে, 'এস। আমার রাজ্যের পক্ষ থেকে, আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমায় সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি যে এই সুদীর্ঘ বিশ বছর তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছি বন্ধু! কত দীর্ঘ রজনী বিনিদ্র কাটিয়েছি তোমারই আসার আশায়। তোমার বিরহে কতই না কেঁদেছি, ঘুমেও কেবল তোমাকেই স্বপ্নে দেখেছি আমি!'··· তরুণী আমার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে একটা বারান্দায় উপস্থিত হ'ল। সেখানে বহুলোক, আমাদের পেয়ে তারা আনন্দধ্বনি ক'রে উঠল। অদূরে বাগানে শত শত রূপসী কিশোরী হাসে, নাচে গান করে। তাদের পাশ কেটে আর একটা ঘরে গিয়ে পৌছলাম। সে ঘরখানা চুনি-পান্না দিয়ে তৈরি আর সেখানে সূর্যালোক উজ্জ্বলতর হয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। চারদিকেই হাসি, গান, সুগন্ধ। একেবারে অভিভূতের মত হয়ে পড়লাম।

রাজকুমারীর হাতখানি আমার হাতের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ। আমার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে যেন একটা তড়িৎতরঙ্গ বয়ে গেল, আমি তাকে আলিঙ্গন ক'রে আকর্ষণ করতেই সে চুপি চুপি ব'লে উঠল, 'ওগো এখানে নয়, এখানে নয়; এসো, আরও এগিয়ে চল।' অবশেষে আমরা এক অত্যদ্ভুত ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। চারিদিকের দেয়াল হীরামুক্তায় মোড়া, মেঝে চুণীপান্নার। কত দামি আসবাব-পত্র! আমি আর সইতে পারলাম না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

জ্ঞান হতেই আমার মনে হ'ল, সে যেন আমায় আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে, তার তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আমার মুখের উপর অনুভব করলাম। সেই নিঃশ্বাস যেন কানে কানে আমায় বললে, 'বন্ধু আমার! এসো ... এবার চুম্বনে আমার সব ব্যথা দূর ক'রে দাও বন্ধু ... ওগো দাও ... দাও ... আরও ... আরও ..."

বসে বসেই দেখতে পেলাম, কতগুলি নক্ষত্র এ-দিক থেকে ও-দিকে ছুটছে। আনন্দের আতিশয্যে আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না।...

বেঞ্চির উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা পাহারাওয়ালা আমায় জাগালে। তখন জীবনের সে দুঃখদুর্দশার কথা আবার কি নিষ্ঠুরভাবেই না মনে পড়ল। প্রথমটা নিজেকে উদার আকাশের তলে দেখতে পেয়ে বোকার মত অবাক হয়ে গেলাম কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এ অবস্থা দেখে একটা তীব্র নৈরাশ্য এসে আমায় পেয়ে বসল। তখনও যে বেঁচে আছি তা মনে ক'রে আমার কান্না এল। আমি যখন ঘুমে অচেতন, তখন এক পসলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে, জামা কাপড় সবই ছপ্ ছপ্ করছে। শীতে কাঁপুনি ধরে গেছে।

ঘোর অন্ধকার। অনেক কষ্টে আমার সামনেকার পাহারা-ওয়ালাটাকে পাহারাওয়ালা বলে চিনতে পারলাম।

পাহারাওয়ালাটা বললে, 'বেশ হয়েছে, এখন উঠে লক্ষ্মী ছেলেটির মত ঘরে যাও ত মশায়।'

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লাম। সে যদি আমাকে ফের সেখানেই শুয়ে পড়তে হুকুম দিত ত আমি তাই করতাম! মনটা আমার কেমন যেন খিঁচড়ে গেছে, গায়ে যেন কিছু মাত্র বল নেই; তার উপর ক্ষুধার অসহ্য জ্বালা আমায় মেরে ফেলছিল।

পাহারাওয়ালাটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথাকার বে-আক্কেল, টুপিটা যে পড়ে রইল, সেদিকে দেখছি কিছুমাত্র নজর নেই! টুপিটা নিয়েই যাও না হে নবাবপুত্তুর!' আপনার মনে আওড়াতে আওড়াতে চললাম, 'তাই ত, কি যেন নেই, কি যেন ফেলে গেছি বলেই না মনে হয়েছিল। বেশ দাদা, বেশ! নমস্কার!' এই বলে হেলে দুলে হোচট খেতে খেতে এগিয়ে চললাম।

যদি এক টুকরা রুটি খেতে পেতাম! যেতে যেতে রুটির কথাই কেবল মনে হতে লাগল। সেই যখন কিনে খেতাম, ঠিক তেমনই বাদামি রঙের সুস্বাদু রুটি। ভয়ানক ক্ষুধাই নাকি পেয়েছিল, আর যেন চলতে পারছিলাম না। জলে ভিজে মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলেছি।

এ দুঃখের আর যে শেষ আছে তাও ত মনে হয় না। সহসা মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফুটপাথে পা ঠুকে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'ব্যাটা আমায় কি বললে? গাল দিলে? আমি ঠুটোজগন্নাথ? আমায় গাল দেওয়া বার ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও না একবার!' পেছন ফিরে ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটে গেলাম। রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্ছে। খানিকটা গিয়ে হোচট খেয়ে মাটীতে পড়ে গেলাম, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না ক'রে উঠে আবার ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে একেবারে রেল স্টেশনে এসে পৌছলাম। কখন যে সেই গন্তব্য স্থান পিছনে

ফেলে এসেছি তা টেরও পাই নি। কিন্তু তখন শরীর এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে যে, ফিরে আর সেখানে যাওয়ার শক্তি ছিল না। তা ছাড়া দৌড়ানর ফলে রাগটাও অনেকটা কমে এসেছিল। হাঁপ ছাড়বার জন্যে এক জায়গায় বসে পড়লাম। পাহারাওয়ালাটা আমায় যা বলেছে তা গায়ে না মাখাই ত আমার উচিত। নিশ্চয়ই। তবে সব ব্যাপারেই অবশ্য চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়।—তা ঠিক, কিন্তু সে ত এর চাইতে ভাল ব্যবহার কিছু জানে না, ও একটা সাধারণ লোক বই ত নয়। যুক্তিটা আমার বেশ ভাল লাগল। আপনার মনে দু বার আওড়ালাম, 'ও ত এর চাইতে ভাল ব্যবহার কিছু জানে না।' এবং তারপর আমি ফিরে এলাম।

অভিমানের সুরে মনে মনে বলে উঠলাম, 'ভগবান! কি তোমার মতলব যে, আমায় আজ এই অন্ধকার রাত্তিরে ঝড়জলে ভিজিয়ে পাগলের মত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ?' এই সময় ক্ষুধার জ্বালা আমার সর্ব ইন্দ্রিয়কে গ্রাস ক'রে বসেছিল, কোন রকমেই যেন আর এতটুকু স্বস্তিও পাচ্ছিলাম না। বার বার মুখের লাল গিলে পরখ করতে লাগলাম যে তা ক্ষুধাশান্তির কাজে আসে কি-না। সুখের বিষয়, তাতে অনেকটা কাজ হ'ল বটে।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই ক্ষুধার জ্বালা আমাকে এত বেশি পেয়ে বসেছে যে, হালে আমায় অনেকটা দুর্বল ক'রেই ফেলেছে। যদি বা কোন দিন কোন রকমে দু-চারটে টাকা যোগাড় হয়েছে, তা নিঃশেষ হতে কিন্তু বড় বেশিক্ষণ লাগে নি; দিন কয়েক উপুসের পর দুর্বল শরীরটাকে সবল করতে না-করতেই আবার উপুসের পালা শুরু হয়, আরও কাহিল হয়ে পড়ি। পিঠ ও কাঁধ নিয়ে আমি বড় মুশকিলেই পড়লাম। বুকের ব্যথাটা না হয় কেসে বা কুঁজো হয়ে হেঁটে কমাতে পারি, কিন্তু পিঠ ও কাঁধের ব্যথা কমাই কি ক'রে! আচ্ছা, আমার এ অবস্থার কোন বদলা

না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? দুনিয়ায় এত লোক বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েছে, আমার বেলায় সে দাবিটুকুও কি থাকতে নেই? এই ধরুন না, পুস্তক-প্রকাশক পাশা বা জাহাজ আপিসের বড়বাবু হেনেচেন। আমি কি এদের মত খাটতে পারি নে, না, আমার যোগ্যতা কিছুমাত্র কম আছে? আমি ত কাঠ-গোলায় করাত চালাবার কাজেরও প্রার্থী হয়েছিলাম, তবু ত আমার দু-মুঠো খোরাক জুটছে না। আমি ত অলস অকর্মণ্যও নই। কত দরখাস্ত করেছি, কত বক্তৃতা শুনেছি, কত প্রবন্ধ লিখেছি, দিনরাত ভূতের মত খেটেছি, কিন্তু কই? যখন দু পয়সা হাতে এসেছে তখন যে বড়মানুষী ফলাতে অনাবশ্যক খরচ করেছি, তাও ত নয়, দু বেলা দু মুঠো খেয়েই ত তখনও দিন কাটিয়েছি। আর যখন পয়সা থাকে নি, তখন ত উপোস ছাড়া আর উপায়ই ছিল না! হোটেলেও ত থাকি নি, বা দোতলার সাজানো ঘরও ত কখনও ভাড়া করি নি! যেখানে দেবতা-মানুষ ত দূরের কথা শেয়াল কুকুরও থাকে না, এমন জায়গায়ই ত সারাটা শীতকাল কাটিয়ে দিলাম। বরফের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই না সে চিল-ছাদের কুঠরি ও কাঁসা-পেতলের মেরামতি দোকানে দিন কাটিয়েছি। তবে—তবে—না, এর কারণ ত বুঝতে পরছি নে।

মাথা গুঁজে কেবল এই সবই ভাবছিলাম। অথচ আমার মনে ঈর্ষাবিদ্বেষ কিছুমাত্রও ছিল না।

একটা রঙের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে তাকালাম। টিনের গায়ে যে মার্কা ছাপান রয়েছে তা পড়তে চেষ্টা করলাম কিন্তু তখন এত অন্ধকার হয়ে গেছে যে, কিছুই পড়তে পারলাম না। নিজেই এই নতুন খেয়ালে নিজের উপর ভারী বিরক্ত হয়ে উঠলাম—কেবল তাই, টিনগুলির গায়ে কি লেখা আছে তা পড়তে না পারায় ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। জানলার কাচে রাগের মাথায় দুবার ঘুঁষি চালিয়ে আবার চলতে লাগলাম।

মোড়ে একটা পাহারাওয়ালাকে দেখতে পেয়েই জোরে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম এবং তার কাছে সটান গিয়ে বললাম, 'মাত্র দশটা বেজেছে।'

সে অবাক হয়ে জবাব দিলে, 'না, দুটো।'

আমি জেদ ক'রে বললাম, 'না দশটা, দশটা মাত্র বেজেছে।' এবং রাগে গজ গজ করতে করতে হাত মুঠো ক'রে জোর গলায় বললাম, "দশটা বেজেছে বাপু, চালাকি ক'রো না!"

লোকটা খানিকক্ষণ কি ভাবলে এবং আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল এবং খানিক বাদে বেশ নম্রতার সঙ্গেই বললে, 'যতটাই কেন না-বাজুক, আপনাদের ঘরে ফেরবার সময় নিশ্চয়ই হয়েছে। বলেন ত আমিও আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।'

লোকটার অপ্রত্যাশিত বন্ধুতায় আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম, চোখ বেয়ে জল এখনই ঝরে পড়বে, তাই তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'না দরকার নেই। কাফিখানায় বসে ছিলাম, এতটা যে রাত হয়ে গেছে তা টের পাই নি। যাক, তোমায় ধন্যবাদ।'

আমি চলতেই সে হাত কপালে তুলে পুলিশী কায়দায় সেলাম করল। তার এই বন্ধুভাবটা আমায় একেবারে অভিভূত ক'রে ফেললে এবং আমার অন্তর থেকে একটা চাপা কান্না বেরিয়ে এল, কেন না, আজ ওকে বকসিস দেবার মত একটা পয়সাও আমার পকেটে নেই!

একবার থেমে পিছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে তখন আপনার মনে হেঁটে চলেছে। দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতেই কপালে করাঘাত ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

দারিদ্র্যের জন্যে নিজেকে নির্দয়ভাবে গালাগালি করতে লাগলাম। রেগেমেগে আপনাকে নবাবপুত্তুর, গাধা, কত কি সব বিশেষণে বিশেষিত

করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে এমনইভাবে নিরর্থক গালাগালি দিয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাসস্থানের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত আমার মনের অবস্থা সমান সক্রিয় ছিল। দরজা খুলতে গিয়ে আবিষ্কার ক'রে ফেললাম চাবির গোছাটা যেন কোথায় পড়ে গেছে।

আপনার মনে আওড়ালাম, 'আমি কেন না চাবির গোছা হারাব? আমারই চাবি ত খোয়া যাবে। এখানে থাকি, এর নীচে একটা আস্তাবল, আর তার উপর কাঁসা-পিতলের মেরামতি দোকান। রাত্রি-বেলা দরজায় তালা বন্ধ আছে, তখন চাবি ছাড়া কেউই তা খুলতে পারে না। কাজেই, আমি কেন না সে চাবি হারিয়ে ফেলব?

রাস্তার কুকুরটা যেমন ভিজে সপ্‌সপে হয়ে যায়, আমি তেমনই ভিজেছি—ক্ষুধাও পেয়েছে—এই সামান্য রকম ক্ষুধা। কিন্তু পাও যে আর চলছে না, তবে আমি কেন চাবি হারাব না?

যদি তাই হবে ত আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন গোটা বাড়ীটা কেন অদৃশ্য হয়ে উড়ে গেল না। ··· ক্ষুধায় শ্রান্তিতে কঠোর হয়ে আপনার মনেই হেসে উঠলাম।

আস্তাবলে ঘোড়াগুলির পা ঠোকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, জানলা দিয়েও ঘরের ভিতরটা দেখছিলাম কিন্তু দরজা খুলতে না পেরে ঢুকতে পারছিলাম না। আবার বৃষ্টি শুরু হ'ল, সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। পাহারা-ওয়ালাকে দরজা খুলে দিতে বলা যাক। এ কথা মনে হ'তেই আমায় ঘরে ঢুকবার সুবিধা ক'রে দিবার জন্যে তৎক্ষণাৎ তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম।

হয় ত সে পারবে, যদি কেউ পারে ত সে-ই পারবে। কিন্তু সে পারল না, তার কাছে চাবি ছিল না। পুলিশের কাছে যে চাবি থাকে তা ত তার কাছে থাকে না, সেগুলো থাকে ডিটেকটিভ পুলিশের কাছে।

এখন তা হ'লে কি করি?

কেন, একটা হোটেলে গিয়ে রাত্তিরের মত একটা বিছানা পেতে পারি। কিন্তু সত্যি সত্যিই ত আর আমি হোটেলে যেতে পারছি নে, আর তা হ'লে বিছানাই বা কোথায় পাচ্ছি; ট্যাঁকে ত একটি পয়সাও নেই। তাকে বলেছি আমি কাফিখানায় ছিলাম।...

খানিকক্ষণ আমরা উভয়ে টাউন হলের র'কের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে মনোযোগ দিয়ে আমার চেহারাটা দেখতে লাগল। বাইরে তখন মুষল ধারে বর্ষণ চলেছে।

সে তখন বললে, 'তা হ'লে ত আপনাকে ফাঁড়িতে গিয়ে খবর দিতেই হয় যে, আপনি ঘর-হারা।'

ঘর-হারা? এ কথা ত ভাবি নি আগে। বেশ, তাই হবে। পাহারাওয়ালাকে ধন্যবাদ দিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেখানে গিয়ে কেবল আমি ঘর-হারা বললেই চলবে ত?'

'নিশ্চয়ই।...'

*　　　　　*

ফাঁড়ির হাবিলদার জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কি?'

'ট্যানজেন—য়্যান্ড্রিয়াস ট্যানজেন!'

জানি নে কেন মিথ্যা কথা বললাম; বায়স্কোপের ছবির মত তাড়াতাড়ি চিন্তাগুলি আসা-যাওয়া করতে লাগল এবং একটা থেকে আর একটা অদ্ভুত খামখেয়ালের প্রেরণা পেতে লাগলাম। সেগুলা দিয়ে যে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। উপস্থিতমত কিছু না ভেবেই এই বেখাপ্পা নামটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। মিথ্যে বলার প্রয়োজন না থাকলেও আমার মুখ দিয়ে মিথ্যে কথাই বেরিয়ে এল।

'পেশা?'

এইবার আমার মাথায় বাড়ি পড়ল। পেশা! আমার পেশা কি? প্রথমটা মনে হ'ল কাঁসা-পিতলের বাসন মেরামতকারী বলেই নিজেকে

চালিয়ে দিই, কিন্তু সাহসে কুলোল না ; প্রথমত, আমি যে নাম বলছি সে নাম কাঁসা-পিতলের বাসন মেরামতকারীদের মধ্যে হামেসা দেখতে পাওয়া যায় না—তা ছাড়া, আমার চোখে পাঁস-নে চশমা। হঠাৎ মাথায় এল, গম্ভীরভাবে বলে ফেললাম, 'সাহিত্য-সেবী।'

জবাব শুনে হাবিলদার একবার চমকে উঠল, আমি ঘর-হারা মস্তবড় কেউকেটা যেন একজন তার সুমুখে গ্রামভারী চালে দাঁড়িয়ে! সন্দেহের কোন কারণ নেই। প্রথমটা কেন জবাব দিতে একটু ইতস্তত করেছিলাম সে বেশ বুঝতে পারলে। এই গভীর নিশীতে একজন লেখককে ঘর-হারা অবস্থায় ফাঁড়িতে দেখে কি মনে হয় ?

'কোন্ কাগজে লেখেন ?'

কাগজের নাম করতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ কাগজখানার নামই ক'রে বসলাম। বললাম, 'সন্ধ্যার পর একবার বাইরে বেরিয়েছিলাম, তারপর এই অবস্থা, লজ্জার বিষয় সন্দেহ নেই!...'

হেসে বাধা দিয়ে সে বললে, 'সে কথা ত আর খাতায় লিখতে পারব না। জোয়ান জোয়ান ছেলেরা যখন রাত্তিরে বাইরে বার হয়...আমরা বুঝি!'

বৃদ্ধ পাশ ফিরে একজন কন্‌স্টবলের দিকে চাইতেই সে কায়দা-দুরস্তভাবে সর্দারকে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াল। বললে, ভদ্রলোককে ঘর দেখিয়ে দাও—দোতলায় ভদ্রলোকদের ঘরে। ... শুভরাত্রি।

নিজের এ দুঃসাহসিকতায় গা দিয়ে যেন বরফের মত ঘাম ঝরে পড়ল। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে হাত মুঠো ক'রে গা-টা একবার ঝেঁকে নিলাম। কাগজের নাম যদি না করতাম তবে আর কোন ভয়ই ছিল না।

কন্‌স্টবলটা বাইরে দাঁড়িয়ে বললে, 'আলো দশ মিনিট মাত্র আছে, এরই মধ্যে সব সেরে নিতে হবে।'

'তার পরই আলো নিভে যাবে?'

'হাঁ।'

বিছানার উপর বসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। পরিষ্কার উজ্জ্বল ঘরখানার চারিদিকে যেন একটা বান্ধবতার ভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান। বেশ ভাল লাগছিল। বেশ আশ্রয় পেয়েছি; বাইরে জলঝড়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এর চাইতে ভাল আশ্রয় প্রত্যাশা করতে পারি নে। পরম খুশিতে মনটা ভরে উঠল। হাতে টুপিটা রেখে বিছানার উপর বসে দেয়ালের গায়ের গ্যাসের আলোর নলটার দিকে চেয়ে রইলাম। পাহরাওয়ালার সঙ্গে প্রথম আলাপের সব কিছু খুঁটিনাটি আপনার মনে আলোচনা করতে লাগলাম। জীবনে এই প্রথম এবং কি আশ্চর্য রকমেই না এদের ঠকালাম। লেখক!—ট্যানজেন, তাই হবে! তারপর ও কাগজটার নাম ক'রেই না লোকটার মনে একটু সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে পেরেছি! 'আমরা তা লিখব না!' তাই নাকি? সারাটা দিন গীর্জার বাগানে কাটিয়ে রাত দুটোয় ঘরের চাবি আর মনিব্যাগ ঘরে পড়ে রয়েছে! মন্দ কি!' 'ভদ্রলোককে ঘর দেখিয়ে দাও—দোতলায় ভদ্রলোকদের ঘরে!...'

হঠাৎ আলোটা একদম নিভে গেল, নিববার আগে একটু বাড়া বা কমা কিছুই হ'ল না, একটু কাঁপল না।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বসে রইলাম; এত অন্ধকার যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না—কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে বসে আর কিছুই করবার নেই, তাই জামা ছেড়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু ঘুম আসছিল না। তা বলে ক্লান্তিও আসে নি। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম—এ নিবিড় কালো অন্ধকার-পুঞ্জের যেন আর শেষ নেই—আমার ধারণাশক্তি তার পরিমাণ করতে পারে না।

অন্ধকার এত নিবিড় কালো যে তার পরিমাপ করা আমার শক্তির বাইরে, আর তাই সেই গাঢ় অন্ধকার আমায় পীড়িত ক'রে তুলল। চোখ বুজে আপনার মনে গান গেয়ে উঠলাম, তবু যদি মনটাকে বিষয়ান্তরে নিতে পারি, কিন্তু পারলাম না। অন্ধকার আমার চিন্তাকে একদম পেয়ে বসেছিল, মুহূর্তের জন্ত তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। মনে হচ্ছিল, হয় ত আমি নিজেই বুঝি অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি—অন্ধকার যেন আমায় একদম আত্মসাৎ করে ফেলেছে।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়ে পড়ল, কত চেষ্টা করলাম কিছুতেই তাদের ঠাণ্ডা করতে পারলাম না। কেমন এক রকম অস্পষ্ট ঝিম্ ঝিম্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকারের মধ্যেই একবার উঁকি মেরে চাইলাম; কিন্তু যে পুঞ্জীভূত নিবিড় নিকষ কালো অন্ধকার আমার নজরে এল, জীবনে আর কখনও সে রকম অন্ধকার দেখবার সুযোগ হয় নি। কই, এতদিন ত এই অন্ধকারকে দেখতে পাই নি, অপর কেউ দেখেছে বলেও ত জানি নে। আমার মনে হাস্তকর সব চিন্তা দেখা দিল—সবটাতেই আমি ভয় পেতে লাগলাম।

এবারে আমার ঠিক মাথার উপর দেয়ালের গায়ের একটা ছোট্ট ছিদ্র আমায় পেয়ে বসল—সম্ভবত ও জায়গাটায় কোন দিন একটা গজাল বসান হয়েছিল, দেয়ালে তারই দাগ রয়ে গেছে। গর্তটা কতটা গভীর শুয়ে শুয়ে তাই অনুমান করতে চেষ্টা পেলাম। গর্তটা নেহাৎ যে অকারণে হয়ে গেছে, তা কিন্তু মোটেই নয়। গর্তটার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন জটিল ব্যাপার সংশ্লিষ্ট, আমাকে রহস্তময় গর্তটা থেকে আত্মরক্ষা করতেই হবে! যদি ওখান থেকেই একটা কিছু বেরিয়ে পড়ে? গর্তটার চিন্তা আমায় এতটা পেয়ে বসল যে, আমি ভয়ে ও কৌতূহলে জড়সড় হয়ে গেলাম এবং একটু পরেই আর বিছানায় পড়ে পড়ে কল্পনার জাল বুনতে পারলাম না,

চট্ ক'রে উঠে পকেট থেকে সেই পেন্সিল-কাটা ভাঙা ছুরিখানা বার করে গর্তটার গভীরতা নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এবং অগৌণে বুঝতে পারলাম যে, গর্তটা খুব বেশি গভীর নয়।

তখনই আবার শুয়ে পড়ে ঘুমোতে চেষ্টা পেলাম। কিন্তু ঘুম এল না—অন্ধকারটা আমায় যেন কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে, আর কোন শব্দই শোনা যায় না। রাস্তায় কারুর চলার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কি-না তা শুনবার জন্তে অনেকক্ষণ কান পেতে রইলাম এবং যতক্ষণ না একজনের পায়ের শব্দ পেলাম ততক্ষণ যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। শব্দ শুনে মনে হ'ল যে, লোকটা নিশ্চয়ই পাহারাওয়ালা। সহসা হাতের আঙুলগুলো মটকাতে মটকাতে হেসে উঠলাম; এ নিশ্চয়ই সেই ব্যাটা শয়তান। হা—হা। মনে হ'ল আমি যেন একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করে ফেলেছি। বিছানা থেকে উঠে বসলাম, শব্দটা ত ভাষায় নেই; আমি আবিষ্কার করেছি,—'কুবোয়া'। অন্ত আর একটা শব্দের যেমন অক্ষর আছে, এটারও তাই আছে। নিজেকে বললাম, তুমি আজ একটা শব্দ আবিষ্কার করলে—কুবোয়া···এ শব্দটার না জানি কি গভীর অর্থ।

চোখ মেলে বসে রইলাম, নিজের আবিষ্কারে নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম এবং খুশিতে তৃপ্তিতে হেসে উঠলাম। তারপর চুপি চুপি নিজের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলাম; কেউ হয় ত গোপনে আমায় লক্ষ্য করছে, সুতরাং আমার এ আবিষ্কার তার কাছে গোপন রাখতেই হবে। এইবার আনন্দের আতিশয্যের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল। শরীরটা আমার তখন বেশ হালকা, ব্যথা-বেদনাও কিছু ছিল না। আমি চিন্তার রাশ একেবারে আল্‌গা ক'রে দিলাম।

বেশি ধীরস্থির হয়ে আমার মনের সব কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার-আবিষ্কার-করা শব্দটার অর্থ-নির্দেশ

করবার আগ্রহ জেগে উঠতেই চিন্তার সূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল। এই শব্দটার অর্থ কি? এর প্রতিশব্দ যদি ভগবান বা টিভলী* দিই ত তার কোন মানে হয় না এবং এর দ্বারা পশুর মেলা বুঝায় তাই বা কে বললে? না; পরমুহূর্তেই মনে হ'ল এ শব্দের দ্বারা তালা বা সূর্যোদয়ও বোঝা যায় না। এর একটা মানে বের করা খুব কঠিন কাজ নয়। অপেক্ষা করি, আপনিই একটা অর্থ বেরিয়ে পড়বেই। ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

খাটিয়ার উপর শুয়ে শুয়ে সেয়ানার মত হাসছিলাম বটে কিন্তু কিছুই বলছিলাম না, নিজের কোন মতামতের প্রতিবাদ করার ইচ্ছাও মনে জাগে নি! আরও কয়েক মিনিট কেটে গেল, ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম; নতুন শব্দটা আমাকে ভারী জ্বালাতন করতে লাগল। একে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না। ক্রমে ভাবনায় একেবারে তলিয়ে গেলাম। এর মানে কি হতে পারে না, সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম বটে কিন্তু এর যে কি মানে হবে সে সমস্যার সমাধান কিছুতেই ক'রে উঠতে পারলাম না। আপনার মনে জোরে জোরে বলে উঠলাম, সে যাক্ গে, ভেবে পরে করা যাবে'খন। হাত মুঠো ক'রে আর একবার কথাটা আওড়ালাম। শব্দটা দৈবের দয়ায় মিলে গেছে, এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। কিন্তু শান্তি মিলল না, পর পর আরও কত কথা মনের চারদিক থেকে এসে আমাকে ছেঁকে ধরেছে, আর সেই কারণে ঘুম আমার কিছুতেই আসছিল না। অসাধারণ দুর্লভ এই শব্দটা আমার কোন কাজে আসবে বলে কিছুতেই মনে হ'ল না। আবার বিছানার উপর বসে দু হাতে মাথাটা ধরে বসে আপনার মনে বললাম, 'না! তাও ত হয় না, চুরুটের কারখানা বা উপনিবেশ কিছুই ত এ শব্দের দ্বারা বোঝায় না! যদি ও শব্দটার অর্থ অত

---

*ক্রিশ্চিয়ানা (বর্তমানে অস্লো) শহরের বায়োস্কোপ ইত্যাদি ও সাধারণের বেড়াবার স্থান পার্ক, ইত্যাদিকে টিভলী বলে।

সোজাই হবে, তা হলে অনেক আগেই তার অর্থ ঠিক করতে পারতাম। না, শব্দটার মানে কোন একটা আধ্যাত্মিক অবস্থা, একটা অনুভূতিই হবে হয় ত। এর অর্থ নিরূপণ করতে কি পারব না?'—তাই এর কোন একটা আধ্যাত্মিক মানে বার করবার জন্তে গভীর ভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। আমার মনে হ'ল, কেউ যেন চিন্তার মাঝখানে এসে আমায় বাধা দিচ্ছে। রেগে গিয়ে ব'লে উঠলাম, 'রক্ষা কর বাবা, তোমার মত ছোটলোক ত আর কাউকে দেখি নি। না, সত্যিই দেখি নি। ...চরকা কাটা?—গোল্লায় যাও তুমি।' সত্যিই আমাকে হাসতে হ'ল। আচ্ছা এ শব্দটার মানে চরকা কাটা হবে কেন, বিশেষত আমার যখন তাতে এতটুকু মত নেই? শব্দটা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি, সুতরাং এর মানে ঠিক করার অধিকার পুরোপুরি আমারই এক্তিয়ার মধ্যে, যা খুশি মানে আমি ঠিক করতে পারি, এতে অন্তের হাত দেবার ত কিছুমাত্র অধিকার নেই। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে আমি ত কোন মতামত এখনও প্রকাশ করিনি ...

কিন্তু মাথাটা ক্রমেই গুলিয়ে গেল। হঠাৎ বিছানা ছেড়ে জলের কলটা দেখবার জন্তে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। তৃষ্ণা পায় নি বটে কিন্তু মাথাটা ভারী গরম হয়ে পড়েছিল এবং আপনা থেকেই জলের প্রয়োজন অনুভব করলাম। খানিকটা জল পান ক'রে আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এবং এ বারে ঘুমিয়ে পড়বার জন্তে একান্ত মনোনিবেশ করলাম। না নড়েচড়ে কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থাকলাম কিন্তু ঘামিয়ে উঠলাম এবং শিরায় শিরায় তীব্র রক্তস্রোত টগবগ ক'রে ফুটছে অনুভব করলাম। সত্যি, লোকটা ঠোঙাটার মধ্যে যে টাকা পাবে বলে মনে করেছিল সেটা নেহাতই অভিনব উপায় সন্দেহ নেই। ও আবার একবার কেসেও ছিল। ও কি এখন সেই পথেই পায়চারী

করছে? সেই বেঞ্চিখানায়ই বসে আছে কি?—দূরে সেই উদার সুনীল সাগর ··· সেই জাহাজগুলি সারি সারি ···

চোখ মেললাম। ঘুম যখন আসতেই চাইছে না, তখন চোখ বুজে থাকি কি ক'রে? অন্ধকার আবার আমায় উত্যক্ত ক'রে তুললে। সেই অতলস্পর্শ কৃষ্ণ যবনিকা, সেই যুগযুগান্ত ধরে যার সীমানির্দেশ করবার জন্যে আমার চিন্তা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সফল হতে পারে নি। এই অন্ধকারকে বুঝবার জন্যে, অন্ধকারের একটি প্রতিশব্দ খুঁজে বার করবার কি চেষ্টাই না করলাম; এমন ভীষণ অন্ধকার প্রকাশক একটা শব্দ যা মুখে উচ্চারণ করতেই মুখ পর্যন্ত কালো হয়ে যায়। কি সাংঘাতিক অন্ধকারই না! সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিন্তার সূত্র সাগর ও যে-অন্ধকার দানবটা সেখানে আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে তার পানে ধেয়ে গেল। তারা যেন আমায় তাদের দিকে আকর্ষণ ক'রে নেবে এবং হাতে পায়ে শক্ত ক'রে বেঁধে আমায় এমন এক অন্ধকারের রাজ্যে নিয়ে যাবে, যে রকম অন্ধকার কেউ কখনও দেখে নি। মনে হ'ল, আমায় যেন জলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বেশ বুঝতে পাচ্ছি। ডুবতে ডুবতে দেখতে পেলাম চারদিকে বিরাট মেঘপুঞ্জ ছড়িয়ে রয়েছে।

বিছানাটা শক্ত ক'রে চেপে ধরে ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম—আমি যেন একান্ত বিপন্ন হয়েই পড়েছি, জীবনের যেন আর কোনই আশা নেই। খাটিয়ার কাঠের পায়ায় হাত ঠুকতেই বুঝতে পারলাম, এবারে জবর বাঁচা বেঁচে গেছি! আপনার মনে এই কথা আওড়ালাম, এই রকম ক'রেই কি লোক মারা যায়! এখন মর তুমি!—খানিকক্ষণ অমনই পড়ে রইলাম এবং আমি যে মরতে বসেছি সে কথাই ভাবতে লাগলাম।

পরে হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসে পরুষকণ্ঠে শুধালাম, 'যে শব্দটা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি, তার কি মানে হবে তা স্থির করার

অধিকার কি আমার নিজের হাতে নেই !…' আমি যে প্রলাপ বকছি, নিজেই তা স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছিলাম; এই যে কথা বলছি তা এখনও শুনতে পাই। আমার এই উন্মত্ততা দৌর্বল্য থেকে এসেছিল এবং জ্ঞান একেবারে হারাই নি। হঠাৎ মনে হ'ল যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। ভয় পেয়ে আবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এবং দরজা খোলবার জন্যে টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম এবং বার কয়েক দেওয়ালেও মাথা ঠোকলাম। চীৎকার ক'রে হাতের অঙুল কামড়ালাম এবং গালাগালি …

চারিদিক নিস্তব্ধ নীরব; কেবল দেয়ালে আমার স্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। মেঝের উপর পড়ে গেলাম, ঘরের মধ্যে আর নিজেকে আটকে রাখতে পারছিলাম না।

সেখানে শুয়ে আমার চোখের সামনে দেয়ালের গায়ে ধূসরবর্ণ চারকোণ একটা ছায়া দেখতে পেলাম—সম্ভবত দিনের আলো। এটা যে দিনের আলো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, প্রতি লোমকূপে তা অনুভব করছিলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! মেঝের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম এবং বাঞ্ছিত দিনের আলো দেখতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার ক'রে উঠলাম। কৃতজ্ঞতায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম এবং টলতে টলতে পাগলের মত জানলার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এবং সেই মুহূর্তে আমি কি করছি সে বিষয়ে একান্ত সজ্ঞান ছিলাম। আমার সকল অবসাদ বিদূরিত হ'ল; নিরাশা ও ব্যথা সবই দূর হ'ল এবং সেই মুহূর্তে আমার সকল আশা আকাঙ্খাই পূর্ণ হ'ল। হাত জোড় ক'রে মেঝের উপর বসে উষার জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

কি রাত্রিই না কাটালাম!

তারা কি কোন গোলমালই শুনতে পায়নি! অবাক হয়ে এই কথাই শুধু ভাবলাম। আমি ছিলাম ভদ্রলোকের শ্রেণীতে, সাধারণ

অপরাধীদের চেয়ে উঁচু শ্রেণীতে। আমি ত আর যে-সে লোক নই! ঘরহারা মন্ত্রীমশায় আর কি!

মনটা তখন অনেকটা শান্ত। দেয়ালের যেখানটায় চারকোণ আলোটা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল সেই দিকে চেয়ে ছিলাম। আমি যেন সত্যিই মন্ত্রীমশায়, আর আমার নাম ফন ট্যানজেন, আমার বক্তৃতা লাল ফিতে দিয়ে ফাইল ক'রে রাখা হয়। আমার খেয়াল তখনও কমে নি, তবে স্নায়বিক দুর্বলতা অনেকটা কমেছে! যদি ভুল ক'রে পকেট-বইখানা বাড়ীতে ফেলে না আসতাম, তা হলে আজ মন্ত্রীমশায়ের মত আমার চমৎকার বিছানাখানা খালি থাকত নিশ্চয়ই! যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে হেলতে দুলতে গিয়ে সেই খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়লাম।

ইতিমধ্যে ঘরে যথেষ্ট আলো এসে পড়েছে, ঘরের সব কিছু অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, এমন কি, দরজার হাতলটা পর্যন্ত নজরে এল। যে নিকষ কালো ঘন অন্ধকার সারারাত আমায় উত্যক্ত ক'রে তুলেছিল এবং নিজেকেও যে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দেখতে পাই নি এখন তা দূর হয়েছে; রক্তও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দরজায় শব্দ হতেই জেগে উঠলাম। তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা পরে বাইরে এলাম। রাত্তিরের সেই ভিজে জামা-কাপড় তখনও সেই অবস্থায়ই ছিল।

কনস্টেবল বললে, 'নীচে গিয়ে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

তবে কি এখনও অনেক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আছে নাকি? ভয়ে ভয়ে ভাবলাম।

নীচে একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। সেই ঘরে আমার

মত ত্রিশ-চল্লিশ জন ঘর-হারা বসে ছিল। তাদের একে একে নাম ধরে ডাক হচ্ছিল এবং তাদের সকলকে জল-খাবারের টিকিট বিলি করা হচ্ছিল। বড়সাহেব বারে বারে পাশের কন্‌স্টেবলকে বলছিলেন, 'সকলেই টিকিট পাচ্ছে ত? ওদের প্রত্যেককে টিকিট দিতে ভুল করো না যেন। ওদের চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে যে, ওদের ভারী খিদে পেয়েছে!'

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই টিকিট-দেওয়া দেখছিলাম। আমারও ইচ্ছে হ'ল, আমায় যদি একখানা টিকিট দেয়।

'য়্যান্ড্রিয়াস ট্যানজেন—লেখক।'

মাথা নীচু ক'রে এগিয়ে গেলাম।

'মশায়, আপনি কি ক'রে এখানে এলেন?'

আমি সমস্ত ঘটনা বলে গেলাম! কাল রাত্তিরে যে বলেছিলাম, এখনও তাই পুনরাবৃত্তি করলাম মাত্র, মিথ্যা বলতে এতটুকু জড়িয়ে গেল না, সরল ভাবে স্রেফ বানানো কাহিনী বলে গেলাম—'রাত্তিরে বেরিয়েছিলাম, দেরি হয়ে গেল, দুর্ভাগ্য ··· কাফিখানায় ··· ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলিছি ···

বড়সাহেব হেসে বলল, 'হুঁ, তাই নাকি! তা রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?'

আমি জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই, একেবারে নবাব পুত্তুরের মত ঘুমিয়েছি।'

সে বললে, 'শুনে খুশি হলাম।' এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় অভিবাদন করলে।

আমি চলে এলাম!

টিকিট! আমায় একখানা টিকিট দিলে না! তিন দিন তিন রাত্তির কিছুই খাই নি। একখানা রুটি! কিন্তু কেউ ত আমায়

একখানা টিকিট দিলে না এবং নিজেও চাইতে সাহস পেলাম না। কেন না, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ ওদের মনে সন্দেহ জেগে উঠবে। আর তা হ'লেই গোপনে আমার সব কিছু জেনে আমার সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে যাবে। মিথ্যা বলার জন্যে ওরা আমায় ফৌজদারী সোপর্দ পর্যন্ত করতে পারে; কাজেই মাথা উঁচু ক'রে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দস্তুরমত গ্রামভারী চালে ফাঁড়ি ছেড়ে চলে এলাম।

সূর্য উঠেছে। আকাশ খুব পরিষ্কার। বেলা দশটা হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকের ভিড় আরম্ভ হয়ে গেছে। কোন্ দিকে যাই? পকেট বাজিয়ে লেখাটা ঠিক আছে কি-না দেখে নিলাম। বেলা এগারটার সময় সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ লোক চলাচল দেখলাম। ইত্যবসরে জামা-কাপড় অনেকটা যেন শুকিয়ে আসছিল। এবার ক্ষুধা দারুণ হয়েই দেখা দিল, নাড়িভুড়ি সবই যেন হজম হয়ে আসছে।

আচ্ছা, এমন একজন বন্ধু, চেনা লোকও কি নেই আমার, যার কাছে দু-চার আনা চাইতে পারি? স্মৃতির পাতা ওলট-পালট ক'রে দেখলাম, কিন্তু চারটে পয়সা চাইলে পেতে পারি এমন কাউকে পেলাম না।

সে যাই হোক গে, দিনটা কিন্তু ভারী চমৎকার। উজ্জ্বল সূর্যালোক, চারিদিকেই বেশ গরম। পাহাড়ের উপর দিয়ে আকাশটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা নীল সমুদ্রের মত।

অজ্ঞাতসারেই বাড়ীর দিকে চলেছি! খিদে যেন আমায় খেয়ে ফেলছিল! রাস্তায় একটুকরা কাঠ কুড়িয়ে পেলাম, তাই চিবোতে শুরু করে দিলাম। এতে একটু আরাম পেলাম। এত শীগগিরই যে আমার খিদের জ্বালায় কাঠের টুকরা চিবোতে হবে তা কিন্তু ভাবি নি। ঘরের দরজা খোলাই ছিল; আস্তাবলের ছোকরাটা যথারীতি অভিবাদন করলে।

সে বললে, 'আজকের দিনটা ভারী চমৎকার !'

জবাব দিলাম, 'হাঁ।'

এর বেশি কিছু বলবার মত পেলাম না। ওর কাছেই কি একটা টাকা ধার চাইব? ওর কাছে যদি থাকে, তা হ'লে নিশ্চয়ই দিবে; বিশেষত একবার ওকে একখানা চিঠিও ত লিখে দিয়েছি।

ছেলেটা আমার সঙ্গে কথা বলবার পূর্বে সামনে এসে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কি ভেবে নিলে।

'দিনটা চমৎকার ! ... আজকে আমায় ঘর ভাড়া দিতে হবে। অথচ হাতে টাকা নেই। গোটা তিনেক টাকা ধার দিতে পারেন? দিন কয়েক বাদেই দিতে পারব। আর একবার আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছিলেন, সত্যি বড় উপকার হয়েছিল।'

জবাব দিলাম, 'কিন্তু আমার পক্ষে ত এখনই টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না ভাই, বিকেল পর্যন্ত হয় ত দিতে পারব।'

টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে এগিয়ে চললাম।

বিছানার উপর গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে হেসে উঠলাম। ভাগ্যে ছেলেটা আগেই তার অভাব আমায় জানালো; মানটা রইল। তিনটে টাকা ! তুমি সুখী হও ছোকরা ! তিন হাজার টাকা চাইলেও এই জবাবই পেতে হত !

এবং এই তিনটে টাকার কথা মনে ক'রে আমার হাসি পেল। জোরে হেসে উঠলাম। নিজেই যে আজ কপর্দকহীন, সে দেবে তিনটে টাকা ! আহ্লাদটা যেন বেড়ে গেল। এবং তাতে বাধা দিলাম না। উঃ ! রান্নার কি বিশ্রী গন্ধ আসছে এখানে—চপ-কাটলেটের গন্ধ কি ভয়ানক বিশ্রী ! উঠে গিয়ে তখ্‌খুনি জানলাটা খুলে দিলাম—এই জঘন্য গন্ধটা যেন বাতাসের সঙ্গে বাইরে চলে যায়।

'বয়, আরও এক প্লেট মাংস এনে দাও!' টেবিলের দিকে

তাকালাম—আমার এই অধম জীর্ণ টেবিলটা, লিখবার সময় হাঁটু দিয়ে ঠেকো দিতে হয়, একটা পা তার নেই—মাথা নুইয়ে বললাম, 'এক পাত্র মদ দেব ? না ? আমি ম. ট্যান্‌জেন্‌—মন্ত্রী ট্যান্‌জেন্‌। দুঃখের বিষয়—একটু দেরি হয়েছিল ঘরে ফিরতে···দরজার চাবি···'

আবার আমার চিন্তা চারিদিকের নানা জটিল বিষয়ে জড়িয়ে গেল, রাশ বাগাতে পারলাম না। তবে এ জ্ঞানটা আমার সব সময়ই ছিল যে, আমি যা-তা বকে যাচ্ছি। তবু প্রত্যেকটি কথা শুনে বুঝে তবে তার জবাব দিয়েছি। নিজেই নিজেকে বললাম, 'আবার তুমি যা-তা বকছ !' কিন্তু তবু আত্মসংবরণ করতে পারছিলাম না। এ যেন জেগে ঘুমোনো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলা।

মাথাটা বেশ চঞ্চল, তবু কিন্তু ব্যথা বেদনা কিছুই ছিল না। মেজাজটাও বেশ পরিষ্কার। খেয়ালের মুখে ভেসে যাচ্ছিলাম, নিষ্কৃতি পাবার কোন চেষ্টাই করতে পারলাম না।

'ভিতরে এস ! হাঁ, সোজা ভিতরে এস ! যা-সব দেখছ সবই দামি হীরামুক্তার তৈরি—ল্যাজালি, ল্যাজালি ! সেই বৃহৎ প্রাসাদে স্বর্ণোজ্জ্বল শয্যা ! কি অনুরাগের সঙ্গে সে নিঃশ্বাস ফেলছে। প্রেয়সী আমার, চুম্বন দাও—আরও—আরও ! তোমার বাহু যুগল ম্লান তৃণমণির মত, অনুরাগে তোমার মুখ আরক্তিম হয় ··· ছোক্‌রা, তোমায় না মাংস দিতে বললাম ! ···'

সূর্যালোক জানলার মধ্যে দিয়ে ঘরে বিকীর্ণ হচ্ছিল এবং নীচে আস্তাবলে ঘোড়াগুলির ছোলা চিবানোর শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম। বসে বসে আপনার মনে পরমানন্দে সেই কাঠের কুচোটা চিবোচ্ছিলাম—প্রাণে তখন শিশুর অহৈতুক খুশি।

লেখাটার কথা কিন্তু সব সময়েই আমার মনে জাগরূক ছিল। আসলে পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবি নি বটে কিন্তু ওটা যেন

আমার দেহের সকল রক্তবিন্দুর সঙ্গে মিশে আছে, আমি কিছুতেই মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি নে, ও যেন আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সেটা পকেট থেকে বার করলাম।

লেখাটা ভিজে গেছল; আস্তে আস্তে সাবধানতার সঙ্গে ভাঁজ খুলে রোদে শুকোতে দিলাম। ঘরের মধ্যেই পাইচারী শুরু করলাম। চারিদিকের সবকিছুই যেন বিষণ্ণ, মলিন। ছোট ছোট টিনের অনাবশ্যক টুক্‌রাগুলি ইতস্তত সারা মেঝেময় ছড়িয়ে আছে। ঘরে বসবার একখানা চেয়ার নেই, এমন কি, দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকও নেই। সবকিছুই একে একে বাঁধা দিয়ে খেয়ে বসেছি। খান কয়েক কাগজ টেবিলের উপর পড়ে আছে, তার উপর আধ ইঞ্চি পুরো ধুলো জমে আছে; এই হচ্ছে আমার বর্তমানের একমাত্র সম্পদ। বিছানায় যে পুড়োনো কম্বলখানা রয়েছে, তা মাস কয়েক আগে হ্যান্স পলীর কাছে থেকে ধার নিয়েছিলাম। ··· হ্যান্স পলী! হাতের আঙুলগুলি মটকালাম। হ্যান্স পলী পেটার্‌শন আমায় সাহায্য করবে! তার কাছে আগেই চাই নি ব'লে সে নিশ্চই অসন্তুষ্ট হবে। মাথায় তথ্‌খুনি টুপিটি চড়িয়ে লেখাটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরে নীচে নেমে গেলাম।

অন্তরালে গিয়ে ছোক্‌রাকে ডেকে বললাম, 'শোন, বিকেলে তোমায় হয় ত কিছু দিতে পারব।'

টাউন হলে পৌছে দেখতে পেলাম, এগারটা বেজে গেছে এবং তথ্‌খুনি সম্পাদকের কাছে যাব ঠিক করলাম। আপিসের বাইরে দাঁড়িয়ে লেখাটার পত্রাঙ্ক ঠিক আছে কি-না ও যেখানে কাগজগুলি ঘেঁাচ লেগে গেছে সেখানটা ঠিক ক'রে পকেটে রেখে দিলাম। এবং দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম! ঘরে ঢুকবার সময় আমার বুকে দপ দপ্‌ করে শব্দ হচ্ছিল।

সম্পাদকের সহকারী কাজ করছে। সন্ত্রস্ততার সুরে সম্পাদক মশায়ের

খবর জিজ্ঞাসা করলাম। জবাব পেলাম না কিছু। লোকটা মফঃস্বলের কাগজ থেকে ছোট খাট সব খবর কেটে কেটে নিচ্ছিল।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ফের জিজ্ঞাসা করলাম। এবারে সে জবাব দিল, 'তিনি এখনও আসেন নি।'—মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

'তিনি তা হ'লে কখন আসবেন ?

'কখন আসবেন তা বলতে পারি নে, কিছু ঠিক নেই।'

'আপিস কতক্ষণ খোলা থাকবে ?'

এ প্রশ্নের কোন জবাবই আর পেলাম না, কাজেই বাধ্য হয়ে চলে এলাম। সহকারী মশায় এর মধ্যে একবারও আমার দিকে চেয়ে জবাব দেবার ফুরসৎ পেলেন না। সে আমার গলার স্বর শুনতে পেয়েই আমায় চিনতে পেরেছিল। আপনার মনে ভাবলাম, 'কি অসময়েই তুমি এখানে এসেছ যে, লোকটা তোমার কথার জবাব দেবার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করলে না। সম্পাদকদের এই রীতি। যে দিন থেকে আমার সেই চমৎকার গল্পটা এঁদের কাগজে বার হয়েছিল, তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমার কত অবাঞ্ছিত লেখা নিয়েই না এঁদের বিরক্ত করেছি, আর প্রতিবারেই তাঁরা লেখা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন। হয় ত তিনি আর আমার লেখা চান না, তাই এ ব্যবস্থা ··· রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

পেটায়শন চাষীর ছেলে, এখানে পড়াশুনা করে, এক পাঁচতালা বাড়ীর চিলেকোঠায় থাকে; সুতরাং সে যে গরীব সে বিষয়ে কারুরই সন্দেহ হবার কথা নয়। কিন্তু তা হ'লেও তার কাছে যদি একটা টাকাও থাকে, সে আমায় ফেরাবে না। তার কাছে টাকা থাকাও যা, আমার নিজের পকেটে থাকাও তাই। তাই পথ চলতে চলতে এই কথাটা ভেবেই আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম যে, তার কাছে একটা টাকা থাকলে নিশ্চয়ই সেটি আমি পাবই।

পেটার্‌শন যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ীর সদরে এসে দেখলাম, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ; তাই কড়া নাড়লাম।

একটি স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকতে গিয়ে বললাম, ‘আমি পেটার্‌শনকে চাই, পড়ুয়া পেটার্‌শন। তার ঘর আমি জানি।’

স্ত্রীলোকটি জবাব দিলেন, ‘যিনি চিলেকোঠায় থাকতেন? তিনি ত আজকাল এখানে থাকেন না। এ বাড়ী ছেড়ে গেছেন।’

স্ত্রীলোকটি তার নতুন ঠিকানা জানে না ; তবে পেটার্‌শন বলে গেছে যে, তার চিঠিপত্র সব অমুক জায়গায় পাঠাতে হবে। তাই সে আমায় সেই ঠিকানাই দিলে।

আমি একান্ত নির্ভরতা নিয়ে সারাটা পথ চলে তার সে নতুন ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে তাকে না পেলে আর কোথাও কিছুমাত্র আশা নেই। পথে একটা সদ্য তৈরি বাড়ীর সদরে জনকয়েক ছুতার মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে কি করছিল দেখতে পেলাম। এক পাশেই কাঠের অনাবশ্যক টুক্‌রা-টাক্‌রার স্তূপ পড়ে আছে, তার থেকে একটি কুচো তুলে নিয়ে মুখে পূরে দিলাম, আর একটি পকেটে নিলাম, পরে কাজ দেখবে। আবার চলতে শুরু করে দিলাম।

খিদের জ্বালায় আমি আর্তনাদ ক’রে উঠলাম। এক রুটিওয়ালার দোকানে এক আনা দামের বড় বড় রুটি সব সাজান রয়েছে দেখতে পেলাম। এক আনায় এর চাইতে বড় রুটি কোথাও পাওয়া যায় না।

‘আমি ছাত্র পেটার্‌শনের ঠিকানা চাচ্ছি।’

‘দশ নম্বর বার্‌নটু সাকার্স স্ট্রীটে সে থাকে, চিলেকোঠায়।’

সেখানেও যাব? তা হ’লে পেটার্‌শনের নামের কোন চিঠিপত্তর থাকলে ত অনায়াসে নিয়ে যেতে পারি।

সেই পথে পুনরায় শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে এগিয়ে চললাম। সে ছুতার মিস্ত্রির দল তখনও পথে বসে দিব্য আরামের সঙ্গে খাবার খাচ্ছে।

রুটিওয়ালার দোকানের সেই রুটিগুলা তখনও ঠিক তেমনই ভাবেই সাজান রয়েছে। অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে বন্ধু যে রাস্তায় থাকে সেখানে পৌছলাম, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে আমি তখন একান্ত অবসন্ন। দরজা খোলাই ছিল, এক-এক লাফে দু-তিন ধাপ পার হয়ে গিয়ে চিলছাদে পৌছলাম। আমায় দেখেই যেন পেটার্‌শন খুশি হয়ে যায় এই মতলবে পকেট থেকে তার নামের চিঠিগুলি বার ক'রে নিলাম।

আমার অবস্থার কথা শুনে সে যে আমার সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হবে না, সে বিষয়ে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। না, কিছুতেই সে আমায় ফেরাবে না। তার মেজাজ খুব দরাজ, এ কথা ত বহুবার আমি বলেছি! ··· দরজার একপাশে তার নাম লেখা একখানা কাগজ ঝুলছিল, তাতে লেখা আছে—সে দেশে গেছে।

শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সেই মাটীর উপরই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তখন আর আমার নড়বার চড়বার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। বার কয়েক আপনার মনে আওড়ালাম, 'দেশে গেছে—দেশে গেছে!' তারপর একেবারে চুপ মেরে গেলাম! চোখে এক বিন্দু জল নেই, কোন রকম অনুভূতিই আর ছিল না। তখন কি করা উচিত সে বিষয়ে কিছু ঠিক না ক'রে হাঁ ক'রে তাকিয়ে বসে রইলাম, হাতে পেটার্‌শনের চিঠিগুলি, মিনিট দশেক কেটে গেল—বিশ মিনিট কি তারও বেশি পেরিয়ে গেল। সেই খানটাতেই নিশ্চল পাথরের মত বসে ছিলাম, আঙুলটি পর্যন্ত নড়ে নি। তখন আমার দস্তুর মত নির্বেদ অবস্থা। অনেকক্ষণ বাদে সিঁড়ি বেয়ে কে আসছে শুনতে পেলাম।

'আমি পেটার্‌শনের কাছে এসেছিলাম। তার নামে দুখানা চিঠি আছে ···'

যিনি এলেন তিনি একজন স্ত্রীলোক। বললেন, 'তিনি ত ছুটিতে

বাড়ী গেছেন। তাঁর চিঠি ইচ্ছে হ'লে আমার কাছে রেখে যেতে পারেন!

জবাব দিলাম, 'বেশ ত, তাই ভাল। এলেই ত আপনার কাছ থেকে চিঠিগুলি পাবে সে। চিঠিগুলি জরুরিও হতে পারে।... নমস্কার!'

বাড়ীর বাইরে এসে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে হাত মুঠো ক'রে চীৎকার ক'রেই ব'লে উঠলাম, 'লোকে তোমায় সর্বশক্তিমান বলে। আমি বলি তারা বোকা,—তুমি একটি নিরেট!' এবং দাঁতে দাঁত ঘষে আকাশের দিকে চেয়ে প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়লাম। 'তুমি খাঁটি নিরেট, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি।'

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই আবার থমকে দাঁড়ালাম! সহসা আমার মনোভাব বদলে গেল। হাত জোড় ক'রে বিনীতভাবে বলে উঠলাম, 'তাঁর কাছে তোমার আবেদন জানিয়েছ বাছা?'

কথটা ঠিক শোনাল না!

আবার ব'লে উঠলাম, 'তাঁকে প্রার্থনা জানিয়েছ?' সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা নীচু হয়ে এল এবং সুর নরম ক'রে জবাব দিলাম, 'না!'

এটাও ঠিক শোনাল না।

হ্যাঁ রে নির্বোধ কোথাকার! ভণ্ডামি ত চলবে না তোর! হ্যাঁ, এ কথা বলা উচিত যে, আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা জানিয়েছি। এবং সে প্রার্থনায় নম্রতা ও আন্তরিকতা থাকা চাই, তবেই না তাঁর দয়া হবে! কিন্তু খামকাই তাঁকে দোষ দিলে ত চলবে না।...তা হ'লে ত আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গেই আমি হাঁটুগেড়ে সেই মাঝ-পথে প্রার্থনা করতে বসে গেলাম। রাস্তার লোকগুলি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে যাচ্ছিল।

আমার পকেটে যে কাঠের কুচো ছিল তাই অবিরাম চিবোতে চিবোতে এগিয়ে চললাম, চলার গতিবেগ আমার কমেও নি বাড়েও নি, অথচ কোন দিকে খেয়ালও ছিল না। খেয়াল যখন হ'ল তখন দেখি রেলওয়ে স্কোয়ারের সামনে এসে পৌছেছি। গীর্জার ঘড়িতে তখন দেড়টা বেজে গেছে। একটু থেমে দাঁড়িয়ে ভেবে নিলাম। কপালে অস্পষ্ট ঘাম দেখা দিল এবং তা চোখের পাতা বেয়ে গড়িয়েও পড়ল। নিজে নিজেই বললাম, 'আমার সঙ্গে পুল পর্যন্ত যেতে পারবে ?'

মাথা নীচু ক'রে একবার নিজেকে নমস্কার করলাম এবং জেটির কাছে রেল পুলের দিকে এগিয়ে চললাম।

সেখানে জাহাজগুলি ভিড় ক'রে রয়েছে। সূর্যের কিরণে সাগরের নীল জল দুলছে, মাঝে মাঝে জাহাজের সিটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, কুলিরা বড় বড় মোটগুলি ওঠাতে-নামাতে ব্যস্ত, চারদিকে হাঁকডাকের সীমা নেই। আমার পাশেই এক বুড়ী কেক্-বিস্কুট বিক্রি করবার জন্যে একান্ত যত্নের সঙ্গে পরিপাটি ক'রে পণ্যসম্ভার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার সামনে একটি পুচ্‌কে টেবিলে নানারকম জিনিস থরে থরে সাজান রয়েছে। স্ত্রীলোকটা তার কেক্-বিস্কুটের গন্ধে সারা পোস্তাটা ভরে তুলেছে। ছ্যাঃ। এ সব জঘন্য খাদ্য ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত।

আমার পাশে-বসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জুড়ে দিলাম। এখানে সেখানে এ সব বিশ্রী কেক্-বিস্কুট বিক্রি করার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জানালাম। যুক্তির উপযোগিতা তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। ··· কিন্তু আমার এ অভিযোগের ভিতর গলদ আছে বলেই যেন ভদ্রলোক মনে করলেন। এবং কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনি স্থান ত্যাগ ক'রে গেলেন। তাঁকে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিতে সংকল্প ক'রে আমিও উঠে তাঁর পিছু নিলাম।

বললাম, 'স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখলেও …' বলেই তাঁর কাঁধে চাপড় দিলাম।

লোকটি চমকে উঠে আমার দিকে সভয়ে চেয়ে জবাব দিলেন, 'মাপ করুন আমায়, আমি এখানে নতুন এসেছি, এখানকার হালচাল সম্বন্ধে আমার কিচ্ছু জানা নেই।'

'ওঃ, তা হ'লে ত সে আলাদা কথা।' কথা আর এগুলো না। … আমি কি ওঁর কোন কাজে আসতে পারি নে? অন্তত শহরটাও ত ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। তাই নয় কি? ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আমার আনন্দই হবে, আর আমার সঙ্গে বেরুলে ওঁর খরচও কিছু নেই! …

কিন্তু লোকটি যেন শুদ্ধ আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই চান। তাই তিনি এখান থেকেও চট্‌পট্ সরে পড়লেন।

আমি ফের গিয়ে বেঞ্চিখানায় বসে পড়লাম। ভয়ঙ্কর ভাবে উত্যক্ত হয়ে পড়েছিলাম। দূরে নারীকণ্ঠে কে গান গাইছিল, তার সে করুণ সুরে আমার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরায় একটা তীব্র রক্তস্রোত বইয়ে দিলে। আমার প্রতিটি ধমনিতেও যেন এই বিষাদের সুরই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মুহূর্তকাল পরেই আমি বেঞ্চিতে কায়েম হয়ে বসে পড়ে গানের সঙ্গে সুর মেলাতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। উদ্গত কান্নার বেগ কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না।

যখন কেউ না-খেয়ে মরতে বসে তখন তার মর্জি যে কত দিকে কত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা বলা শক্ত। গানের সুরে সমান তাল দিতে লাগলাম, সুরে যেন নিজেকে মিশিয়ে ফেললাম, এবং মনে হ'ল যেন সুরের সঙ্গে তালে তালে শূন্যে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। আমার সারা অন্তরটা আনন্দে নেচে উঠল। …

মেয়েটি এসে আমার কাছে দুটা পয়সা চাইল। 'দুটো পয়সা দাও বাবু!'

না ভেবে চিন্তে জবাব দিলাম, 'হাঁ, দিচ্ছি, দাঁড়াও।' উঠে দাঁড়িয়ে এ-পকেট সে-পকেট একান্ত মনোযোগের সঙ্গে পাতিপাতি করে খুঁজে দেখলাম, মেয়েটি কিন্তু মনে করল, তাকে নিয়ে আমি রহস্য করলাম মাত্র। এবং একটি কথাও না বলে সেখান থেকে সে দূরে সরে গেল।

তার সে নীরব সহিষ্ণুতা আমায় একেবারে পেয়ে বসল। সে যদি আমায় গালাগালি দিত ত বরং সহ্য করা সম্ভব হ'ত। তাকে দুটো পয়সা দিতে না-পারার দুঃখকষ্ট আমায় যেন বিঁধতে লাগল। আমি তাকে ডেকে বললাম, 'এখন আমার কাছে একটা পয়সাও নেই; তবে তোমার কথাটা আমি ভুলব না, হয় ত কালই তোমায় কিছু দিতে পারব। তোমার নাম কি ··· বেশ, বেশ, সুন্দর নাম; আমি ভুলব না তোমার কথা। তবে কাল আবার দেখা হবে। ···'

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম সে আমার কথা বিশ্বাস করল কি-না, অবশ্য সে একটি কথাও কইল না; দুঃখেকষ্টে কেঁদে ফেললাম, রাস্তার একটা কুলটাও করে আমায় অবিশ্বাস!

আবার তাকে ডাকলাম এবং সে আসতেই কোটটা আমার গা থেকে টেনে খুলে ফেলে তাকে ওয়েস্ট-কোটটা দিতে যাচ্ছিলাম। তাকে বললাম, 'ক্ষতিপূরণ করব, একটু সবুর কর।' কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ত ওয়েস্ট কোট নেই, সেটা ত বাঁধা রেখেছি! কয় সপ্তাহ আগেই ত ওটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমার কি হয়েছে? মেয়েটি আমার ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে আর কিছুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে সভয়ে আমার সামনে থেকে চলে যাচ্ছিল এবং আমিও আর তাকে বাধা দিলাম না। আমার চার পাশে পথ চলতি লোকের ভিড় জমে গেল; তারা জোরে জোরে হেসে উঠল। ভিড় ঠেলে একটা পাহারাওয়ালা এসে আমার কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইল, কি হয়েছে? হল্লা কিসের?

আমি জবাব দিলাম, 'কিছুই হয় নি! আমি ওই ছোট্ট মেয়েটিকে আমার ওয়েস্ট কোটটা দিতে চাইছিলাম ··· তার বাপের জন্তে ··· আপনারা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন যে বড় ··· বাড়ী গিয়ে এখনই আমি আর একটা ওয়েস্ট কোট পরব।'

পাহারাওয়ালা বললে, 'রাস্তায় হল্লা করতে হবে না, এবারে সব যে-যার সরে পড়।' এই বলে সে আমায় একটা ধাক্কা দিলে।

পাহারাওয়ালা আবার আমায় ডেকে বললে, 'এ সব কাগজ কি তোমার?'

তাই ত, এ যে আমারই লেখা কাগজ সব। খবরের কাগজের জন্ত যে প্রবন্ধটি লিখেছি, এ যে দেখছি তারই পাণ্ডুলিপি। হ্যাঁ, খুব দরকারী কাগজ। এদিকে ত খেয়ালই ছিল না আমার।' এই বলে তার হাত থেকে কাগজগুলি ছিনিয়ে নিয়ে সটান খবরের কাগজের আপিসের দিকে জোর পায়ে হেঁটে চললাম।

গীর্জার ঘড়িতে চারটা বেজে গেছে। আপিস বন্ধ হয়ে গেছে। নিঃশব্দে চোর যেমন পালিয়ে আসে ঠিক তেমনইভাবে নীচে নেমে এলাম। দরজার সামনে অস্থির ভাবে থম্‌কে দাঁড়ালাম। এখন কি করি? দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ইটগুলির দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে ভাবছিলাম। পায়ের কাছে একটা আল্‌পিন ঝক ঝক করছে। মাথা গুঁজে সেটা তুলে নিলাম। আচ্ছা, কোটের বোতামগুলি খুলে নিয়ে বিক্রি করতে চাই, তা হ'লে কত পাব? হয় ত কিছুই মিলবে না। বার বার নেড়েচেড়ে সেগুলি দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল সেগুলি এখনও নতুনই রয়ে গেছে। যাক ভাগ্যে এ সন্ধানটা মিলে গেল। পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়েই বোতামগুলি কেটে নিয়ে বন্ধকীদোকানে গিয়ে বাঁধা দিতে পারি। পাঁচটা বোতাম বিক্রী করার সম্ভাবনা আছে দেখে ভারী খুশি হলাম এবং চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, এ দিয়েই আজকার মত

কাজ চালিয়ে নিতে পারব !' খুশিতে আমার চিত্ত একেবারে ভরে গেল এবং একটার পর একটা ক'রে বোতামগুলি ছাড়াতে বসে গেলাম। এ কাজে যখন ব্যস্ত ছিলাম তখন আপনার মনেই এই কথাগুলি বলাবলি করতে লাগলাম :

'দেখতেই ত পাচ্ছ, একটু টানাটানি চলেছে ; অবশ্য অভাব অনটনটা সাময়িক ··· একে ত আর স্থায়ী দারিদ্র্য বলা চলে না। কিছু বলতে গিয়ে কখনও বেফাঁস কিছু ব'লে না ফেলাই ভাল। আচ্ছা, অনেকে ত দেখেছি কোটের বোতাম না লাগিলেও জামা পরে। আমি সব সময়ই বুক খোলা রেখেই কোট পরি ; এ আমার অভ্যাস, এবং একটা খেয়াল। ··· না, না, তুমি যদি তাতে রাজী না হও, বেশ ! আমি কিন্তু এইগুলি বেচে অন্তত এক আনার পয়সা চাই-ই।···না ? কে বলছে তোমার করতেই হবে ? চুপ ক'রে থেকে আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও ত লক্ষী। ··· ইচ্ছে হলে পাহারাওয়ালাও ডাকতে পার, পার না ? আমি এখানেই আছি, যাও না, ডেকে নিয়ে এসো গে। তোমার কিছুই চুরি করব না। বেশ, নমস্কার ! নমস্কার ! হ্যাঁ, হ্যাঁ ! আমার নাম ট্যানজেন ; একটু দেরিতে ঘরের বার হয়েছিলাম। ···

কে একজন উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল। জ্ঞান ফিরে এল, অবস্থাটা বুঝতে পেলাম। দেখলাম সহকারী মহাশয়। তাড়াতাড়ি বোতামগুলি পকেটে রেখে দিলাম। সে আমায় দেখতে পায় নি। চলে যাচ্ছিল, অভিবাদন করলাম কিন্তু প্রত্যভিবাদন করলে না সে। হঠাৎ যেন হাতের নখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি তাকে সম্পাদকের খবর জিজ্ঞাসা করলাম।

'তিনি ভেতরে নেই।'

'মিথ্যে বলছ !' বললাম এবং এমন ভ্যাংচিয়ে উঠলাম যে, নিজেই

অবাক হয়ে গেলাম। আবার বললাম, 'তাঁকে একটা খবর আমায় বলতেই হবে; খুব জরুরি খবর, বলতেই হবে।'

'সে খবর কি আমায় বলতে পার না?'

'তোমায় বলব!' আপাদমস্তক তার দিকে নজর বুলিয়ে নিলাম। তাতে ঈপ্সিত ফলও ফলল। তখনই সে দরজা খুলে আমায় ভিতরে নিয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম, মুখ বুজে দাঁতে দাঁতে চেপে সাহস সঞ্চয় ক'রে নিলাম। দরজার কড়া নেড়ে সম্পাদকের খাস-কামরায় ঢুকে পড়লাম।

'এই যে, তুমি এসেছ?' সম্পাদক সদয়ভাবে বললেন, 'বসো।'

তিনি যদি আমায় ঘরের বার ক'রে দিতেন তাতেও আমার দুঃখ করবার কিছু ছিল না। আমার যেন রুদ্ধ আবেগে কান্না ফেটে পড়ছিল। অনেক কষ্টে বললাম, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম, যাক ...'

তিনি পুনরায় বললেন, 'বসো না আগে!'

বসে পড়ে তাঁকে বললাম, 'আর একটা প্রবন্ধ লিখেছি, সেটাও দিতে চাই। এটা লিখতে অনেক খেটেছি।'

'পড়ব, রেখে যাও।' ব'লে হাত বাড়িয়ে লেখাটা গ্রহণ করলেন। 'যা-কিছু লেখো সবতাতেই মেহনৎ হয়। কিন্তু দেখছি তুমি একজন প্রচণ্ড লেখক। আর একটু যদি ধীর স্থির হতে, সব সময়েই একেবারে উত্তেজিত, অস্থির-চঞ্চল। যাক, আমি লেখাটা পড়ে দেখব 'খন।' এই ব'লে তিনি তাঁর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেখানে বসে রইলাম। একটা টাকা চাইব?—সাহস হ'ল না। কেন সব সময়ই এত উত্তেজনা, কেন এত অস্থিরতা, তার কারণ ওঁকে বলব? নিশ্চয় তিনি আমায় সাহায্য করবেন। আর এই ত প্রথম নয়।

উঠে দাঁড়ালাম। শেষ বার যখন দেখা হয় তখন ওঁর টাকা পয়সার

অনটনের কথা জানিয়ে ছিলেন এবং আমায় দেবার জন্যে একজন লোককে টাকা আদায় করতে পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। হয় ত এবারেও তাই হতে পারে। না, নিশ্চয়ই এবার সে রকম অভাব ঘটবে না। টাকাপয়সাই যদি না থাকবে ত নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বসে বসে কাজ করতে পারতেন না।

আর কিছু বলবার আছে কি-না তিনি শুধালেন।

'না,' জবাব দিলাম এবং আমার যে সত্যিই আর কিছু বলবার নেই তা বুঝাবার জন্যে স্বরটাকে সংযত ক'রে বললাম, 'তবে কবে পর্যন্ত লেখাটা সম্বন্ধে জানবার জন্যে আসব?'

'ও', যে-কোন দিন এই পথ দিয়ে আসতে যেতে এলেই চলবে। দু-তিন দিনের মধ্যেই পড়ে ফেলবে।'

টাকার কথাটা জানাবার উদ্রগ্র ইচ্ছাটা ঠোঁট দিয়ে বার হ'ল না। ভদ্রলোকের সহৃদয়তার সীমা নেই, এবং সে সহৃদয়তার সম্মান রক্ষা ক'রে চলাই আমার উচিত হবে। না হয় অভাবের তাড়নায় না খেয়েই মরে যাব।

চলে এলাম। ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমার যে তখন কি অবস্থা তা ব'লে বুঝান যাবে না। তাই ব'লে সম্পাদকের কাছে যে কিছু চাই নি, তার জন্যেও মনে কোনও দুঃখ হ'ল না। পকেট থেকে আর একখানা কাঠের কুচো বার ক'রে মুখে পুরে দিলাম। তাতে অনেকটা কাজ হ'ল। আগে কেন এ রকমটা করি নি? 'তোমার নিজের জন্ম তোমার নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত।' জোরে জোরে বললাম, 'তোমার কি সত্যিই ভদ্রলোকের কাছে আবার টাকা চেয়ে তাকে অসুবিধেয় ফেলা সঙ্গত হ'ত?' এবং নিজের উপর ভারী ক্রুদ্ধ হলাম, কেন না, যখন তখনই আমি এ রকম ধৃষ্টতা ক'রে বসি। 'এর মত জঘন্য হীন কাজ আর কিছু আছে ব'লে ত শুনিনি,' আমি

বললাম, 'তোমার টাকা দরকার, তাই তুমি যখন-তখন যার-তার কাছে গিয়ে তাকে অসুবিধেয় ফেলবে! কি অধিকার তোমার! সরে পড়, পালা তুই—এক্ষুনি! তোকে আজ আচ্ছা ক'রে শেখাব।' নিজেকে জব্দ করবার জন্য প্রাণপণে ছুটে চললাম, যখনই ক্লান্তিতে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা জাগছিল তখনই নিজেকে যা-তা বলে গালি দিয়ে চাঙা ক'রে তুলতে লাগলাম। এমনই ক'রে দৌড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে পাইল স্ট্রীটে এসে উপস্থিত হলাম। তখন শ্রান্তি ক্লান্তিতে এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েছি যে, আর এক পাও নড়তে পারলাম না। অসহ্য দুঃখে কেঁদে ফেলে মাঝ-পথে দাঁড়িয়ে পড়লাম বটে কিন্তু দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলাম না, টলতে টলতে সামনেকার র'কে বসে পড়লাম। 'না, আর পারি নে!' আপন মনে ব'লে উঠলাম। নিজেকে যথাযোগ্য পীড়ন করবার জন্তে পুনরায় উঠে দাঁড়ালাম এবং জোর ক'রেই নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। নিজেকে বিদ্রূপ করলাম এবং এমনই ক'রে নিজেকে হয়রান করতে পেরেছি জেনে আত্মপ্রসাদও লাভ করলাম। শেষে কয়েক মিনিট বাদে অনেক ভেবে চিন্তে নিজেকে বসবার অনুমতি দিলাম, তাও র'কের এমন জায়গায়, যেখানে আরামের 'আ'ও না মেলে। জিরোতে পারাটা কি আরামের! হাত দিয়ে মুখের ঘাম পুছে ফেললাম। শ্বাস-প্রশ্বাস সহজেই নিতে পারছি। কি ছোটনটাই না ছুটিয়েছিলাম নিজেকে! তবু তার জন্য এতটুকুও কিন্তু দুঃখ নেই; এ যে আমার একান্তই পাওনা ছিল। সম্পাদকের কাছে একটি টাকা চাইবার ইচ্ছে কেন আমার হয়েছিল? যেমন কাজ তেমন ফল ভোগ করতেই ত হবে। মা যেমন অশান্ত ছেলেকে উপদেশ দেয়, তেমন নিজেই নিজেকে উপদেশ দিতে লাগলাম। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ক্রমশ শান্ত হয়ে পড়লাম এবং এতটা দুর্বল হয়ে পড়লাম যে, না কেঁদে থাকতে পারলাম না।

প্রায় মিনিট পনেরো-বিশ সেখানটায় বসে রইলাম। লোকজন আসা-যাওয়া করছিল কিন্তু কেউ আমায় কিছু বলে নি। আমার চার পাশে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছে, রাস্তার ও-পাশে একটা গাছের উপর একটা ছোট পাখী ডাকছে—মনে হ'ল যেন গান করছে।

একটা পাহারাওয়ালা এগিয়ে এল। 'এখানে কেন বসে আছ?' সে শুধাল।

'কেন বসে আছি?' জবাব দিলাম, 'এমনই, আপন খুশিতে।'

আধঘণ্টা ধ'রে তোমায় লক্ষ্য করছি। এখানে আধঘণ্টা বসে আছ।'

'তা হবে,' বললাম; 'বেশিও হতে পারে। আর কিছু চাও?'

গরম হয়ে উঠে পড়ে চলতে লাগলাম। বাজারে পৌঁছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। আপন খুশিতে! ও-রকম জবাব দেওয়া কি ঠিক হয়েছে? তোমার বলা উচিত ছিল, বড় পরিশ্রম হয়েছে, তাই এখানটায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। স্বরটা আরও একটু খাটো করা উচিত ছিল। তুমি একটা গণ্ডমূর্খ; মনের ভাব গোপন করতে আজও শিখলে না। পরিশ্রান্তই যদি হবে ত হাঁসফাঁস করা ত উচিত ছিল, তার ত কোন লক্ষণই দেখতে পাই নি।

দমকলের আপিসের সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন একটা নতুন মতলব মাথায় এল। হঠাৎ হাতের আঙুলগুলি মটকিয়ে এমনভাবে অট্টহাসি হেসে উঠলাম যে, পথচলতি লোকগুলি পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল। নিজেই নিজেকে বললাম, 'এখনই তোমায় একবার পুরোহিত মশায়ের কাছে যেতে হবে। একবার সেখানে গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখতে আপত্তি কি? তাতে ত কোন লোকসান নেই। আর দিনটাও বেশ পরিষ্কার।'*

সামনেই একটা বইয়ের দোকান. সেখানে ঢুকে ডিরেক্টরি দেখে পুরোহিত মশায়ের ঠিকানাটা জেনে নিলাম।

আপনার মনেই বললাম, 'সেখানে গিয়ে কিন্তু পাগলামি করো না। খবর্দার! তোমার মত দরিদ্রের অত মান-অহঙ্কার থাকতে নেই, বুঝলে? তুমি ক্ষুধার্ত, জরুরি কাজে এসেছ, কাজ উদ্ধার ক'রে তবে অন্য কথা।

মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে ধীর স্থিরভাবে কথা বলবে। বলতে পারবে না? কেন? বেশ, তা হ'লে আমিও এক পা এগোচ্ছি নে। বুঝেছ? তোমার অবস্থা যে কত শোচনীয় তা কি বুঝছ না? জানি তুমি অভাবের তাড়নায় দিনরাত্তির অকথ্য যাতনা ভোগ করছ, পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, কোনরকম ভোগের কিছুমাত্র সঙ্গতি নেই। অবস্থা ত তোমার এই। এখানে দাঁড়িয়ে আছ, ট্যাঁকে একটি পয়সা নেই। সুখের বিষয় এখনও নিজেকে হারিয়ে ফেল নি, ঈশ্বরে বিশ্বাস এখনও তোমার অটুট রয়েছে। শয়তানকে তুমি ত কোন দিনই শ্রদ্ধা কর নি, বরং তাকে চিরকাল ঘৃণাই ক'রে এসেছ। তবে ধর্মগ্রন্থ—সে আলাদা কথা।' এই সব কথা আওড়াতে আওড়াতে পুরোহিতের বাড়ী এসে পৌঁছলাম। দরজার পাশে লেখা আছে—'বারটা থেকে চারটা পর্যন্ত দেওয়া হয়।'

'খবরদার, বাজে কথা নয়,' বললাম, 'মাথা নীচু করতে হবে ...' এবং পুরোহিতের বাড়ীর কড়া নাড়লাম।

দাসী এসে দরজা খুলে দাঁড়াল, তাকে বললাম, 'পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ঘরে নেই, বাইরে গেছেন।'

বাইরে গেছেন, বাইরে গেছেন! আমার আশাভরসা সমস্তই তা হ'লে পণ্ড হয়ে গেল! এতটা পথ হেঁটে এসে কি লাভ হ'ল? একটু দাঁড়ালাম।

দাসী জিজ্ঞাসা করল, 'খুব জরুরি কোন কাজ ছিল কি ?'

'না, জরুরি তেমন নয়', জবাব দিলাম, 'তেমন জরুরি কিছু নয়। যাক, অন্য সময় এসে দেখা করব'খন।'

আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, দাসীও দরজার মুখে দাঁড়িয়ে, আমি ইচ্ছা ক'রেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে আলপিনটা খুলে খালি বুকটা তাকে দেখালাম। আমার আসার উদ্দেশ্য বুঝতেই একটি দৃষ্টি হেনে তার দিকে তাকালাম, কিন্তু বেচারী তা বুঝতে পারল না।

দিনটা ভারী পরিষ্কার। ··· গিন্নি-মাও কি বাড়ী নেই ?

তিনি ঘরেই আছেন। তবে বাতে পঙ্গু, শুয়ে আছেন, নড়তে চড়তে পারেন না ··· বক্তব্যটা ইচ্ছে করলে লিখে রেখে যেতে পারি।

না, তার দরকার হবে না। এই হাঁটতে হাঁটতে এ-দিক পানে এসেছিলাম, হাঁটলে শরীরটা ভাল থাকে ; খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা হাঁটা শরীরের পক্ষে বড় উপকারী। ··· ফিরে চললাম, কিন্তু মাথা ঘুরছিল। শরীরটা যেন অতি দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। অসময়ে এসেছিলাম। খয়রাতের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গীর্জার সামনের একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। হা ভগবান, যেদিকে চাই সেই দিকেই অন্ধকার! কান্না আসছিল বটে কিন্তু তাকে রোধ করলাম। একান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, দেহের ভার যেন আর বইতে পারছি নে। কি করব, কি হবে কিছুই স্থির করতে না পেরে সেখানে বিষাদক্লিষ্ট, নিশ্চল ক্ষুধার্ত হয়ে বসে রইলাম। বুকটা সাংঘাতিক জ্বালা করছিল ; এ জ্বালা যেন কিছুতেই কমছিল না, কুচো কাঠ চিবিয়েও আর এতটুকু আরাম পাচ্ছিলাম না। সেই শুকনো কাঠ চিবোতে গিয়ে চোয়ালে অসম্ভব বেদনা অনুভব করছি, কাজেই সেই নিরর্থক কাজ তখনকার মত মুলতবী রাখলাম। আর কিছু ভালও লাগছিল না। পথের মধ্যে ক্ষুদ্র এক টুকরা কাঠের মত শক্ত রুটি কুড়িয়ে পেলাম, তাই চিবোতে

শুরু করলাম, কিন্তু কেমন বিশ্রী দুর্গন্ধে ও স্বাদে বমি আসছিল। শরীরটা ভারী অসুস্থ হয়ে পড়ছে—হাতের নীল শিরাগুলি যেন অসম্ভব রকম ফুলে উঠেছে। আচ্ছা, সত্যি ক'রে আমি কি চাই? একটি টাকার জন্য সুদীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা কি পরিশ্রমই না করলাম; কিন্তু সেই টাকাটা যদি পেতামও তা হ'লে এমন কি সুবিধা হ'ত? বড়জোর ঘণ্টা কয়েক বেশি বাঁচতে পারতাম বই ত নয়। সবদিক ভেবে চিন্তে দেখলে দেখা যায় যে, মরণ যদি একদিন আগে বা পরে আসে তা হ'লেই বা তাতে কি এসে যাবে! এক দিন আগে বা পরের মধ্যে ত কিছুমাত্র পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি নে। সাধারণ লোকের মতই যদি হ'তে পারতাম তা হ'লে অনেকটা আগেই বাড়ী ফিরে জিরতে পারতাম এবং দশ জনের যেমন হয়ে থাকে আমারও সেই অবস্থা হ'ত। মুহূর্তের জন্যে মনটা দিব্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এখনই তা হ'লে মরতে হবে। এখনই শেষ হয়ে যাবে, সময় হয়ে আসছে, চারিদিক নিস্তব্ধ, যেন সবকিছু ঘুমে অচেতন। বেঁচে থাকার সবকিছু উপায়ই হাতড়েছি, জানা সবগুলি উপায়ই প্রায় শেষ করেছি। এ চিন্তাকে যে মনের এক কোণে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই লালন ক'রে আসছি এবং প্রতিবারেই আশা ভঙ্গ হওয়ায় নিজেকে ভর্ৎসনা করেছি নির্বোধ কোথাকার, তুই যে মরণের কোলে এগিয়ে চলেছিস।

সময় থাকতে এখনই খানকয়েক চিঠি লিখে মরণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। জামা-কাপড়-বিছানা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে ঠিক করতে হবে। আমার একমাত্র সম্পদ—সাদা কাগজ করখানা ও কম্বলখানার উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ব। আমি ··· সবুজ কম্বলখানা! যেন গুলি খেয়ে আতকে উঠলাম। দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে বসল এবং বুকটা প্রচণ্ডভাবে ধপ্ ধপ্ ক'রে স্পন্দিত হ'তে লাগল। বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। দেহের সমস্ত অণুপরমাণুতে

জীবনীশক্তি যেন উগ্র হয়ে উঠল। বার বার আমি উচ্চারণ করলাম, "সবুজ কম্বলখানা! সবুজ কম্বলখানা!'

খুব তাড়াতাড়ি চলেছি, যেন কোন জিনিস তখুনি গিয়ে আমায় আনতে হবে। অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে আমার সেই আস্তানার সামনে থম্‌কে দাঁড়ালাম। একটু না থেমে একেবারে সটান্ গিয়ে হান্স পলির দেওয়া সবুজ কম্বলখানা বিছানা থেকে নিয়ে ভাঁজ ক'রে ফেললাম। আমার এই চমৎকার মতলবেও যদি আমায় বাঁচাতে না পারে ত আশ্চর্যের কথা বটে। এতক্ষণ ধরে নির্বোধের মত যে জল্পনা কল্পনা করছিলাম তাকে অতিক্রম ক'রে আমার মধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে, আমার মনুষ্যত্ব এখন জেগে উঠেছে। আমি সব কিছু ফেলে রেখে বেরিয়ে এলাম। আমি মহৎ নই—নির্বোধ বা সাধুও নই। আমার জ্ঞান ফিরে পেয়েছি।

তখন কম্বলখানা হাতে নিয়ে ৫নং স্টেনার স্ট্রীটে গিয়ে পৌছলাম। দরজার কড়া নেড়ে প্রকাণ্ড এক কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলাম। এ বাড়ীতে আর কোন দিন আসিনি। দরজার উপর একটা ঘণ্টা ছিল, দরজা খুলতেই বার কয়েক ক্রিং ক্রিং ক'রে আওয়াজ হ'ল। পাশের ঘর থেকে কে একজন বার হয়ে এল, সে তখন কি যেন একটা খাবার চিবোচ্ছিল, এসে কাউণ্টারের সামনে দাঁড়াল।

'এই চশমাখানা রেখে আমায় আনাছয়েক দিতে পার?' তাকে বললাম। 'দু-চার দিন বাদেই ছাড়িয়ে নেব, নিশ্চয় নেব; দেবে?'

'উহুঃ, চশমার ফ্রেম ত দেখছি লোহার, কেমন, নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'না, দিতে পারি নে।'

'বেশ না দিলে, আমি ঠাট্টা করছিলাম। কিন্তু আমার একখানা

কম্বল আছে, বলতে গেলে কোন কাজেই আসছে না। সেখানা অবশ্যই নিতে পার।'

'বলব কি মশায়, এত সব জমা হয়ে রয়েছে', সে বলল; এবং আমি যখন মোড়কটা খুলে কম্বলখানা বার করলাম, লোকটা একবার তাকিয়ে দেখেই বলে উঠব, 'না মশায়, মাফ করবেন। ও নিয়ে আমার কোন কাজে আসবে না।'

'এ দিকটে তত ভাল নয়, এর আর দিকটা ঢের ভাল,' বললাম।

'না, না মশায়, এ মোটেই কাজের নয়। এ জিনিস কিনতে পারি নে। এর বদলে এক আনাও কোথা পাবেন না, জেনে রাখুন।

বললাম, 'এটা বিক্রি করে যে কিছুই মিলবে না, তা ত দেখতেই পাচ্ছি, তবে আমার মনে হয়েছিল যে এটা আর একখানা পুরোনো কম্বলের সঙ্গে নিলামে বিক্রি করা হয় ত যেতে পারবে।'

'না, চলবে না মোটেই।'

বললাম, আনা তিনেক দিতে পার ত?'

'না, ও আমি রাখবই না মশায়। কোন দরকায় নেই।'

কম্বলখানা আবার কাঁধে তুলে নিয়ে বার হয়ে বাড়ীতে চ'লে এলাম।

কিছুই যেন হয় নি এমন ভাব দেখাতে লাগলাম। বিছানার উপর কম্বলখানা পরিপাটি ক'রে বিছিয়ে রাখলাম। যখন যে কাজ করি, পরিপাটি ক'রে করাই আমার স্বভাব। খানিক আগের ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলে দিলাম। যখন এমন একটা অপদার্থের মত কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন নিশ্চয়ই আমার মাথার ঠিক ছিল না। এ সম্বন্ধে যতই ভাবি ততই এর অযৌক্তিকতা আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এ ক্ষণিক দৌর্বল্যের কাজ, এক দুর্বল মুহূর্তে এই দৌর্বল্য

আমায় পেয়ে বসেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আমি তার সেই ফাঁদে পড়ি নি। একবার বেশ মনে হয়েছিল যে ঠিক পথে যাচ্ছি নে। সেই যে প্রথমে যখন চশমা বিক্রি করতে চেয়েছিলাম তখন। যে অসম্মান, যে নীচতা আমায় আমরণ কলঙ্কিত ক'রে রাখত সে কাজে যে আজ ব্যর্থকাম হয়েছি এতে সত্যিই আমি পরম তৃপ্তি লাভ করলাম।

আবার শহরের রাজপথে বার হয়ে পড়লাম। গীর্জার ময়দানে লোকের বসবার জন্যে যে বেঞ্চি ছিল তারই একখানায় বসে পড়ে ঝিমুতে শুরু ক'রে দিলাম। এক একবার মাথাটা নীচু হ'তে হ'তে বুকের সঙ্গে ঠেকছিল, প্রবল উত্তেজনার পর একটা দারুণ ঔদাসীন্যে আমি একান্ত পীড়িত, ক্ষুধায় কাবু। এমনি ক'রে সময় কাটছিল। ঘরের থেকে বাইরে ঢের বেশি আলো রয়েছে, বেশ বসে বসেই ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেওয়া যাক। খোলা আবহাওয়ায় এসে বুকের ব্যথাটাও আর তত টন্ টন্ করছে না। সকাল সকালই বাড়ী যাওয়া উচিত; কিন্তু তখন আমার চোখে ঢুল এসেছিল, কত কি চিন্তাও অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করছিল।

এক টুকরা পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিলাল; কোটের আস্তিনে বেশ ক'রে মুছে নিয়ে মুখে পূরে দিলাম। খানিকক্ষণ ওটা নিয়েই বেশ আরাম পাওয়া যাবে হয় ত। জায়গা থেকে একবারও নড়ি-চড়ি নি। লোকজন আসছে যাচ্ছে, রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ, লোকজনের হাঁক-ডাকের সেই গুম্ গুম্ শব্দ কানে আসছিল। বোতামগুলি নিয়ে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যাক না। অবশ্য চেষ্টা ক'রে কোন ফল হবে না নিশ্চয়, তা ছাড়া, এখন সময়টাও ভাল নয়। ভেবে চিন্তে দেখলাম ঘরে ফিরবার মুখে বন্ধকী দোকান হয়ে গেলেই চলবে। অনেকক্ষণ পরে কষ্টেসৃষ্টে উঠে পড়ে চলতে আরম্ভ করে দিলাম, পা যেন আর দেহভার বইতে পারছিল না। মাথাটা যেন পুড়ে যাচ্ছে—জ্বর আসছে

এবং নিরুপায় হয়ে জোর পায়ে এগিয়ে চললাম। আবার দোকান সামনে পড়ল। 'আচ্ছা, এখানে খানিকক্ষণ দাঁড়া...
কিন্তু দোকানে ঢুকে যদি এক টুকরা রুটি চেয়ে বসি? যাক, এ এ...
উটকো চিন্তা—একটা চমক; এ কথা ত আমি কখনও গম্ভীরভাবে ভেবে দেখি নি। 'ছোঃ।' আপনার মনে বলে উঠলাম এবং মাথা নেড়ে এগিয়ে চল্লাম। পথে একটা বাড়ীর সদর দরজার সামনে এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুস্ফাস করছিল। আর একটু দূরে একটি মেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে ছিল। আমার চলা এত মন্থর, কত কি ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম যে, আমি যে বিশেষ কিছু মন দিয়ে দেখছি তা আমায় দেখে কারুরই মনে হবে না। একটা কুলটা রাস্তায় এসে উপস্থিত হ'ল। 'কি মশায়, কেমন চলছে সব? য়্যাঁঃ কি, অসুখ করেছে কিছু? ও বাবা, কি চেহারা।' ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নিজেকে সংযত করলাম। আমার মুখে কি মরণের আভাস ফুটে উঠেছে? তবে কি সত্যি সত্যিই মরতে চলেছি! গালে হাত দিয়ে একবার অনুভব ক'রে দেখলাম; শুক্‌নো ঢলঢলে—স্বভাবতই ত আমি কৃশ, গাল দুটো যেন চায়ের বাটি; কিন্তু আবার এক জায়গায় এসে একেবারে থেমে দাঁড়ালাম। এত রোগা হয়ে গেছি যে, কল্পনা করাও অসম্ভব। চোখ দুটো একেবারে গর্তে ঢুকেছে। আচ্ছা, সত্যি আমায় কেমন দেখাচ্ছে? একমাত্র ক্ষুধার তাড়নায় যদি কারুর জীবন্ত অবস্থায় চেহারা বিকৃত হয় তবে তার চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে। আর একবার—এই শেষ বার, আমার ক্রোধের উদ্রেক হ'ল! "ভগবান, আমায় রক্ষা কর। কি চেহারা হয়ে গেছে, ওঃ।' কিন্তু এখানে, এই ক্রিশ্চিয়ানা শহরে নিছক না খেতে পেয়ে আজ আমার চেহারার কি বিকৃতি হয়েছে, অথচ এরকম একটি মাথা, বাহুযুগেও, দুনিয়ায় বড় একটা বেশি মিলবে না। কি কাজ না আমি করতে পারি,

অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আজ আমি না-খেতে পেয়ে তিল তিল ক'রে মরণের পথে এগিয়ে চলেছি! এর কি কোন সুসঙ্গত কারণ আছে? আমি যেন একটা ভাড়াটে গাড়ীর বেতো ঘোড়া, দিনরাত্তির কি হাড়ভাঙা খাটুনিই না খাটছি—অথচ সব নিরর্থক, কোন কাজেই আসছে না।

পড়াশুনা ক'রে ক'রে চোখ গর্তে ঢুকেছে, মস্তিষ্ককে উপবাসী রেখে মাথা খাটিয়েছি, কিন্তু এত ক'রে কি লাভ হ'ল আমার? রাস্তার একটা কুলটাও আমার-দৃষ্টি সইতে পারে না, ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। না, এর শেষ এইখানেই হয়ে যাক্। বুঝতে পারছ ত? হয় শেষ, না হয় মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠ।

নিজের অক্ষমতায় নিজের ভিতরে ভিতরে ক্ষেপে উঠছিলাম, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সজল চোখে রাগের মাথায় নিজেকে গালাগালি দিলাম। পাশ দিয়ে যারা লোকজন আসা-যাওয়া করছে তাদের দিকে একবার তাকালামও না। মনে হ'ল, নিজেকে নির্দয় লাঞ্ছনা করতে পারলে যেন স্বস্তি পাই। তাই ল্যাম্প পোস্টে মাথা খুঁড়ে, হাতের তালুতে নখ বসিয়ে দিয়ে, জিভ কামড়িয়ে আত্মনির্যাতনের ব্যর্থ চেষ্টা করলাম! আবার থেকে থেকে উন্মাদের মত হেসে উঠলাম, কিন্তু আঘাতটাও ত আমায় রেয়াত করছিল না। যতই আঘাত পাই, ততই আত্মনির্যাতনের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কারের পরম উৎসাহে মেতে উঠি।

অবশেষে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁ, বুঝলাম, লাগে, কিন্তু আমি কি করব?' ফুটপাথের উপর বার বার পা ঠুকে আওড়ালাম 'আমি কি করব?'

আমার এ পাগলামি দেখে এক ভদ্রলোক হেসে চলে গেলেন; 'তোমার মত লোককে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখাই দরকার। নিজে

গিয়েই পাগলা-গারদে ভর্তি হয়ে যাও না।' লোকটার দিকে একবার তাকালাম—একে যে চিনি, ও ডিক,—ডাক্তার। হায় রে, ও-ও আজ আমার সত্যিকারের অবস্থাটা বুঝতে পারছে না! একে যে অনেকদিন জানি। কত দিনের আলাপ। ঠাণ্ডা হলাম। শিকল দিয়ে বাঁধবে? নিশ্চয়, তাই করাই উচিত—আমি যে সত্যিই পাগল হয়ে গেছি। ডাক্তার, ঠিকই বলেছ! প্রতি রক্ত-বিন্দুতে যেন উন্মত্ততা অনুভব করলাম। সে যে কি তীব্র বেদনা, মাথাটা যেন ছুঁচ দিয়ে কে বিঁধছে; তবে কি আমার এই পরিণাম; নিশ্চয়, নিশ্চয়। আবার সেই পীড়াদায়ক কষ্টকর পথচলা শুরু ক'রে দিলাম। আজও কি সেই আশ্রয় স্থানেই রাত কাটাতে হবে!

সহসা আমার গতিরুদ্ধ হ'ল। ··· কিন্তু না না, শিকল নয়! আমি বলছি, বাঁধবার অবস্থা এখনও আসে নি। ভয়ে আমার স্বর প্রায় ভেঙে আসছিল। নিজের কৃপা ভিক্ষা করলাম, বাতাস ও প্রকৃতির কাছে আবেদন জানালাম—আমায় যেন শিকল দেওয়া না হয়। কালকের মত ফাঁড়িতে গিয়ে সেই অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার কুঠরীতেই আটক থাকা সঙ্গত। না, না, তা চাই নে!

আচ্ছা, অন্য আরও ত কত উপায় থাকতে পারে। আমি-ত এখনও সব উপায় পরখ করে দেখি নি। দেখি না চেষ্টা ক'রে। এবারে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে, সহজে নিরাশ হ'লে চলবে না; ধৈর্য চাই। অক্লান্তভাবে দোরে দোরে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে! এই ধর না, বাদ্যযন্ত্র ও স্বরলিপি বিক্রেতা সিজ্‌লার-এর ওখানে একবারও যাওয়া হয় নি। কে বলতে পারে, সেখানেই অদৃষ্ট লেগে যেতে পারে।··· টলতে টলতে আপনার মনে বকে যাচ্ছিলাম। আবেগে কেঁদে উঠলাম। সিজ্‌লার! আচ্ছা, এ কি ভগবানের ইঙ্গিত? খামকা খামকা ত আর এ নামটা আমার মনে আসবার কথা নয়। সিজ্‌লার অনেক দূরে

থাকে। তা হোক, ধীরে সুস্থে গিয়েও তার সঙ্গে দেখা হবে। তার দোকানে যাওয়ার রাস্তা ত আমার বেশ চেনা, অনেকবার সেখানে গিয়েছি। অবস্থা যখন ভাল ছিল, কত গানই না কিনেছি। তার কাছে আনা কয়েক পয়সা চাইব? হয় ত পয়সা চেয়ে তাকে মুশকিলে ফেলা হবে। একটা টাকা চাওয়াই ঠিক হবে।

দোকানে ঢুকেই মালিকের সঙ্গে দেখা করব জানালাম। কর্মচারীরা মালিকের ঘর দেখিয়ে দিল। তিনি সেখানে হাল-ফ্যাশানের দামি পোশাক প'রে কি একটা হিসেবের খাতা দেখছিলেন। খানিকটা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। খিদার তাড়নায় নিরুপায় হ'য়েই তার কাছে একটা টাকা চাইতে হ'ল ··· টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বেশি দেরিও হবে না ··· খবরের কাগজে-দেওয়া লেখাটার টাকা পেলেই পরিশোধ করতে পারব। ··· টাকাটা পেলে যে কি উপকারই না হবে।···আমার বক্তব্য ব'লে গেলাম, কোন দিকেই কিন্তু তাঁর লক্ষ্য নেই, আপনার মনে হিসেবের খাতায় একান্ত মনোযোগের সঙ্গে মন দিলেন। আমার বলা শেষ হতেই চোখ মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

সরল সহজ একটিমাত্র কথা।—না; কোন কৈফিয়ৎ নেই, আর একটি শব্দ খয়রাত করবারও ফুর্সৎ নেই।

হাঁটু দুটো সাংঘাতিক ভাবে কাঁপছিল, অতিকষ্টে দেওয়ালে ভর দিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। আর একবার চেষ্টা করতেই হবে। অত দূর থেকে এর নামটাই বা কেন মনে হ'ল? বাঁ দিকটা বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল এবং ঘাম দেখা দিল। অনেক কষ্টে বললাম, 'বড় কষ্টে আছি, সময়টা অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছে, যদি দয়া করেন, টাকাটা পরিশোধ করতে বেশি বিলম্ব অবশ্য হবে না।' দয়া কি হবে ওঁর?

'ওহে বাছা, আমার কাছে কেন এসেছ?' তিনি বললেন;

'তোমায় ত আমি চিনি নে। আমার কাছে ত তুমি রাস্তার অচেনা লোক ছাড়া আর কিছুই নও ; যে কাগজের আপিসে তোমার চেনা-শুনা আছে, তাঁদের কাছেই যাওয়াই সঙ্গত হবে।'

'সে আপিস বন্ধ হয়ে গেছে,' আমি বললাম, 'আজকের জন্যে আমায় দয়া করুন। ভারী খিদে পেয়েছে আমার।'

তিনি অবিচলভাবে মাথা নাড়লেন ; যতক্ষণ না আমি চলে এলাম ততক্ষণ তিনি তেমনই ভাবেই মাথা নাড়লেন। 'নমস্কার। আসি তা হ'লে,' আমি বললাম।

চলে আসতে আসতে মনে হ'ল, তা হ'লে এঁর নাম মনে পড়ায় ভগবানের কোন রকম ইঙ্গিত নেই। নির্দয়ভাবে হেসে ওঠলাম। টলতে টলতে নীচে নেমে এলাম, মাঝে মাছে সিঁড়িতে বসে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। পাগল ব'লে আমায় শিকল দিয়ে আট্‌কে না রাখে, এই হ'ল আমার তখনকার একমাত্র ভাবনা। সেই আঁধার কুঠরীতে বন্দী হওয়ার ভাবনা সর্বক্ষণ আমায় সন্ত্রস্ত ক'রে তুলছিল ; সেই দুর্ভাবনায় মনে এতটুকু স্বস্তি নেই। পথ চলতে গিয়ে দূরে একটা পাহারাওয়ালা নজরে পড়লেই তাড়াতাড়ি তাকে এড়াবার জন্যে পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ি। আরও কতটা পথ আমায় অদৃষ্ট পরীক্ষা করবার জন্যে আবার চলতে হবে। একসময় না-একসময় এর একটা সুরাহা হবেই।...

একখানা ছোট্ট পশমী সুতার দোকান—ইতিপূর্বে এ দোকানে আর কখনও আসি নি, কাউণ্টারের ওপাশে ছোট্ট একটি চেয়ারে একটি মাত্র লোক বসে আছে, তার সামনে একখানা ছোট্ট টেবিল। লোকটি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে কাচের আলমারিতে পণ্যদ্রব্য সাজিয়ে রাখছিল। শেষ খরিদ্দারটি চলে না-যাওয়া পর্যন্ত দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। শেষ খরিদ্দারটি এক তরুণী। তার গালে সুন্দর টোল খেলে গেল। ওকে দেখে মনে হ'ল, ও কতই না সুখী! আমার বোতামহীন কোটটাকে

একটা আলপিন দিয়ে এঁটে রেখেছিলাম, তাতে নিশ্চয়ই আমায় নেহাৎ খারাপ দেখাচ্ছিল না। পিছন ফিরে এগিয়ে আসতেই বুকটা ফুলে উঠল।

'আপনি কিছু চান ?' দোকানী শুধালে।

'মালিক আছেন ?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'তিনি শহরের বাইরে বেড়াতে গেছেন,' সে জবাব দিল। 'বিশেষ কোন জরুরী দরকার ছিল কি তাঁর সঙ্গে ?'

মুখে হাসি আনবার চেষ্টা ক'রে জবাব দিলাম, 'এমন বিশেষ কিছু নয়, এই খাবারের জন্যে আনা কয়েক পয়সা চাইছিলাম, খুব খিদে পেয়েছে কি-না, তাই ; সঙ্গে একটা পয়সাও নেই।'

'তা হ'লে ত দেখছি তুমি আমারই মত বড়লোক !' এই ব'লে সে আপনার মনে পশমের একটা বাণ্ডিল বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'দোহাই তোমার ভাই, আমায় নিরাশ করো না, দোহাই তোমার।' পিঠ পিঠ অনুনয় ক'রে ওঠলাম। একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া অনুভব করলাম। 'খিদের জ্বালায় প্রায় মরতে চলেছি। ক'দিন হ'ল কিছুই খেতে পাই নি।'

পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটিও কথা না-কইয়ে লোকটা একে একে পশমের বাণ্ডিলগুলি নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। তার কথাই ত আমার বিশ্বাস করা উচিত ! কেমন, নয় কি ?

'মাত্র দুটা পয়সা', বললাম, 'এবং দু-একদিনের মধ্যে তোমায় এক আনা ঘুরিয়ে দেব—নিশ্চয় দেব।'

'বেশ লোক ত তুমি ! আমি কি শেষটায় তোমার জন্যে তহবিল তছরূপ করব নাকি ?' অধীরভাবে সে বললে।

'হাঁ, তহবিল থেকেই দুটো পয়সা নিয়ে দাও, আমায় বাঁচাও ভাই, দোহাই তোমার !'

সে বললে, 'না না, আমি তা কিছুতেই পারব না।' সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললে, 'এ রকমটা ঢের দেখেছি, আর বলতে হবে না, সরে পড়।'

নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হ'ল। ক্ষুধার জ্বালায় তখন আমি উন্মাদ, অথচ লজ্জায় ভিতরটা আমার টগ্ বগ্ ক'রে ফুটছিল। এক মুঠা খাবারের জন্যে কুকুরেরও অধম হয়ে পড়েছি, অথচ তাও বরাতে জুটছে না। এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে! সত্যি, আর পারা যায় না, সইবারও ত একটা সীমা আছে। এই দীর্ঘ কাল কত কষ্ট সইয়েও না নিজেকে ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন একেবারে দাক্ষিণ্যের শেষ সীমায় তলিয়ে গিয়েছি। এই একদিনেই অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে এসেছি। আমার আত্মা চরম নির্লজ্জতার পাঁকে পঙ্কিল হয়ে গেল। সামান্য একটা দোকানীর কাছে গিয়ে ত্বটো পয়সা ভিখ্ মাগতেও আজ আর আমার লজ্জাশরম নেই, অথচ তাতেও ত পেট ভরল না।

কিন্তু তখন যে মুখে দেব এমন একটা দানাও আমার ছিল না। আজ আমি নিজের যে হাল ক'রে ছেড়েছি তাতে নিজেরই উপর নিজের একটা বিরক্তি এসে যায়। এর যে শেষ করতেই হবে। এদিকে তারা সদর দরজা হয় ত এখনই বন্ধ ক'রে ফেলবে, তা হ'লে ত আর ঘরেও ঢুকতেও পারব না। তাড়াতাড়ি গিয়ে না পৌছলে আজও হয় ত আবার ফাঁড়িতে ঘর-হারাদের সঙ্গেই রাত কাটাতে হবে।

এ-কথা মনে হতেই গায়ে অসম্ভব শক্তি পেলাম। সেই অন্ধকার কুঠরীতে আমি আর কিছুতেই রাত কাটাতে পারব না। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ত্বই হাতে বাঁ দিকের পাঁজর চেপে ধ'রে ফুটপাথের দিকে দৃষ্টি রেখে কায়ক্লেশে চললাম। পাছে কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হ'লেই ত তাকে সাদর সম্ভাষণ করতে দেরি হয়ে

যাবে, এই ভয়ে কোন দিকে না চেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম। ও হরি, মাত্র সাতটা বেজেছে। সদর দরজা বন্ধ হতে এখনও ঘণ্টা তিনেক ত দেরি আছেই। কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম!

এদিকে চেষ্টার ত এতটুকু ত্রুটি কোন দিক দিয়েই হয় নি। শক্তিতে যতটা কুলোয় সবই ত ক'রে দেখলাম। সারাদিন চেষ্টা ক'রেও ত কিছুই করতে পারলাম না। অথচ এ কথা যে কেউ বিশ্বাসও করতে চাইবে না। যদি এ কাহিনী লিখি ত পাঠকেরা বলবে, এ সব আমার বানানো কাহিনী। কোথাও কিছু সংস্থান হ'ল না। কি করব, কোন হাত নেই। সকলের কাছে গিয়ে আবার হাস্যাস্পদ হবার দরকার নেই। কি বিশ্রী ব্যাপার। নিজেই নিজেকে বললাম, তোমার জন্যে আমার লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা নেই। যদি সকল আশাই নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে ত আপনা থেকেই সকল গোলযোগের অবসান হবে, তাই ব'লে তোমার জন্যে এখন আস্তাবল থেকে কয়মুঠা ভিজা ছোলা অবশ্য চুরি করতে পারি নে। হঠাৎ মনের মধ্যে একটা আশার ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমক মেরে গেল—অথচ জানি, আস্তাবল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পরম নির্ভাবনায় শামুকের মত হামাগুড়ি দিয়ে আস্তানার দিকে এগিয়ে চললাম। সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম তৃষ্ণা অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে জলের খোঁজ করলাম। বাজার তখন অনেক দূরে। কারুর বাড়ীতে গিয়েও যে একটু জল চাইব তার প্রবৃত্তিও হ'ল না। অগত্যা ঘরে না পৌছা পর্যন্ত জল পানটা স্থগিত রাখতেই হবে। ঘরে পৌছুতে আর বড়জোর মিনিট পনেরো লাগবে। একঢোক জলও যে পান ক'রে হজম করতে পারব সে সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নেই; এখন অবশ্য পেটের কোন গোলমালই আর নেই—একমাত্র সেই যে নিজের মুখের লালা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম, তার দরুণ গা-টা যেন

একটু বমি বমি করছিল। কিন্তু বোতামগুলি! এখনও যে সেগুলি বাঁধা দিবার বা বিক্রী করবার কোন চেষ্টাই করি নি। সেখানে সেই পথের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে শুরু ক'রে দিলাম। হয় ত এ দিক দিয়েই একটু সুরাহা হতে পারে শেষটায়। এখনও তা হ'লে একটু আশা আছে। এগুলির বিনিময়ে অন্তত এক আনার পয়সা পেতে পারি; কাল সকালে এক জায়গায় না এক জায়গায় কিছু জোটাতে পারবই, তারপর বৃহস্পতিবারে খবরের কাগজের লেখাটার দরুন হয় ত পারিশ্রমিকটা পেয়ে যাব। এখন শুদ্ধ এ কাজটি, অর্থাৎ—বোতামের বিনিময়ে অন্তত আনা খানেক যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে। এ কাজটি ভুলে গেলে ত কিছুতেই চলবে না। পকেট থেকে বোতামগুলি তুলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেগুলি দেখতে দেখতে চললাম। খুশিতে আমার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এল। রাস্তাটা আমার দৃষ্টিতে এল না, আমি অভ্যাসমত হেঁটে চললাম। আমার সে পরমহিতৈষী রক্তশোষক পোদ্দার মহাশয়ের দোকান ত আমার ঠিক জানাই আছে, কত দিন কত সন্ধ্যায়ই না তার স্নেহে অভিষিক্ত হয়েছি। একটির পর একটি ক'রে আমার সব কিছুই তার গহ্বরে স্থান পেয়েছে—আমার সামান্য দ্রব্যগুলি, এমন কি শেষ বইখানাও। নিলামের দিনে সেখানে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। কেন না, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বইগুলো যোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়েছে দেখলে আমার খুশির আর সীমা থাকে না। দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ম্যাগল্‌সেন সেদিন আমার ঘড়িটি কিনেছেন; সত্যি এতে আমি গর্বই অনুভব করেছি। আমারই চেনা একজন আমার প্রথম জীবনের লেখা কবিতার খাতাখানা নিয়েছেন। ওভার-কোটটি নিয়েছেন এক ফটোগ্রাফার, তাঁর স্টুডিয়তে ব্যবহার করবেন ব'লে। কোন জিনিসই অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে নি, কাজেই দুঃখ করবার কোনই কারণ দেখছি নে। বোতামগুলি হাতেই ছিল, খুড়ো তখন

বসে বসে কি লিখছে। বললাম, 'আমার তাড়াহুড়ো নেই কিছু, হাতের কাজ শেষ করে নাও।' পাছে লোকটা বিরক্ত হয়, তাই একটু আমড়াগাছি ক'রে নিলাম। আমার নিজের স্বরই এমন অস্বাভাবিক ফাঁকা শোনাল যে, নিজেই তা চিনতে পারছিলাম না। বুকটায় যেন কামারের হাতুড়ি এসে পড়ল।

অভ্যাস মত সে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল এবং সটান হাত দুটো কাউণ্টারের উপর ছড়িয়ে দিয়ে কিছু না শুধিয়ে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার কাছে রাখবার মত যৎসামান্য কিছু একটা এনেছি বটে—গোটা কয়েক বোতাম। আমার হাতের দিকে তার নজর পড়ল। বোতামের বিনিময়ে দুটো পয়সাও কি দিবে না?—খুশি হয়ে তার বিবেচনায় যা দেয় তাতেই আমি রাজী। বিস্মিত হয়ে খুড়ো কটমট ক'রে চেয়ে বললে, 'বোতাম রেখে পয়সা চাও? এই কয়টা বোতাম মাত্র? কি ভেবেছ তুমি?'

একটা চুরুট বা আর কিছু দিয়েও যদি হয় ত আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই জানালাম। এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, মনে হ'ল একবার হয়ে যাই, তাই ···

বৃদ্ধ পোদ্দার উচ্চ হাস্য ক'রে উঠল এবং একটি কথাও না বলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশি কিছু ত প্রত্যাশা করি নি, কেবল যা-হোক কিছু পেলে এখনকার মত উপকার হ'ত মাত্র। তার এই হাসিটুকু আমার বুকে ছুরির মত এসে বিঁধল। মনে হ'ল চশমা রাখতে চাইলেও কোন ফল হবে না। বোতামগুলির সঙ্গে চশমা জোড়াও রাখতে আমার কোন আপত্তি নেই, যদি ও আমায় কিছু দেয়। এই মনে ক'রে চশমাটিও হাতে তুলে নিলাম। ও কি এর বিনিময়ে এক আনা, নিদেন, দুটো পয়সাও দেবে না?

খুড়ো বললে, 'চশমার বিনিময়ে যে কিছু দিতে পারি নে এ কথা ত তোমার বেশ জানা আছে, আগেও ত একবার সে কথা বলেছি। তবে কেন আবার ...'

মূঢ়ের মত বললাম, 'আমার একখানা স্ট্যাম্প চাই; চিঠি লিখে রেখেছি স্টাম্পের অভাবে ডাকে দিতে পারছি নে। এক আনার টিকেট, নিদেন, আধ আনার হ'লেও চলে।'

সে জবাব দিল, 'ভগবান তোমার মুখ তুলে চান। আমার দ্বারা হবে না। স'রে পড়।' এই ব'লে সে হাত নেড়ে আমায় চ'লে যেতে ইঙ্গিত করল।

আপনার মনে ব'লে উঠলাম, সত্যিই ত, এ ছাড়া আর কি হবে। চশমাটা আবার চোখে দিলাম, বোতামগুলি হাতে তুলে নিলাম এবং চ'লে আসবার মুখে তাকে অভিবাদন ক'রে যথারীতি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তাই ত, আর ত কোন উপায় নেই! আপনার মনে আওড়ালাম, 'এগুলি সে কোন দাম দিয়েই নেবে না নিশ্চয়। বোতামগুলি একেবারে আনকোরা নতুন; তবু কেন নিলে না, বুঝতে পারলাম না।'

আমি যখন বন্ধকী-দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবছিলাম তখন একটা লোক এসে দোকানে ঢুকল! ত্রস্ততার জন্তে তার সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগে গেল। উভয়েই তার জন্তে উভয়ের কাছে মাপ চাইলাম এবং ফিরে তার দিকে তাকালাম।

সে তখন ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, হঠাৎ আমায় বললে, 'আরে, তুমি!'

আমার সামনে আসতেই তাকে চিনতে পারলাম। 'কি বিপদ! তুমি! এমন দেখাচ্ছে কেন তোমায়? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?'

'ও, একটু কাজ ছিল। তুমিও ত দেখছি এসেছ।'

'হাঁ। কি রাখতে চাইছিলে?'

হাঁটু দুটো কেঁপে উঠল; দেয়ালে ভর দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে হাতের বোতাম ক'টা তাকে দেখালাম।

সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ছিঃ! এত দূর! তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে! নাঃ; একটা ত সীমা থাকা উচিত।'

'নমস্কার!' ব'লেই চ'লে আসছিলাম। চোখ দুটো ফেটে পড়তে চাইছিল।

সে বললে, 'যেয়ো না, একটু দাঁড়াও।'

আমায় দাঁড়াতে বললে কেন? সেও ত খুড়োরই দ্বারস্থ হয়েছে দেখছি। হয় ত বিয়ের আশীর্বাদী আংটিটাই বাঁধা দিতে এনেছে। ও-ও হয় ত আমারই মত বুভুক্ষু—কয় দিন হয় ত খায় নি। আমারই মত হয় ত ওরও বাড়ীওয়ালির ঘর ভাড়া বাকি রয়েছে।

বললাম, 'আচ্ছা, দাঁড়াচ্ছি। একটু শীগগির এস ভাই!'

সে আমার হাতখানা ধ'রে বললে, হাঁ, বেশি দেরি হবে না। আর তাও বলি, তোমায় বিশ্বাস হয় না। তুমি একটা মস্তবড় গাধা। না, আমার সঙ্গেই ভিতরে এস, নইলে হয় ত পালিয়ে যাবে।'

সে যা বলতে চাইছিল তা বুঝলাম এবং হঠাৎ মনে মনে একটু গর্বও অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, 'না, তা পারি নে, তোমার সঙ্গে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। তবে কথা দিচ্ছি, সাড়ে সাতটায় সময় বার্ন্‌ট্‌ অকার্স স্ট্রীটে আমি নিশ্চয় যাব এবং …'

'সাড়ে সাতটায় যাবে! তাই হবে; কিন্তু কিন্তু—এখন যে আটটা বেজে গেছে। এই দেখ আমার ঘড়ি, এটাই বাঁধা দিতে এসেছি। তুমিও ত আমারই মত ক্ষুধার্ত্ত, পাপী, দাঁড়াও, ভাগ পাবে। তোমায় এর থেকে পাঁচটা টাকা দিচ্ছি।'

এই ব'লে সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

৩

একটি সপ্তাহ মানে মানে কেটে গেল, অভাব বড় একটা সইতে হয় নি। এবারও দুঃখ-দুর্দশার হাত অতিক্রম করলাম। রোজই খেতে পেয়েছি। ফলে মনে সাহস ও উৎসাহ ক্রমশ বেড়ে গেছে; পরিশ্রম করতে আর কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না।

একসঙ্গে তিন-চারিটি প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। এই প্রবন্ধ কয়টি রচনায় আমার সমস্ত শক্তি সমস্ত মনীষা প্রয়োগ করতে কিছুমাত্র কসুর হ'ল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আগের চাইতে লেখায় যেন ঢের বেশি আরাম পাচ্ছিলাম। শেষ লেখাটা লিখতে কলম যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত উধাও হয়ে ছুটে চলেছিল। এ লেখাটার উপর অনেকখানি আশাভরসা ছিল, কিন্তু লেখাটা সম্পাদকের কাছ থেকে অমনোনীত হয়ে ফেরত এল। ফলে আত্মাভিমান খানিকটা আহত হল। আমি এতটা ক্রুদ্ধ হলাম যে, লেখাটা আর একবার না প'ড়েই তৎক্ষণাৎ নষ্ট ক'রে ফেললাম। ভবিষ্যতে এ বিষয় নিয়ে আরও ফলাও ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখব ব'লে ঠিক করলাম।

যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সে লেখাটিও না চলে এবং অবস্থা যদি আরও শোচনীয় হয়ে আসে তা হ'লেও কোন ভয় নেই। জাহাজে চড়ে কাজ করতে পারব। 'নানা' জেটিতে প্রস্তুত হয়ে আছে, শীগগিরই সমুদ্রপথে যাত্রা করবে। এতে কোন একটা কাজ নিয়ে কোথাও না-কোথাও যেতে পারবই এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার কাজও চালাতে পারব। কাজ করবার মত অনেক পথই খোলা আছে। শেষ বারের বিপর্যয় আমায় একেবারে চ্যাপটা ক'রে দিয়ে গেছে। মাথায় টাক পড়েছে, বলতে গেলে

মাথাটা প্রায় কেশহীন ; মাথা ধরায়, বিশেষত সকালটায়, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, এবং কর্মশক্তি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। সারাটা দিন বসে বসে কেবলই লিখছি। ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে হাত দুটো জড়িয়ে নিয়েছি, কেন না, নিজের নিঃশ্বাসের স্পর্শেও অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। যন্ত্রণা এড়াবার জন্যই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আস্তাবলের সেই ছোকরা যখন দুম্ ক'রে আস্তাবলের দরজা বন্ধ করে তখন এবং যখন কুকুরটা উঠানে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে তখন তাদের সে শব্দ আমার মজ্জায় মজ্জায় একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়, যেন সর্বাঙ্গে ছোরা বিঁধতে থাকে। সকল রকম দুঃখ কষ্টের স্বাদই ত জীবনে বেশ ভাল ক'রেই পেলাম।

দিনের পর দিন কলম চালাতে লাগলাম। খেতে যে সামান্য সময়টুকু লাগে সেটুকুও যেন আমার সহ্য হয় না, মনে হয় বাজে খরচ করছি। খেয়েদেয়ে কিছুমাত্র বিশ্রাম না ক'রেই আবার লিখতে বসি। এ সময় সারাটা বিছানা ও নড়-বড়ে টেবিলটা কেবলই লেখা কাগজে ভর্তি থাকে। এই সব লেখা দিনরাত পড়ে পড়ে আবশ্যক অদল-বদল ক'রে সময় কাটাই। যে ধারণা বা ভাব থেকে লেখাটা তৈরি করি, খানিক পরেই হয় ত আবার মত বদলে যায়, তখুনি আবার শোধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। লেখাটা প'ড়ে হয় ত দেখতে পাই, কোন জায়গায় বা ভাষার দৈন্য, কোথাও-বা একটা শব্দ তুলে দিয়ে আর একটা শব্দ বসালেই লেখাটার সৌষ্ঠব বেড়ে যায়, তখুনি তা করতে বসি। এ রকমটা করতে যে কি মেহনতই না হচ্ছিল তা ব'লে শেষ করা যায় না। একদিন বিকেলে সারাদিনের মেহনতে যে লেখাটা তৈরি হ'ল সেটা পড়ে খুশি হয়ে পকেটে নিয়ে তখুনি সম্পাদকের কাছে রওনা হলাম। হাতে তখন দুই-এক আনার বেশি পয়সা নেই, কাজেই অগৌণে কিছু অর্থ আহরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সম্পাদক মহাশয় আমায় একটু বসতে অনুরোধ করলেন। তিনি তখন একটা লেখা প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন, আর একটু লিখলেই সেটা শেষ হয়ে যাবে আর শেষ হয়ে গেলেই তিনি অবসর পাবেন। তাই আমায় বসতে ব'লে তিনি আবার একমনে কলম চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ছোট্ট আপিস ঘরখানার চারিদিক তাকিয়ে দেখলাম—ছবি, মূর্তি, খবরের কাগজের কাটিং, বই ইত্যাদি এখানে সেখানে ছড়ান রয়েছে! টেবিলের একপাশে কত রকম কাগজে ভর্তি একটি টুকরি। আমার মনে হ'ল, এ টুকরিটা যেন এক-একটা মানুষকে হাড়গোড় শুদ্ধ চিবিয়ে খাবে। ওর এই ভয়ানক গহ্বরটা দেখে মনটা ভারী বিষণ্ণ হয়ে পড়ল— এ যেন রূপকথার দৈত্যের একটা প্রকাণ্ড মুখগহ্বর, সব সময়ই হাঁ ক'রে রয়েছে, কত লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রচেষ্টা যে ও আত্মসাৎ করেছে তার সীমা সংখ্যা নেই। লেখা অমনোনীত হ'লেই ওর সেই সদাপ্রসারিত হাঁ-এর মধ্যে তলিয়ে যায়।

লেখা থেকে মুখ না তু'লেই সম্পাদক্ মহাশয় শুধালেন, 'আজ মাসের কয় তারিখ?'

'আটাশে।' তাঁর এতটুকু কাজে আসতে পারলাম মনে ক'রে খুশি হয়ে বললাম, 'আটাশে।'

তিনি একবার বললেন, 'আটাশে!' আবার তখুনি কলম চালাতে শুরু করলেন। খানিক পরে লেখা শেষ ক'রে কাগজগুলো সব গুছিয়ে এক-পাশে রেখে দিলেন। কতকগুলি কাগজ ছিঁড়ে সেই টুকরির ভিতর ফেলে দিলেন এবং কলমটা জায়গা-মত রেখে দিলেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে দুলতে দুলতে আমার দিকে তাকালেন। আমি তখনও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি দেখে খানিকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে আর খানিকটা স্ফূর্তির সঙ্গেই ইঙ্গিতে তাঁর পাশের একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

ঘরের ভিতর ঢুকে এমনভাবে ঘুরে গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারখানায় বসলাম যে, আমার যে ওয়েস্ট-কোট নেই এ যেন তিনি বুঝতে না পারেন। পকেট থেকে লেখাটা বার ক'রে বললাম, 'এ একটি চরিতালেখ্য—হয় ত ভাল হয় নি, তবু যদি আপনি একবার …'

তিনি আমার হাত থেকে লেখাটি নিয়ে তখনই পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ হচ্ছিল।

ছেলেবেলা থেকে যাঁর নাম শুনে আসছি, এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই যাঁর পত্রিকা আমার উপর সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করছে, সেই ব্যক্তিকে চোখের সামনে যখন দেখলাম তখন মনে হ'ল এই কি সেই লোক! মাথার চুল কোঁকড়ান এবং ছোট্ট কটা চোখ দুটি সর্বদাই চঞ্চল। মধ্যে মধ্যে নাক খোঁটা ওঁর এক বদাভ্যাস। কলম ক্রমাগত চলছে, কখন যে কার উপর নির্দয়ভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ চলবে তা কে বলতে পারে, অথচ এই অতিশান্ত সুবোধ ভালমানুষটিই যে প্রয়োজন হ'লে কালি-কলমের মারফতে কতটা নিষ্ঠুর আঘাত দিতে পারেন, তা এঁকে বাইরে থেকে দেখলে কিন্তু কিছুতেই বোঝা যায় না। এই মানুষটির কাছে যখনই আসি তখনই এক অদ্ভুত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় আমার মনটা ভ'রে ওঠে। আমার চোখ দুটো দিয়ে অশ্রুধারা বার হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল এবং তাঁর শিক্ষা তাঁর উপদেশ যে আমার কত উপকারে এসেছে সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। বলতে চাইছিলাম, আমায় যেন তিনি কখনও আঘাত না দেন। আমি একটা দরিদ্র হতভাগ্য আনাড়ি, জীবনে অনেক দুঃখকষ্টই সয়ে আসছি …

তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং টেবিলের উপর আমার পাণ্ডুলিপিটা রেখে ঠিক হয়ে ব'সে কি ভাবলেন। পাছে লেখাটা ফেরত দিতে তাঁর মনে কোন কষ্ট হয় এই মনে ক'রে হাত বাড়িয়ে

লেখাটা ফেরত চাইলাম। বললাম, 'হয় ত লেখাটা কিছুই হয় নি। আমায় খুশি করবার জন্যে আপনাকে যাতে কিছুমাত্র অসুবিধায় পড়তে না হয়,' এইটুকু ব'লে নিজের মনে হেসে উঠলাম—যেন খুশি মনেই লেখাটা ফেরত নিচ্ছি।

তিনি জবাব দিলেন, 'পাঠক-সাধারণ যে লেখা পড়তে ভালবাসে সে রকম লেখাই আমরা চাই। কারা সব আমাদের কাগজ পড়ে তা তোমার জানা আছে। কিন্তু সে কথা যাক, আরও সোজা সহজ কিছু লিখতে পার না কি? যে লেখা সকলেই বুঝতে পারে, এমন লেখা হ'লেই ভাল হয়।'

তাঁর অসীম ধৈর্য আমায় অবাক ক'রে দিলে। বুঝতে পারলাম, লেখাটা অমনোনীত হ'ল কিন্তু তা হ'লেও প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গীটি আমায় মুগ্ধ করল। তাঁর মূল্যবান সময় আর নষ্ট করব না মনে ক'রে বললাম, 'দেখি চেষ্টা ক'রে, মনে ত হয় পারব।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। এই বাজে লেখাটা নিয়ে ওঁর যে মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, তার জন্য উনি আমায় নিশ্চয় ক্ষমা করবেন ... মাথা নীচু ক'রে ওঁকে নমস্কার ক'রে দরজার হাতল টানলাম।

তিনি বললেন, 'দরকার থাকে ত কিছু আগাম নিয়ে যেতে পার। কাজের সুবিধা হতে পারে।

আমি যে অর্থাভাবে লিখতে পর্যন্ত পারছি নে এটা ওঁর চোখ এড়ায় নি, কাজেই তিনি যে আগাম দিতে চাইলেন তাতে নিজেকে একটু খাটো মনে করলাম। জবাব দিলাম, 'না, এখন তেমন দরকার নেই। আরও দিন কয়েক চালাতে পারব। আপনি যে আমার প্রতি করুণা দেখালেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আসি তা হ'লে। নমস্কার।'

'নমস্কার!' সম্পাদক মহাশয় জবাব দিয়েই ফের কাজে মন দিলেন। আমি তার যোগ্য নই, এর জন্যে ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই—এতটা সহৃদয়তার মর্যাদা যেন রাখতে পারি। ঠিক করলাম, যে লেখায় আমি নিজে সম্পূর্ণ তৃপ্ত না হব সেরূপ কোন লেখা দিয়ে আর কখনও এঁকে বিরক্ত করতে আসব না। ভাল লেখা হ'লে তবেই আসব। এমন লেখা হওয়া চাই যা দেখে তিনি একেবারে থ হয়ে যাবেন, হয় ত খুশি হয়ে পনর-বিশ টাকা দিতেই আদেশ দিয়ে বসবেন।

বাড়ীতে গিয়েই লেখাটা নিয়ে বসে গেলাম।

ভারী মজার ব্যাপার হ'ল। ক'দিনই ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে আসছি। রোজ সন্ধ্যা ঠিক আটটা বাজতে না-বাজতেই, অর্থাৎ রাস্তায় আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আমার নজরে পড়তে লাগল।

সারাদিন মেহানত ক'রে ও অনটনের সঙ্গে লড়াই ক'রে সন্ধ্যার মুখে যখন ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম তখন আমার দরজার বিপরীত দিকের ল্যাম্প-পোস্টটার পাশে কালো পোশাক-পরা একটি যুবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

সে আমার দিকে তাকাল এবং তার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তার দৃষ্টি রীতিমত আমায় অনুসরণ করছে। লক্ষ্য করলাম, প্রতিদিনই ও একই পোশাক প'রে আসে, আর একই মোটা ওড়নাখানায় ওর মুখখানিকে ঢেকে রাখে। প্রতিদিনই দেখি ওর হাতে একটি হাড়ের বাঁটওয়ালা ছাতা। পর পর তিন দিন এমনি অবস্থায় ওকে ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার সামনে দিয়ে চ'লে আসার পর দেখি, আমি যে দিকে যাই মহিলাটি তার বিপরীত দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। আমার অতি শ্রান্ত মস্তিষ্ক কৌতূহলে স্পন্দিত হতে লাগল এবং তৎক্ষণাৎ অহৈতুক একটা ধারণা এসে

আমার অধিকার ক'রে বসল যে, মহিলাটি রোজ আমায় দেখবার জন্তেই আসেন। তারপর একদিন তার সঙ্গে প্রায় কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তাকে জিজ্ঞেস করেতে চাইছিলাম যে, সে কারুর প্রতীক্ষায় আছে নাকি। আমার সাহায্য যদি তার প্রয়োজন হয় বা যদি তাকে বাড়ী পৌছে দেওয়া দরকার হয় ত আমি তা করতে প্রস্তুত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার পোশাক পরিচ্ছদ নিতান্তই বিশ্রী নোংরা, তবু রাত্রির অন্ধকারে তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পৌছে দিতে পারি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা অব্যক্ত ভয়ে আমায় একান্ত অভিভূত ক'রে ফেলল যে, ওকে সাহায্য করতে গিয়ে আমার কিছু খরচও ত হতে পারে—গাড়ীভাড়া, না হয় এক গ্লাস মদ—এ ত চাই-ই; আর এদিকে ট্যাঁকে যে একটি পয়সাও নেই। আমার এই ক্লেশকর নিঃস্ব অবস্থাটা আমায় মহিলাটির সাহায্যে যেতে নিরুৎসাহ ক'রে দিল! তার সামনে দিয়ে যেতে যেতে তাকে যে ভাল ক'রে দেখব তাও সাহসে কুলোল না। আবার ক্ষুধার জালায় ছটফট ক'রে উঠলাম, কাল থেকে কিছুই খাইনি। অবশ্য এ ত আর তেমন দীর্ঘ সময় নয়, এক একবার ছয়-সাত দিনও আমার নিরম্বু উপবাস করতে হয়েছে; কিন্তু শেষটায় আমি সাংঘাতিক অবসন্ন হয়ে পড়লাম। আগে উপবাস করলে যে পথটুকু অনায়াসেই চলতে পারতাম, শেষটায় কিন্তু তাও আর পারছিলাম না! একটি দিন মাত্র তেষ্টায় জল খেয়ে ক্রমাগত গা বমি-বমি ক'রে আমায় বিছানা নিতে বাধ্য করেছিল, সে যে কি কষ্ট বলতে পারি নে।

সারা রাত সে কি কাঁপুনি, জামা-কাপড় যা-কিছু ছিল সবই পরলাম কিন্তু তবু সে কাঁপুনি কমে না। শীতে একেবারে যেন জমে গেলাম। আড়ষ্টভাবে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টেরও পাইনি। পুরোনো কম্বলে শীত আর কিছুতেই মানছিল না এবং সেই জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে সেই দুরন্ত শীতের বাতাসে নাকটা আমার বন্ধ হয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম এবং আর একটি প্রবন্ধ লেখা না হওয়া পর্যন্ত কেমন ক'রে বেঁচে থাকব সেই ভাবনাই করছিলাম। একটা মোমবাতি যোগাড় করতে পারলে রাত্রিতেও লেখাটি নিয়ে চেষ্টা করা যায়। একবার মনটাকে সংযত ক'রে বসতে পারলেই ঘণ্টা কয়েকের চেষ্টাতেই এটা তৈরি ক'রে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি।

আর বেশি না ভেবে ওপ্‌ল্যাণ্ড কাফিখানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার সেই সদ্য-আলাপী ব্যাঙ্কের কেরানী বাবুটির কাছ থেকে একটা মোমবাতির জন্যে এক আনার পয়সা যোগাড় করাই হ'ল আমার অভিপ্রায়। প্রায় সবগুলি ঘর ঘুরে দেখলাম, কেউ বাধা দিল না। দেখলাম কত নর-নারী দলে দলে বসে খাচ্ছে, গল্প করছে, কেউ কেউ বা আবার গান করতে করতে মত্ত হয়েও পড়েছে। গোটা কাফিখানাটার এখানে সেখানে আঁতিপাতি ক'রে বন্ধুকে খুঁজে ফিরলাম কিন্তু তার সাক্ষাৎ মিলল না।

দারুণ বিমর্ষ ও উত্যক্ত হয়ে আবার এসে রাস্তায় পড়লাম এবং কায়ক্লেশে দেহটাকে আমার প্রাসাদের দিকে টেনে নিয়ে চললাম।

আমার এই দুঃখ কষ্টের কি কখনও পরিসমাপ্তি হবে না? কে বলতে পারে? কোটের কলারটা উল্টিয়ে কান পর্যন্ত ঢেকে নেহাৎ জংলীর মত পায়জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে এগিয়ে চললাম। এই সুদীর্ঘ সাত-আট মাসের মধ্যে এমন একটা ঘণ্টাও পাইনি, যে সময়টা নির্ভাবনায় কাটাতে পেরেছি! দেহ আর আত্মাকে খাড়া রাখবার মত একটা সপ্তাহও সামান্য খাবার আমি জোটাতে পারি নি, দুই-এক দিন ভালয় ভালয় খেতে না-খেতেই আবার অভাব অনটন উপবাস আমায় হাঁ ক'রে গিলতে এসেছে। কিন্তু সুখের বিষয়, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও বুক টান ক'রে চলেছি, কোথাও নিজেকে এতটুকু খাটো হ'তে দিই নি,—মনে

প্রাণে জানি, কোথাও নিজেকে এতটুকু খর্ব করিনি। ভগবান আমায় রক্ষা করুন, নইলে আমার কি শক্তি, এত বিরুদ্ধতার মধ্যেও নিজেকে খাড়া রাখতে পারি। আপনার মনেই তখন সেদিনকার কথাটা আওড়াতে লাগলাম যে-দিন হ্যান্স্ পলীর কাছ থেকে ধার-করে-আনা কম্বলখানাও পোদ্দারের দোকানে বাঁধা দিতে গিয়েছিলাম। ভগবান আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, নইলে আমার কি সর্বনাশই না আমি ক'রে বসতাম!

একটু ক্ষীণ দ্বিধাসঙ্কোচে কৃত্রিম হাসি হেসে ঘৃণা ভ'রে রাস্তায় থুথু ফেললাম এবং আমার এই নির্বুদ্ধিতায় নিজেকে যথাযোগ্য বিদ্রূপ করার মত জোরালো ভাষা খুঁজে পেলাম না। এ মুহূর্তে যদি কোন বিধবা বা ভিখিরীর কাছে একটা এক আনি দেখতে পেতাম, তা হ'লে নিশ্চয়ই তা ছিনিয়ে নিতে পারতাম; সজ্ঞানে তা আত্মসাৎ ক'রে আরামে ঘুমাতেও পারতাম, মনে এতটুকু গ্লানি আসত না। এই যে অব্যক্ত যাতনা সহ্য করছি এও একেবারে নিরর্থক নয়—ধৈর্যের মাত্রা পূর্ণ হয়ে আসছে। এখন সব কিছু করতে প্রস্তুত আছি।

প্রাসাদের চারিদিক তিন-চার বার প্রদক্ষিণ করলাম, তারপর ঠিক করলাম, এবারে ঘরে ফেরা যাক্, অবশ্য তার আগে পার্কে খানিকটা ঘুরে ফিরে কার্ল জোহানের দিকে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। তখন প্রায় এগারটা বেজেছে। রাস্তাঘাট অনেকটা আঁধার হয়ে এসেছে, চারিদিকেই লোকজন চলাফেরা করছে, কেউ-বা যুগলে, আর কেউ কেউ-বা দলে দলে হাসি-কলরব করতে করতে চলেছে। এই সময়ে যুগলে মিলে কত আমোদ-প্রমোদেই না মত্ত হয়ে পড়ে, সে কারণে গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ও খুব বেশি বেড়ে যায়। পেটি-কোটের খস্‌খসানি, এখানে সেখানে খাটো ইঙ্গিত, হাসি মস্করা ঠাট্টায় চারিদিক একেবারে সরগরম, কত ঘন আন্দোলিত বক্ষ, কত আসক্তি অনুরাগ, কত

হাঁসফাঁসানি, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস! গ্রাণ্ড হোটেলের চারিদিকে একটি মাত্র শব্দ শোনা যায়—এম্মা! সারাটা রাস্তা জমজমাট।

আমার পকেটে যদি গোটা কয়েক টাকা থাকত! পথচলতি প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে একটা তীব্র অনুরাগের পুলক শিহরণ জেগে উঠেছিল, গ্যাসের সেই মিটমিটে আলোক, রাত্রির সেই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা—সব কিছুই আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল—ফিসফিসানি, আলিঙ্গন, কম্পন, স্বীকার, অঙ্গীকার, আদি-উচ্চারিত বাণী এবং চাপা চীৎকারে এর বাতাস একদম ভারাক্রান্ত। একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে গোটা কয়েক বেরাল মিলে পরস্পরে চীৎকার ক'রে তাদের প্রেম-নিবেদন করছিল। আমার ট্যাঁকে কিন্তু একটা টাকাও নেই! এই যন্ত্রণা, এই হীনাবস্থা, এই চরম নিঃস্বতার যেন তুলনাই হয় না। কি লজ্জা, কি পরিতাপের বিষয়! অথচ কোন উপায়ই নেই! আবার আপনার মনে ভাবতে লাগলাম, বিধবার শেষ কপর্দক, স্কুলের ছেলের বই শ্লেট, এমন কি, ভিখারীর ভিক্ষালব্ধ পয়সা, ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ডও আমি এখন অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পারি। আর সেগুলো নিয়ে বেচে খেতে পারি, তাতে কিছুমাত্র ইতস্তত আমার হবে না।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে, ক্ষতির এতটুকু পূরণ করার মতলবে রাস্তা দিয়ে যারা আসা-যাওয়া করছিল তাদের প্রত্যেকেরই দোষ ধরতে লাগলাম। ঘৃণা ভরে ঘাড় নেড়ে অবজ্ঞার সঙ্গে তাদের দিকে তাকাতে লাগলাম! এই সব অল্পে তুষ্ট মিষ্টিখোর স্কুল-কলেজের ছেলে, এরা নগণ্য মেয়ে-দর্জীকেও অনায়াসে উত্যক্ত ক'রে নির্দয় আনন্দ উপভোগ করতে পারে! এই সব মেষ-শাবককের দল,—ব্যাঙ্কের কেরানী, ব্যবসাদার, আড্ডাধারী—এরা সামান্য একটা ছোট জাতের কুরূপা স্ত্রীলোককেও অনাদর করে না; এক পাত্তর বিয়ারের জন্যে ঐ সব কুলটা মেয়েগুলি যার-তার পা চাটতে পারে। কি ব্যাভিচার! গত

রজনীতে দারোয়ান-জাতীয় লোক বা আস্তাবলের ছোকরাদের আলিঙ্গনের উত্তাপ এখনও হয় ত এদের দেহে রয়ে গেছে! ওদের দ্বার সকল সময়েই খোলা, নব নব পুরুষের জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। একবার এলেই হ'ল, সে যেই কেন না হোক!

ফুটপাথের উপর জোরে থুথু ফেললাম, কারুর গায়ে যে গিয়ে পড়তে পারে সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। রাগে গস্ গস্ করতে লাগলাম, এই যারা গায়ে পড়ে খামকা চেনাশুনা না থাকলেও আত্মীয়তা করতে চায় তাদের উপর ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করতে লাগল। আমার চোখের সামনেই ত ক'জনকে দেখলাম। মাথা তুলে এই মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম যে, নিজের ঘর সাফ রাখতে এখনও পেরেছি। পার্লামেণ্ট প্লেশে যখন এসে পৌছলাম তখন একটি কিশোরীকে দেখতে পেলাম। তার কাছাকাছি আসতেই সে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

তাকে নমস্কার জ্ঞাপন করলাম।

প্রত্যুত্তরে সেও নমস্কার জানিয়ে থামল।

হুঃ। এত বেলায় কি ও বেড়াতে বার হয়েছে? এই সন্ধ্যার মুখে কার্ল জোহানের আশপাশ দিয়ে ওর মত এক তরুণীর রাস্তায় বার হওয়া কি বিপদজনক নয়?—নিশ্চয়ই। যে কেউ ত একা পেয়ে ওকে অপমান করেতে পারে।

তাই ওকে বললাম, 'চল, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।'

ওকে সাহায্য করতে যাওয়ায় আমার কি মতলব থাকতে পারে তা অনুমান করবার জন্যে ও শ্যেন্ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর সাহসা আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলে উঠল:

'বেশ, চল। দুজনে এক সঙ্গেই যাই। যাবে?

ওকে নিয়ে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। কিন্তু কয়েক পা যেতে না-যেতেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এবং কাঁধ থেকে ওর হাতখানা সরিয়ে নিয়ে ওকে বললাম, 'শোন লক্ষ্মী, আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।' এবং এই ব'লেই আমি চলতে লাগলাম।

প্রথমে ও আমার কথা বিশ্বাস করল না ; কিন্তু আমার সব কয়টা পকেট খুঁজে যখন সত্যিই কিছু মিলল না তখন ভারী বিরক্ত হয়ে মাথাটা নাড়ল এবং যাচ্ছেতাই গালাগালি দিল।

'নমস্কার !'

'একটু দাঁড়াও', ও ডাকলে, ; 'তোমার চশমার ফ্রেমটা কি সোনার ?'

'না।'

'তবে চুলোয় যাও।'

আমি চলতে লাগলাম।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ও আমার পিছু পিছু দৌড়ে এল এবং চেঁচিয়ে ডাকল, 'পয়সা না থাক—এস। পয়সা তোমার কাছে চাইনে।'

রাস্তার একটা কুলটার এ প্রস্তাবে নিজেকে অপমানিত বোধ করলাম। বললাম, 'না। রাত বেশ হয়েছে, তা ছাড়া, একটা সভায়ও আমায় উপস্থিত থাকতে হবে।'

'এস না, এক সঙ্গে যাই।'

'বিনি পয়সায় ত আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি নে।'

'আমার সঙ্গে না গেলেও আর এক জনের সঙ্গে যাবেই।'

বললাম, 'না।'

একটা রাস্তার কুলটার কাছে যে আমি হাস্যাস্পদ হলাম এ বিষয়ে আমি একান্ত সজ্ঞান ছিলাম, কাজেই ওর হাত এড়াবার এক উপায় ঠাওরে নিলাম।

'তোমার নাম কি ?' ওকে শুধোলাম। 'মেরী, য়্যাঃ ! বেশ নামটি

ত! মেরী, তুমি আমার একটা কথা শোন!' এবং ওর আচরণ সম্বন্ধে ওকে উপদেশ দিতে শুরু ক'রে দিলাম। আমার কথা শুনে মেয়েটা ভারী বিস্মিত হয়ে গেল। ও কি এখনও মনে করে যে, সন্ধ্যা বেলায় যারা পথে বেরিয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়ায় আমি সেই দলেরই একজন? ও কি সত্যি সত্যিই আমাকেও অতটা খারাপই মনে করছে? আমি ত ওর সঙ্গে কোন রকম অভদ্র ব্যবহার করি নি। সত্যি বলতে কি, আমি ওকে সম্ভাষণ ক'রে সঙ্গে নিয়ে এই কয়েক পা এসেছি, ওর দৌড় কতটা, তা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। শেষটায় ওকে বললাম, আমার নাম অমুক—আমি অমুক জায়গার পুরোহিত। 'থাক, এবার ঘরে চলে যাও, আর পাপ করো না।' এই বলেই আমি চলে এলাম।

আমার সুবুদ্ধি এখনও অটুট আছে দেখে আনন্দে হাত কচলাতে আরম্ভ ক'রে দিলাম এবং আপনার মনে জোরে জোরে ব'লে উঠলাম, 'ভাল কাজ করার মধ্যে ঢের আনন্দ আছে।' হয় ত সারা জীবনের তরে এই হতভাগিনী নারীর মধ্যে একটা শুভ বুদ্ধির প্রেরণা জাগিয়ে দিতে পেরেছি। হয় ত সত্যি সত্যিই ওকে ত্রাণ করলাম—যখনই ও এ সম্বন্ধে ভাববে তখনই আমার এ মহত্ত্বটুকু মনে করবে। হয় ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরণ আমার নামও স্মরণে থাকবে। সাধু সচ্চরিত্র ও ধর্মভীরু হওয়ায় লাভ অনেক।

মেজাজটা তখন একেবারে শান্ত সমাহিত। নিজেকে তখন উজ্জ্বল পবিত্র মনে হ'ল, যত দুঃখ বিপদই আসুক না কেন, তার সম্মুখীন হবার মত সৎসাহস আমার যথেষ্টই আছে বলে বিশ্বাস হ'ল। এখন যদি আমার একটা মোমবাতি সংগ্রহ করবার সঙ্গতি থাকত তা হ'লে প্রবন্ধটা অনায়াসেই শেষ করতে পারতাম। হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম, ঘরের নতুন চাবিটায় ঠন ঠন ক'রে শব্দ হচ্ছিল। গুন্ গুন্ করতে করতে এবং

শিস্ দিতে দিতে কেমন ক'রে একটা বাতি যোগাড় করতে পারি তারই উপায় আবিষ্কার করতে চেষ্টা পেলাম। লিখবার কাগজপত্র নিয়ে রাস্তার আলোতে বসেই আমায় লিখতে হয়, এ ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই। ঘরের দরজা খুলে কাগজ-পত্র নেবার জন্য ভিতরে গেলাম। আবশ্যক কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে সামনেকার আলোটার নীচে বসে গেলাম। চার দিকেই একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে ; দূরে ফুটপাথের উপরে পাহারাওয়ালার জুতার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, আরও দূরে কোথায় একটা কুকুর চীৎকার করছিল। বিরক্ত হবার মত কিছু নেই। কোটের কলারটা উলটিয়ে কান পর্যন্ত ঢেকে দিলাম এবং একাগ্রতার সঙ্গে লেখা সম্বন্ধে ভাবতে লাগলাম।

এই ছোট্ট লেখাটিকে যদি একটি যথাযোগ্য সমাপ্তিতে শেষ করতে পারতাম তা হ'লে লেখাটা সত্যি ভারী চমৎকার হ'ত। এতে একটা কঠিন বিষয়ই আলোচনা করতে চেষ্টা পেয়েছি, সুতরাং তাতে একটু নতুনত্ব থাকা বিশেষ দরকার। শব্দযোজনা ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমপরিণতির একটা বিশিষ্টতা দেখানো আবশ্যক। কিন্তু আবশ্যক শব্দগুলি যেন কিছুতেই মনে আসছিল না। গোড়া থেকে লেখাটা আগাগোড়া বার কয়েক পড়ে নিলাম, প্রত্যেকটি বাক্য চেঁচিয়ে পড়লাম ! যাতে আমার চিন্তার ধারা অব্যাহত গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়। কিন্তু লাভের মধ্যে এই হ'ল, আমি যখন লেখাটা নিয়ে এমনি ধারা দস্তুরমত কসরৎ করছিলাম তখন পাহারাওয়ালাটা এসে আমার অদূরে বসে পড়ে আমার মেজাজটা একদম বিগড়ে দিলে। আচ্ছা, আমি বসে বসে কাগজের জন্যে একটা প্রবন্ধ রচনা করছি তাতে ও হতভাগার বাধা দেবার কি প্রয়োজন ছিল? ভগবান, অথই জলে তলিয়ে না গিয়ে মাথা জাগিয়ে রাখতে যত চেষ্টাই করি নে কেন, কাজে তা সার্থক ক'রে তোলা কত না অসম্ভব !

ঘণ্টাখানেক ওখানে অপেক্ষা করলাম। কনেস্টবলটাও চলে গেছে। এত দারুণ শীত, বোধ হ'তে লাগল যে, কিছুতেই আর নিজেকে সেখানে ধ'রে রাখতে পারছিলাম না। আমার এত সাধের চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় হতাশ হয়ে একদম দমে গেলাম। তারপর আবার ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

সেখানেও ভারী শীত। এবং এত অন্ধকার যে, জানলাটা পর্যন্ত নজরে আসছিল না। আপনা থেকে বিছানায় গিয়ে বসলাম; জুতা জোড়া খুলে হাত দিয়ে পা দুটো গরম করবার জন্যে রগড়াতে শুরু ক'রে দিলাম। তারপর জামা-কাপড় পরেই শুয়ে পড়লাম।

এমন কত দিন থেকেই চলে আসছে। ভোর হতে না-হতেই পরদিন ঘুম থেকে জেগে বিছানার উপর উঠে ব'সে ফের প্রবন্ধটা নিয়ে বসে গেলাম। দুপুর পর্যন্ত সেটা নিয়ে কেটে গেল; বড় জোড় দশ-বিশ লাইন মাত্র লিখতে পারলাম, শেষ করা আর হয়ে উঠল না।

বিছানা ছেড়ে উঠে জুতা জোড়াটা পায়ে দিয়ে ঘরের মেঝেয় পায়চারী আরম্ভ ক'রে দিলাম, তাতে শীত কাটাবার সম্ভাবনা ছিল। চেয়ে দেখি জানলায় হিমানী—বাইরে বরফ পড়ছে। নীচের উঠোনে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। ব্যস্ত হয়ে ঘরের মধ্যেই উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ালাম, নখ দিয়ে দেয়ালে আঁচড় কাটলাম, তর্জনী দিয়ে মেঝেয় আঘাত করলাম। তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি সব কান পেতে শুনতে আরম্ভ ক'রে দিলাম, যেন আমার পক্ষে তা একান্ত জরুরী; সারাক্ষণ থেকে থেকে জোরে জোরে কি সব বিড় বিড় ক'রে আওড়ালাম—উদ্দেশ্য নিজের কণ্ঠস্বর যেন নিজে শুনতে পাই।

কিন্তু ভগবান, এ কি উন্মাদের লক্ষণ নয়! তবু কিন্তু আমার এই উন্মত্ত আচরণ সমভাবেই চলল। অনেকক্ষণ বাদে—ঘণ্টাকয়েক হবে—নিজে থেকেই দস্তুর মত প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠলাম, ঠোঁট কামড়িয়ে নিজেকে

সচেতন ক'রে তুললাম। এই উন্মত্ততার শেষ করতেই হবে! হাতের গোড়ায় একখানা কাঠের কুচো পেলাম এবং তাই চিবোতো চিবোতে লেখায় মন দিলাম।

অনেক কষ্টে প্রাণপণ চেষ্টায় গোটাকয়েক অপদার্থ শব্দ যোজনা ক'রে কয়েকটি ছোট ছোট বাক্য রচনা করলাম। লেখাটাকে যেমন ক'রেই হোক, শেষ করতেই হবে যে! কলম আর এগুলো না, মাথাটা যেন একেবারে ফতুর হ'য়ে গেছে, কিছুই যেন আর বাকি নেই। চেষ্টা করবার শক্তিও আজ-কিছুমাত্র ছিল না। আর যখন লিখতেই পারব না, এমন অবস্থা, তখন অসমাপ্ত লেখাটার শেষ পৃষ্ঠাটার দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে রইলাম। সে অদ্ভুত আঁকা বাঁকা অক্ষরগুলি যেন শিং উঁচিয়ে আসছিল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম কিন্তু তার মাথামুণ্ড কিছুই ঠিক হদিশ পেলাম না। আর কিছু ভাবতেও পারলাম না।

সময় বয়ে চলল। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে, গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ পেলাম। আস্তাবলের সেই ছোকরাটি ঘোড়াগুলোকে গালাগালি দিচ্ছে শুনতে পেলাম। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বসে বসে ঠোঁট দুটোকে থুথু দিয়ে ভিজাতে শুরু ক'রে দিলাম। এ ছাড়া আর কিছু করবার কোন চেষ্টাই করলাম না। বুকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছিলাম। ক্লান্তিতে বিছানার উপর একেবারে নেতিয়ে পড়লাম। হাতের আঙুলগুলি গরম করবার উদ্দেশ্যে চুলের মধ্যে যদৃচ্ছা চালাতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। আঙুল বুলানোর ফলে অনেকগুলি চুল আপনা থেকেই উঠে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে রুখিও ঝরে প'ড়ে বালিশময় ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন কিছুই মনে হ'ল না, যেন এর সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। মাথায় ত এখনও ঢের চুল রয়েছে, ভাবনা আসবার কথা ত নয়। কুয়াশার মত আমার মনটাকে যে জড়তা এসে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে তাকে নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা

পেলাম। ব'সে ব'সে হাতের তালু দিয়ে হাঁটু চাপড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। শক্তিতে যতটা কুলায় অট্টহাসি হেসে উঠলাম—তার পরই একেবারে চুপচাপ।

বৃথা, সব বৃথা! অসহায়ের মত মরতে বসেছি, অথচ চোখ চেয়ে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি, কোন উপায় নেই! বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে পুরে দিলাম কিন্তু তা চুষতে পারলাম না। মগজের মধ্যে কি একটা অদ্ভুত খেয়াল এসে উত্যক্ত ক'রে তুললে—একেবারে অসংবদ্ধ চিন্তা।

আচ্ছা, আঙুলটা যদি কামড়াই? মনে হ'তেই মুহূর্তের জন্যে কিছু না ভেবেচিন্তে চোখ বুজলাম এবং দাঁত দিয়ে খুব জোরে আঙুলটা চেপে ধরলাম।

লাগতেই লাফ দিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তখন পুরো জ্ঞান ফিরে এসেছে। আঙুল দিয়ে সামান্য রক্ত ঝ'রে পড়তেই জিভ দিয়ে তা চেটে নিলাম। বিশেষ কাটে নি, ব্যথাও বড় একটা তেমন পাইনি, মাঝের থেকে সহজেই আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। মাথা নেড়ে জানলার সামনে গেলাম, সেখানে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়ে ছিল, তাই দিয়ে আহত স্থানটা মুছে বেঁধে নিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এই কাজে ব্যস্ত তখন চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল। আপনার মনে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলাম। বেচারী সরু আঙুলটির শোচনীয় অবস্থা দেখে সত্যি দুঃখ হল। এ তোমার কি লীলা, ভগবান! বুঝতে পারছি না ত!

ক্রমে আঁধার হয়ে এল। অন্ধকার হয়ে আসবার আগেই যদি লেখাটা শেষ করতে না পারি তা হ'লে যে একটা মোমবাতির দরকাব হবে, কিন্তু কোথায় পাব তা? মাথাটা তখন আবার দিব্য পরিষ্কার, চিন্তাগুলি যথারীতি এল-গেল, তাতে কোন গোল হ'ল না। এমন কি, ঘণ্টা কয়েক আগে যেমন ক্ষুধা অনুভব করছিলাম, এখন তেমন

প্রচণ্ডভাবে তা অনুভূত হ'ল না। পরের দিন পর্যন্ত অনায়াসেই না খেলেও চলতে পারব। যদি নিজের অবস্থা জানিয়ে সমবায় সমিতির দোকানে একটা মোমবাতি চাই তা হ'লে হয় ত নিশ্চয়ই পেতে পারি ; বিশেষত, আমি সেখানকার সকলেরই বিশেষ পরিচিত। অবস্থা যখন ভাল ছিল তখন সেখান থেকে কত রুটিই না কিনেছি। সেখানে আমার যে সুনাম আছে তার জোরে যে অনায়াসেই একটি মোমবাতি যোগাড় হতে পারে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই মনে ক'রে দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম জামাকাপড়টা একটু ভাল ক'রে ঝেড়ে ফুঁকে যতটা সম্ভব ভব্যতা বাঁচিয়ে উপরের সিঁড়ি ধ'রে উঠে চললাম।

যেতে যেতে মনে হ'ল, মোমবাতি না চেয়ে একখানা রুটি চাইলে কেমন হয়? অস্থিরতা বেড়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে নিজেই নিজেকে বললাম, 'না, কিছুতেই না।' আমার শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোন রকম খাবারই হজম করবার শক্তি আমার নেই। যদি খাই ত আবার সেই একই অবস্থা—স্বপ্ন, পূর্বাববোধ, উন্মত্ততা। প্রবন্ধটাও আর তা হ'লে কখনও শেষ হবে না, সম্পাদক মশায়ও তা হ'লে হয় ত ইতিমধ্যে আমার কথা একদম ভুলে যাবেন। না, কোন মতেই তা হ'তে পারে না। মোমবাতিই চাইব, তাই ঠিক করলাম। এবং এই আশা নিয়েই দোকানে গিয়ে ঢুকলাম।

একটি মহিলা কি সব জিনিসপত্র কিনছিলেন, তাঁর সামনে অনেকগুলি ছোটখাটো পুলিন্দা জড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দোকানী আমায় চিনত, তাই আমায় দেখতে পেয়ে মহিলার সামনে থেকে স'রে এসে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে স্বভাবত যে জিনিস সব সময় কিনে থাকি-সেই একখানা রুটি কাগজে মুড়ে হাত বাড়িয়ে আমায় দিলে।

তাকে বললাম, 'রুটি চাই নে, একটা মোমবাতি এখন খুব দরকার।' ধীরস্থির ভাবে কথাটি বললাম, পাছে দোকানী না অসন্তুষ্ট হয়, কেন না, তা হ'লে আমার যা দরকার তা নাও পেতে পারি।

আমার কথায় দোকানী একটু লজ্জিত হ'ল। অপ্রত্যাশিতভাবে এ জবাবে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। জীবনে এই হয় ত সব প্রথম রুটি ছাড়া আর কিছু তার কাছে চাইলাম।

দোকানী জবাব দিল, 'তা হ'লে একটু অপেক্ষা করতে হবে।' এই ব'লেই মহিলাটির জিনিসপত্রের দিকে একান্ত মনোযোগ দিল।

মহিলাটি জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে দাম চুকিয়ে দিলেন। তিনি একখানা দশটাকার নোট দিলেন, দোকানী তার জিনিসের দাম কেটে রেখে বাকি পয়সাটা তাঁকে ফেরত দিয়ে দিল। তখন সেখানে দোকানের ছোক্‌রা আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। ইত্যবসরে আমার কাছে এসে সে বললে, 'কি চাই, মোমবাতি?'

এই ব'লে মোমবাতির একটা বাণ্ডিল খুলে তার থেকে আমায় একটা মোমবাতি দিল। তার মুখের দিকে চাইলাম, সেও আমার দিকে তাকাল; যে কথা বলে মোমবাতি চাইতে এসেছিলাম তা কিন্তু কিছুতেই মুখ দিয়ে বার হ'ল না।

হঠাৎ সে ব'লে উঠল, 'তা বেশ। দাম ত পেয়েছিই।' আমি দাম দিয়েছি, ও তাই জানাল। ওর সব ক'টা কথাই আমার কানে এল। ও তখন বাক্স থেকে টাকা তুলে গুণতে লাগল। টাকাগুলি যেন জ্বল্ জ্বল্ করছিল। নিজের প্রাপ্যটা রেখে দশ টাকার বাকিটা আমায় ফেরত দিতে গিয়ে বললে, 'এই নিন! নমস্কার।'

মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে টাকা ও ভাঙানিগুলির দিকে তাকালাম, কোথাও যে একটা কিছু ভুল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি আর এতটুকু ভাবতেও পারলাম না; ভাল-মন্দ কোন কথাই মনে

এল না—হাতের মুঠোতে এই যে আপনা থেকেই ঐশ্বর্য এসে পড়ল তাতেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। যন্ত্রের মত হাত বাড়িয়ে টাকাগুলি তুলে নিলাম।

খানিকক্ষণ বোকার মত বিস্ময়ে অবাক হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন অসাড় অবশ হয়ে গেছি আমি। দরজার দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম, আবার তক্ষুনি থেমে গেলাম। দেয়ালের দিকে একবার ফিরে তাকালাম। সেখানে চামড়ার বথলসে একটি ছোট্ট ঘণ্টা ঝুলান রয়েছে। তার নীচেই দড়ির একটি পুঁটলি—এই সব জিনিসের দিকেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল।

দোকানী-ছেলেটার কেন মনে হ'ল যে, আমি যখন যাই-যাচ্ছি ক'রেও নড়ছি না, তখন হয় ত একটু আলাপসালাপ করাই আমার উদ্দেশ্য, তাই সে কাউণ্টারের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুলিন্দা-বাঁধা কাগজগুলি গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে, 'বেশ শীত পড়ে আসছে, কেমন, নয়?'

জবাব দিলাম, 'তা হবে। সত্যি একটু একটু শীত পড়ে আসছে।' এবং একটু পরেই আবার বললাম, 'কিছুই অসময়ে আসে না, সময় হ'লেই আসে।'

সবগুলি কথাই স্পষ্ট কানে গেল এবং তক্ষুনি মনে হ'ল যে কথাগুলি যেন আমার নয়, আর কেউ বলছে। কথাগুলি যেন নিছক অনিচ্ছায় না-জেনে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় আওড়ে যাচ্ছি।

ছেলেটি বললে, 'আপনি কি তাই মনে করেন নাকি?'

টাকা ও ভাঙানিগুলো তখন ডান হাতের মুঠোশুদ্ধ পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। এবং দরজা খুলে বার হয়ে এলাম! তাকে যে 'নমস্কার' জানিয়েছিলাম তাও কানে এল, এবং সেও জবাবে প্রতি-নমস্কার জানিয়েছিল তাও কান এড়াল না!

দোকান থেকে বার হয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ছেলেটি বাইরে বেরিয়ে এসে আমায় ডাকল। বিস্মিত বা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত না হয়ে তার কাছে ফিরে গেলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই টাকা ও ভাঙানিগুলি হাতে নিয়ে ফেরত দিতে প্রস্তুত হলাম।

ছেলেটি কিন্তু বললে, 'আপনি যে ভুলে মোমবাতিটাই ফেলে যাচ্ছেন!'

গম্ভীর সংযত কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'তাই নাকি। ধন্যবাদ! বাঁচালে ভাই, নইলে আবার ঘুরে আসতে হ'ত!' মোমবাতিটি হাতে নিয়ে অলস মন্থর গতিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

আমার যখন চেতনা ফিরে এল তখন সর্বাগ্রে টাকার কথাটাই আমার মনে হ'ল। একটা ল্যাম্প-পোস্টের সামনে গিয়ে টাকাগুলি একবার গুণে দেখলাম এবং হাঁতে ওজন ক'রে দেখতেও ছাড়লাম না, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসি সংবরণও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, কেন না এ টাকাটা অস্বাভাবিক উপায়ে মিলে যাওয়ায় আমার যে অসীম উপকার হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। কি সুবিধাই না হবে! বেশ দিন কয়েক এ দিয়ে চলে যাবে। পকেটে টাকাগুলি রেখে হাত দিয়ে সেগুলি ছুঁয়ে হেঁটে চললাম।

গ্রাণ্ড স্ট্রীটে এক খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল, সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে নিলে মন্দ হয় না। বাইরে থেকে কাঁটা-চামচে ও ডিসের ঝন্-ঝনানি শুনতে পেলাম। লোভ সামলান মুশ্‌কিল হয়ে দাঁড়াল, তাই দোকানে ঢুকে ব'লে উঠলাম, 'এক প্লেট মাংস দাও ত।' মেয়ে-খানসামাটি বলে উঠল, 'কতটুকু মাংস আন্‌ব?'

'এক প্লেট!'

দরজার পাশে একখানা ছোট টেবিলে ব'সে প'ড়ে খাবারের

প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। যেখানটায় ব'সে ছিলাম সেখানটায় বেশ অন্ধকার। কাজেই আমাকে বড় কেউ একটা লক্ষ্য করতে পারবে না জেনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম এবং গভীরভাবে ভাবতে শুরু ক'রে দিলাম! মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে মেয়েটি আমার দিকে চাইছিল। জীবনে আজ প্রথম অসাধু হলাম—চুরি করলাম! এর তুলনায় বাল্যকালের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি কিছুই নয়—এ আমার জীবনের প্রথম স্খলন। ··· তা বেশ! এখন ভেবে আর কি হবে, যা হবার তা ত হয়েই গেছে। ব্যাপারটা দোকানের মালিকের সঙ্গে মিটিয়ে ফেললেই চলবে' খন, সুযোগ সুবিধার প্রতীক্ষায় থাকাই ঠিক। এখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার দেখছি নে। আমার চাইতে সাধু উপায়ে জীবন যাপন করতে আর কাউকে বড়-একটা দেখি নি; আমার সঙ্গে ত কোন চুক্তি নেই যে ···

'কই, মাংস দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?'

বালিকা বললে, 'এই যে, এখুনি নিয়ে আসছি।' ব'লেই সে দরজা খুলে রান্নাঘরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

কিন্তু ধর, ব্যাপারটা একদিন হয় ত জানাজানি হয়ে যেতে পারে। দোকানী-ছেলেটির মনে যদি কোনরূপ সন্দেহ আসে তা হ'লে সেই খদ্দের স্ত্রীলোকটির দেওয়া নোটের ভাঙানি সম্পর্কে আমার কথাটা তার মনে পড়ে যেতে পারে। একদিন না একদিন যে সে এটা জানতে পারবেই সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। হয় ত এবার যে দিন সেই দোকানে যাব সেই দিনই যে আমায় ধ'রে ফেলবে। তখন কি উপায় হবে?—হা ভগবান! ··· আপনার মনেই একবার মাথাটা নাড়লাম।

খানসামা-মেয়েটি টেবিলে মাংসের প্লেটখানা দিতে গিয়ে বললে, এখানটায় বেজায় আঁধার, ইচ্ছে করলে আর একটা কামরায় গিয়ে বসতে পারেন।'

জবাব দিলাম, 'না, ধন্যবাদ! এখানেই বেশ আছি।'

মেয়েটির সহৃদয়তা তৎক্ষণাৎ আমার অন্তর স্পর্শ করল। মাংসের দাম তখুনি দিয়ে দিলাম এবং সবগুলি ভাঙানি পয়সা তার হাতে গুঁজে দিয়ে তার আঙুলগুলি নিজেই মুঠো ক'রে দিলাম। মেয়েটি হাসল। কৌতুক ক'রে তাকে বললাম, 'মাংসের দাম দিয়ে বাকি পয়সাটায় তুমি জমিদারী কিনো ··· সত্যি বাকী পয়সাটা তুমিই নিও, খুশি হয়েই দিচ্ছি!'

খেতে শুরু ক'রে দিলাম। লোভীর মতই খাচ্ছিলাম, না, চিবিয়েই সবখানি মাংস একে একে গিলে ফেললাম। এক একবার গালপুরে মাংস নিয়ে না-চিবিয়েই ক্ষুধার্ত পশুর মত তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলাম।

মেয়েটি ফের আমার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল।

'পান করবার জন্যে কিছু চাই কি আপনার?' মেয়েটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল। আমি তার দিকে তাকালাম। ও ভারি লাজুক, খুব নীচু গলায় কথা বলল, একবার চোখও বুজল। বলল, 'আমি বলছিলাম কি একপাত্র 'এল্' পান করুন, না হয় যা আপনার খুশি, তাই নিতে পারেন ··· আমি দিতে পারি ···, পয়সা লাগবে না ··· অবশ্য আপনার যদি কোন আপত্তি ···'

জবাব দিলাম, 'না, ধন্যবাদ। আজ নয়, আর এক সময় হবে।'

পিছন হটে গিয়ে ও টুলখানায় বসে পড়ল। ওর মাথাটা কেবল নজরে এল। কি আশ্চর্য মানুষ!

খাওয়া শেষ হ'তেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। গা বমি-বমি করছিল। আমায় দেখে ও উঠে দাঁড়াল। আমার কিন্তু আলোর সামনে যেতে কুণ্ঠাই হচ্ছিল, কারণ আমার জামা-কাপড় মোটেই জুতসইয়ের নয়, এ অবস্থায় মেয়েটির সামনে যাওয়া ঠিক নয়। কি যে দারুণ অভাবের তাড়নায় তিল তিল ক'রে মরণের পথ ধ'রে চলেছি, ও

ত তা আন্দাজও করতে পারে নি। তাই ওকে সম্ভাষণ জানিয়ে তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলাম।

পেটে খাবার পড়তেই অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করতে লাগলাম। ভারী কষ্ট হতে লাগল। খাবারটা কিছুতেই পেটে ধরে রাখতে পারলাম না। আঁধার কোণ পেয়েই খানিকটা বমি করলাম। এমন ক'রে ক'রে পথ চললাম। বমির ভাবটাকে দূর করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা চলল। মনে হ'ল, এ যেন আমায় একদম খোলস ক'রে ছাড়বে, ফুটপাতে পা ঠুকে ঠুকে লাফ দিয়ে দিয়ে বমির ভাবটাকে দূর করতে চেষ্টা পেলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। চোখের জলে কিছুই দেখতে পারছিলাম না। ভারী দুঃখ হ'ল, কেঁদে কেঁদে পথ চলতে লাগলাম ··· যে নিষ্ঠুর নিয়তি আমায় ক্রমাগত নির্যাতন করছে, সে যেই হোক, তাকে প্রাণপণে অভিশাপ দিলাম, তার যেন নরকেও না স্থান হয়—নরকের চাইতে ভীষণতর কোন জায়গায় যেন অনন্তকাল তাকে এ রকম নির্যাতন সইতে হয়। বাস্তবিক, পুরুষকারের কোনই হাত নেই;—নিয়তি—নিয়তিই মানুষকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ায়! মানুষের কোন শক্তি নেই, কিছু করতে পারে না সে।

একটা লোক একটা দোকানের জানলার দিকে চেয়ে কি দেখছিল। চট করে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম, 'মশায়, বলতে পারেন দীর্ঘকাল অনাহারের পর একটা লোক কি খেতে পারে? তার অবস্থা বড় খারাপ, কিছুই তার পেটে থাকছে না, সবই বমি হয়ে বেরিয়ে আসছে।

লোকটি একটু বিস্মিত হয়ে জবাব দিল, 'শুনেছি এ অবস্থায় লোকে গরম দুধের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে। কার এমন হয়েছে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

বললাম, 'বহু ধন্যবাদ। গরম দুধের ব্যবস্থাটা মন্দ হবে না হয় ত।' এই ব'লে চ'লে এলাম।

পথে যে কাফিখানাটা সব প্রথম নজরে পড়ল সেখানেই ঢুকে পড়ে খানিকটা গরম দুধ নিয়ে চোঁ করে সবটা গিলে ফেললাম। এবং দাম দিয়ে চলে এলাম। এবার ঘরের দিকের রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম।

বাড়ীর কাছে আসতেই এক ভারী মজার ব্যাপার হ'ল। আমার দরজার সুমুখে যে ল্যাম্প-পোস্টটা ছিল তারই নীচে যেখানটায় ছায়াটা পড়েছে ঠিক সেই দিকে পোস্টটা হেলান দিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। দূর থেকেই তাকে চিনতে পেলাম—সেই কালো পোশাক-পরা মেয়েটি। আরও কয়দিন সন্ধ্যাবেলায় ওকে এমনই পোশাকে ওইখানটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ভুল হবার ত কথা, নয়, ঠিক সেই স্ত্রীলোকটিই বটে। আজ নিয়ে ওকে ওই জায়গাটিতে চার দিন দেখলাম। নিশ্চল 'অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে এত অদ্ভুত ঠেকল যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার গতি শ্লথ হ'ল। মাথাটা তখন দিব্য পরিষ্কার, ভাবতে কোনই গোল হচ্ছিল না, কিন্তু এবারে খাওয়ার ফলে উত্তেজনাটা ভারী বেড়ে গেছল, স্নায়ুগুলি যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। যথারীতি তার সামনে দিয়ে চ'লে এসে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে সহসা কেন যেন দাঁড়ালাম। হঠাৎ কি একটা খেয়াল আমায় পেয়ে বসল। না ভেবেচিন্তে সটান স্ত্রীলোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু ক'রে তাকে অভিবাদন করলাম, 'নমস্কার।'

ও 'প্রতি-নমস্কার' জানাল।

ও কি চায়? আরও কয়বার ওকে লক্ষ্য করেছি। ওর কি কোন রকম সাহায্য দরকার? এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নের জন্যে ওর কাছে মাপও চাইলাম।

হ্যাঁ, সে ঠিক জানে না ...

এ বাড়ীতে আমি, আর তিন-চারটি ঘোড়া ছাড়া আর কেউ থাকে না। এ একটা আস্তাবল, একপাশে এককালে কাঁসাপিতলের বাসন মেরামতের দোকান ছিল, সেখানটাতেই আমি থাকি। ... ও যদি এখানে কারুর সন্ধানে এসে থাকে ত ভুল করেছে নিশ্চয়।

ও মাথা নেড়ে বললে, 'আমি কাউকে চাই নে! খামকা দাঁড়িয়ে আছি মাত্র—আমার এ একটা খেয়াল। আমি ...' বলতে বলতে সে থেমে গেল।

তাই কি। একমাত্র খেয়ালের বশে দিনের পর দিন ও ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলাম। যতই ভাবলাম ততই জটিলতা বেড়ে গেল। ওকে নিয়ে একটু খেলব মনে করলাম। পকেটের টাকাগুলি একবার বাজালাম। এবং আর কিছু না ভেবেই ওকে ব'লে বসলাম, 'এসো না কোথাও গিয়ে এক পাত্তর পান করা যাক। ...' খুব ঠাণ্ডাটাই পড়েছে, কেমন, না? হাঃ হাঃ! ... বেশিক্ষণ লাগবে না ... হয় ত ও ...

ও কিছু পান করবে না বললে। ধন্যবাদও জানাল। না। আমার সঙ্গে গিয়ে একপাত্র পান করতেও পারে না ও; আচ্ছা ওকে যদি একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে চাই ত ও কি দয়া ক'রে তাতে রাজী হবে না? ও ... খুব অন্ধকার হয়ে আসছে, কার্ল জোহান পল্লী দিয়ে এত রাত্রিতে ওর পক্ষে একা যাওয়া ঠিক হবে না।

উভয়ে এগিয়ে চললাম; ও আমার ডান পাশে; ব্যাপারটা অদ্ভুত হ'লেও ভাল লাগছিল। একটি নারীর নিকটতম সান্নিধ্য পাওয়ায় মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সারাটা পথ কেবল ওর দিকেই চেয়ে ছিলাম। ওর চুলের গন্ধ, দেহ থেকে যে একটা তাপ বার হয়ে আসছিল তা, বেশভূষার সুগন্ধ এবং প্রতি বারে আমার দিকে চেয়ে ও যে মিষ্টি নিঃশ্বাসটুকু

ছাড়ছিল—সবশুদ্ধ মিলে আমার সকল ইন্দ্রিয়কে একেবারে অবশ ক'রে তুলল। অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়েও ওর পাণ্ডুর মুখখানা ও সমুন্নত বক্ষঃস্থল নজরে এল। ঢিলা জামাটির অন্তরালেই ওর সকল সৌন্দর্য ঢাকা রয়ে গেছে। তাই অবগুণ্ঠন আমাকে একেবারে দিশেহারা ক'রে ফেলল এবং অকারণে নির্বোধের মত আমার সকল অন্তর তৃপ্তিতে ভ'রে উঠল। আর যেন তা সইতে পারছিলাম না। হাতখানা আস্তে আস্তে ওর কাঁধে তুলে দিয়ে জড়ের মত হেসে উঠলাম।

বললাম, 'কি অদ্ভুত তুমি।'

'সত্যি নাকি ? কিসে ?'

প্রথমত, দিনের পর দিন সন্ধ্যাবেলা একটা আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার অভ্যাস ওর আছে, আর তাও বিনা উদ্দেশ্যে, নিছক খেয়ালের খুশিতে।...

ওর হয় ত অমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সুসঙ্গত কারণ আছে, তা ছাড়া, ও হয় ত বেশি রাত্রি পর্যন্ত বাইরে কাটাতে ভালবাসে ; এতে কিন্তু ওর উৎসাহের কিছুমাত্র কমতি দেখা যায় নি। আমি কি রাত বারোটার আগে শোবার নামটি ক'রে থাকি ?

আমি ? দুনিয়ার যদি কোন জিনিস কায়মনোবাক্যে ঘৃণা ক'রে থাকি ত সে হচ্ছে রাত বারোটার আগে শোয়া।

এদিকে ওর অবস্থাও দেখছি আমারই মত। ও প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটু বেড়াতে বার হয়, তখন কোনরকম কাজ থাকে না কি-না। ও সন্ত্ ওলেভ্স্ প্লেশ-এ থাকে।

আমি ব'লে উঠলাম, 'ল্যাজালি !'

'তার মানে ?'

'মানে'—আমি কেবল বললাম—'ল্যাজালি'...মন্দ কি ! তার পর...'

ওর মায়ের সঙ্গে ও সন্ত্ ওলেভ্স্ প্লেশ-এ থাকে। তাই ও বড়

নিঃসঙ্গ। মায়ের সঙ্গে কোন রকম কথাবার্তা চলে না, কারণ সে কালা। কাজেই এই সময়টা একটু বাইরে বেড়িয়ে আসায় কি তেমন কোন খারাপ কাজ করা হয়?

জবাব দিলাম, 'মোটেই না।'

'না। বেশ, তারপর?'

ওর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম যে, ও হাসছে।

ওর একটি বোন আছে না?

হাঁ; বড় বোন। কিন্তু আমি তা জানলাম কেমন ক'রে? সে হামবুর্গ গিয়েছে।

'সম্প্রতি গিয়েছে?'

'হাঁ, সপ্তাহ পাঁচেক আগে।' কার কাছ থেকে জানলাম এ সব কথা? আমি জানতাম না, জিজ্ঞেস করলাম মাত্র।

এর পর কিছুক্ষণ আমরা কথাবার্তা বন্ধ রাখলাম। একটা লোক আমাদের পাশ দিয়ে চ'লে গেল, তার হাতে এক জোড়া জুতো। বলতে গেলে রাস্তায় তখন লোক চলাচল বড় একটা ছিল না। টিভলীতে সারি সারি অনেকগুলি রঙিন আলো জ্বলছিল; বরফও পড়ছিল না, আকাশ দিব্য পরিষ্কার।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, 'আচ্ছা, তুমি ত দেখছি ওভার-কোট গায়ে দাও নি, তোমার ঠাণ্ডা লাগে না?'

ওভার-কোট কেন গায়ে নেই সে কথা ওকে বলব? তা হ'লে যে আমার দুর্দশার কাহিনী শুনে ও ভয়ে এখুনি পালিয়ে যাবে। আজই ত প্রথম, আর আজই শেষ। তা হোক, তবু ওর পাশে হেঁটে বেড়াতে কি আরাম। যতক্ষণ পারি আমার অবস্থাটার কথা ওকে না জানানই ভাল। তাই মুখ দিয়ে মিথ্যাই বার হয়ে এল। বললাম, 'কই, না; তেমন ত

ঠাণ্ডা লাগছে না।' বলেই প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার মতলবে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, টিভলীর নতুন চিড়িয়াখানাটা দেখেছ ?'

ও জবাব দিল, 'না। দেখবার মত কিছু সেখানে আছে না কি ?'

আচ্ছা, ও যদি সেখানে যেতে চায় ? সেখানে আলোরও অভাব নেই, লোকজনও প্রচুর। ও তার মাঝে আমার সঙ্গে গেলে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে আর তখনই ত আমায় আবার ওকে নিয়ে এই কদর্য চেহারা ও নোংরা জামাকাপড় পরেই ফিরে আসতে হবে। ও হয় ত দেখে ফেলেছে যে আমার ওয়েস্ট কোটটা পর্যন্ত নেই। ...

তাই তাড়াতাড়ি ব'লে বসলাম, 'না, তেমন বিশেষ কিছু দেখবার নেই বটে।'

সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় অনেকগুলি মজার মতলব এসে গেল এবং একে একে সেগুলিকে ব্যবহারে আনলাম। সেগুলি আমার রিক্ত নিঃস্ব ফতুর মস্তিষ্কের অসংলগ্ন মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়, অর্থহীন বাক্য মাত্র। বললাম, 'অতটুকু চিড়িয়াখানায় আর এর চাইতে বেশি কি আশা করা যেতে পারে ? মোটের উপর খাঁচায় আবদ্ধ জীবজন্তুদের দেখতে আমার কোন রকম উৎসাহই নেই। পশুরা জানে যে, বাইরে দাঁড়িয়ে কারা সব তাদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে ; তাদের দিকে শত শত কৌতূহলী দৃষ্টির নিক্ষেপ তারা অনুভব করতে পারে ; তারা এ সব বিষয়ে বেশ সচেতন, সব বোঝে, সব জানে। না ; এমন পশুপক্ষী দেখতে আমার ভাল লাগে যারা তাদের যে কেউ দেখছে তা জানে না ; যে সব ভীরু প্রাণী তাদের নীড়ে আরামে থেকে ছোট ছোট সবুজ চোখে মিটমিটি ক'রে তাকায় আর হাত-পা চাটে, আপনার মনে সুখে সচ্ছন্দে বাস করে, তাদেরই দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, অথচ তাদের দেখছি তারা ত জানবে না। হাঁ ; ঠিকই বলেছি আমি।

আমার ভাল লাগে বন্যপশুদের—যখন তারা বনানীর মুক্ত-প্রান্তরে

তাদের জন্মস্থানে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রির অন্ধকারের মসীছায়ায় শব্দহীন সঙ্কুচিত পদচারণ শব্দ—অন্ধকারের বনানীর দৈত্যের মত তারা চলে ফিরে ; উড়ে-যাওয়া পাখীর হঠাৎ-জাগা আর্তস্বর ; রক্তের গন্ধ বাতাসের সঙ্গে, তারি সাথে হাওয়ার হাহাকার ; শূন্যের মহাশায়রে শব্দের নিত্য আবর্ত ; বন্যতার বিলাসভূমিতে হিংস্রতার অধিষ্ঠাতা দেবতার এমনই সব আত্মবিকাশ বড় ভাল আগে আমার ··· ভাল লাগে অজানা ভাষায় অজানার সঙ্গীত ! ··· কিন্তু ভয় হ'ল, পাছে ও বিরক্ত হয়।

আমার সে সুবিপুল দারিদ্র্যের কথা এতক্ষণ ভুলেই ছিলাম, আবার তা নূতন ক'রে জেগে উঠে আমায় যেন একেবারে গিলে ফেলতে লাগল। আজ যদি আমার ভদ্রোচিত পোশাক পরা থাকত তা হ'লে ত একে নিয়ে টিভলীতে বেড়াতে যাওয়ার সৌভাগ্য হ'ত। একে বুঝতে পারছি নে এর কেমন রুচি,—এক অর্ধ-উলঙ্গ ভিক্ষুকের সঙ্গে কার্ল জোহান স্ট্রীট ঘুরে বেড়াল ! কি ও ভাবছে ? আর আমিই বা কেন নির্বোধের মত থামকা ঘুরে মরছি ? এই সুবেশা নারীর ফাঁদে আপনাকে ধ'রে দেবার কি কোন সুসঙ্গত কারণ আছে ? হতে পারে, এতে আমার কিছুমাত্র চেষ্টাও করতে হয়নি, কিন্তু তাই ব'লেও ত বরফের মত কন্‌কনে বাতাস আমায় রেহাই দিচ্ছে না। মাসের পর মাস অনাহারে আজ আমার মাথার কিছুমাত্র ঠিক নেই, মাথা একদম গুলিয়ে গেছে। অথচ ঘরে গিয়ে যে খানিকটা গরম দুধ খাব তারও জো নেই—ও সঙ্গে রয়েছে যে। এই অবস্থায় একমাত্র গরম দুধই আমার সইবে। ও কেন আমায় ছেড়ে দিয়ে যেখানে খুশি চ'লে যায় না ? ···

বুদ্ধি গুলিয়ে গেল ; হতাশায় আমার অবস্থা একেবারে চরম হয়ে উঠল। মেয়েটিকে বললাম, 'ওগো শুনছ, ভেবে দেখলাম, আমার সঙ্গে তোমার বেড়ান উচিত নয়। আমি আসলে যা-ই হই নে কেন, এ জীর্ণ পোশাক-

পরিচ্ছদে আজ যে দুনিয়ায় সকলকার চোখেই আমি একটা পুরাদস্তুর কলঙ্ক। হাঁ, এ একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। কাজেই আমার সঙ্গ যতটা পার এড়িয়ে চলাতেই তোমার পক্ষে মঙ্গল।'

ও আঁত্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি আমার দিকে তাকাল কিন্তু একটি কথাও কইল না। খানিক বাদে হঠাৎ ও বলে উঠল, 'তাই নাকি! তা হোক না, তাতে কি!

আর কিছু বলল না।

ওকে শুধোলাম, 'তার মানে?'

'ওঃ, না, ভারী লজ্জা দিলে কিন্তু। ··· এখনও বেশি দূরে আসি নি। ব'লে ও আর একটু জোর পায়ে হেঁটে চলল।

আমরা ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চললাম। দূর থেকে সস্ত্‌ওলেভ্‌ প্লেশ-এর আলোগুলি নজরে এল। তখন আবার ওর গতি শ্লথ হয়ে গেল।

বললাম, 'ছাড়াছাড়ি হবার আগে তোমার নামটি কি বলবে না? মুহূর্তের জন্যে কি তোমার মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে তোমার মুখখানা দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না? বড় খুশি হব কিন্তু।'

একটু থামলাম। তারপর আশা নিয়ে আবার হাঁড়তে শুরু ক'রে দিলাম।

ও বললে, 'এর আগেও আমায় দেখেছ।'

আমি ব'লে ওঠলাম, 'ল্যাজালি!'

'কি বললে? আর একবারও তুমি আমার পিছু নিয়ে ছিলে। সে দিন বাড়ীর দোর পর্যন্ত এসেছিলে। আচ্ছা, সে দিন কি তুমি নেশা করেছিলে?'

ও হাসল, তাও শুনতে পেলাম।

বললাম, 'হাঁ। একটু বেসামালই ছিলাম বটে সে দিন।'

'কি ভয়ানক লোক তুম !'

অনুতপ্ত হয়ে স্বীকার করলাম, 'আমার অন্যায় হয়েছিল।'

ফোয়ারাটার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। উপরের দিকে চেয়ে দেখি দু নম্বর বাড়ীর জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

ও বললে, 'তোমায় আর এগোতে হবে না, এখান থেকে বিদায় হচ্ছি। এতটা পথ যে আমায় এগিয়ে দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ।'

মাথা নোয়ালাম। আর কিছু বলতে সাহস হ'ল না, মাথা থেকে টুপিটা খুলে নাঙা শিরে ওর সামনে দাঁড়ালাম। ভয় হ'ল করমর্দন করবে কি-না।

ও ওর জুতার গোড়ালির দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললে, 'চল, তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'সে ত আমার পরম সৌভাগ্য ! যাবে, সত্যি ?'

'যাব বটে, কিন্তু বেশি দূর নয়।'

একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। আমার তখন জ্ঞান ছিল কি-না তাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। ও আমার জ্ঞানবুদ্ধি সবই দিলে একদম ওলট-পালট ক'রে। ও যেন আমায় যাদু করেছে। আমি খুব খুশি। আবার মনে হ'ল, যেন সর্বনাশ করবার জন্যেই ও আমায় টেনে নিয়ে চলেছে। ও নিজেই ফিরতে চেয়েছে, আমার ইচ্ছায় নয়, নিছক ওরই খেয়ালে। হেঁটে চলেছি এবং চলতে চলতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সাহস বেড়ে গেল। প্রত্যেকটি কথায় ভঙ্গীতে ও আমায় ওর দিকে আকৃষ্ট করছিল। মুহূর্তের জন্যে আমার দারিদ্র্য, আমার সমস্ত শোচনীয় অবস্থার কথা একদম ভুলে গেলাম। ধমনীতে রক্তস্রোত তীব্র হয়ে বয়ে গেল। আপনার অবস্থাটা কৌশলে বুঝে নেব ঠিক করলাম।

বললাম, 'ভাল কথা, সেবারে ত আমি তোমার অনুসরণ করি নি, সে ত তোমার বোন।'

পরমবিস্ময়ে ও জবাব দিল, 'তাই নাকি, সে আমার বোন!'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ও আমার দিকে তাকাল এবং কি জবাব দিই, শোনবার জন্যে উৎসুক হ'ল। ও খুব ধীরস্থিরভাবেই কথাটা বললে।

জবাব দিলাম, হাঁ, দুজনার মধ্যে যে আমার আগে আগে যাচ্ছিল সে-ই ত ছোট।'

ও আমার কথা শুনেই চেঁচিয়ে হেসে উঠল, 'ছোট? বাঃ, বেশ ত!'

ও ওর সরল শিশুর মত দিলখোলা হাসি হেসে বললে, 'কি দুষ্টু তুমি, ঘোমটা তোলবার জন্যেই ত এ কথা বললে, কেমন কি-না? আমার ত তাই মনে হয়; সে যা-ই হোক, তোমায় আর একটু ভুগতে হবে ··· এই তোমার শাস্তি।'

আমরা উভয়েই হাসতে হাসতে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে করতে চললাম। সারাক্ষণ আমাদের কথার আর বিরাম ছিল না। আমি আনন্দে খুশিতে এতটা তৃপ্ত ছিলাম যে, কি বলেছি তা জানি নে। ও বললে, অনেক দিন আগে নাকি ও আমায় থিয়েটারে দেখেছে। আমার সঙ্গে একজন সঙ্গী ছিল, আমার অবস্থা তখন পাগলের মত। লজ্জার বিষয়, সে দিনও আমি মাতাল হয়ে পড়েছিলাম।

ও কেন তা ভেবেছিল?

ওঃ, আমিও সেদিনে হাসতাম।

'বাস্তবিক; সত্যিই তখন আমিও প্রাণ খুলে হেসেছি।'

'কেন, আজকাল আর হাস না?'

'হাঁ, হাসি বটে, তবে হাসতে গেলে কান্না আসে; যতদিন বেঁচে থাকা যায়, মন্দ কি!'

বলতে বলতে আমরা কার্ল জোহান-এ পৌছলাম। ও বললে, 'আর এগোব না।'

আমরা ইউনিভার্সিটি স্ট্রীট দিয়ে চলতে লাগলাম। যখন আবার সেই ফোয়ারাটার কাছে এসে উপস্থিত হলাম তখন চলার গতি একটু শিথিল ক'রে দিলাম। কেন না, জানতাম, ওর সঙ্গে আর বেশি দূর যেতে পারব না।

ও হেসে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখান থেকেই তোমায় ফিরতে হবে।'

'বেশ। আমিও তাই মনে করেছি।'

মুহূর্ত পরেই কিন্তু ও ভাবলে, সদর দরজা পর্যন্ত আমি ওর সঙ্গে অনায়াসেই যেতে পারি। তাতে ত আর দোষ থাকতে পারে না, পারে কি ?

বললাম, 'না, পারে না।'

আমরা যখন সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম, তখন আমার শোচনীয় অবস্থা আমায় যেন আর তিষ্ঠতে দিচ্ছিল না। দুঃখে কষ্টে যখন কেউ একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে সাহসে বুক বাঁধাটা কেমন ক'রে সম্ভব ? আমি এখানে ছেঁড়া ময়লা পোশাকে অনাহারে বিকৃত চেহারা নিয়ে এক তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, স্নান আহারও হয় নি আমার ; বলতে গেলে একেবারে অর্ধউলঙ্গ আমি, মাটীর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার পক্ষে আমার কি আপত্তি হতে পারে ? আপনা থেকেই নিজের অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারলাম, মাথা নীচু ক'রে ব'লে উঠলাম, 'তা হ'লে কি তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনাই নেই ?'

ও যে রাজী হবে এ ভরসা আমার ছিল না। আমার ধারণা ছিল, ও জোরের সঙ্গেই 'না' বলবে এবং তা হ'লেই আমার চৈতন্য ফিরে এসে এ দিককার ঝোঁকটা কমিয়ে দেবে।

ও শুধু নীচু গলায় বললে, 'হাঁ।'

ওর কণ্ঠস্বর প্রায় অস্পষ্ট।

'কবে?'

'জানি নে।'

চুপচাপ।...

বললাম, 'একবার একটি মিনিটের জন্যে কি দয়া ক'রে তোমার অবগুণ্ঠনটি সরাবে না? এতক্ষণ কার সঙ্গে কথাবার্তা কইলাম তা জানতে চাওয়া নেহাৎ অসঙ্গতও হবে না আশা করি। বেশি ক্ষণের জন্য নয়, মুহূর্তের জন্য মাত্র।'

আবার চুপচাপ। ...

ও বললে, 'আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা এখানেই আমার সঙ্গে দেখা হতে পারে। আসবে?'

'নিশ্চয়, হুকুম যখন পেলাম তখন আর আসব না কেন?'

'এই সন্ধ্যা আটটায় এলেই হবে।'

'বেশ, তাই হবে।

ওকে স্পর্শ করার খাতিরে একবার ওর বোরখাটায় হাত দিয়ে চাপ দিলাম। ও আমার এত কাছে, মনটা খুশিতে ভ'রে উঠল।

ও হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি যেন আমার সম্বন্ধে সব কিছুই খারাপ ধারণা ক'রে বসো না।'

'না।'

হঠাৎ চেষ্টা ক'রেই যেন ও ওর অবগুণ্ঠন কপাল অবধি তুলল। উভয়েই উভয়ের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলাম।

'ল্যাজালি!' চেঁচিয়ে উঠলাম। ও দুই বাহু প্রসারিত ক'রে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করল এবং চট্ ক'রে ডান গালে—ঠিক ডান গালে—একটি মাত্র চুম্বন এঁকে দিল।—ওর বক্ষঃস্থল কেমন দুলে দুলে উঠছিল, আমি তা অনুভব করতে পারি—দপ্ দপ ক'রে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস

পড়ছিল। হঠাৎ নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত ক'রে ও বেদম হয়ে অস্পষ্টভাবে নমস্কার জানাল এবং ফিরে তথ্‌খুলি আর একটি কথাও না ক'য়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। ...

হল-ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল!

*   *   *   *

বরফ পড়ছিল। পরদিন আরও বেশি, বরফের সঙ্গে বৃষ্টির ধারাও মিশে গেছল। বড় বড় এক-একটা বরফের থাওা মাটিতে প'ড়ে কাদার সঙ্গে মিশে কাদা হয়ে যাচ্ছিল। কেমন একটা আর্দ্র বাতাস বইছিল। একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙল। রাত্তিরের সেই উদ্দাম চাঞ্চল্য, সে মিলন, সে সাহচর্যের মাদকতা তখনও আমার ছিল, তাই মাথাটা যেন কেমন গুলিয়ে গেছল। জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে শুয়েও কেন মনে হচ্ছিল, ল্যাজালি আমার পাশেই রয়েছে। আনন্দে উল্লসিত হয়ে দু-হাত বাড়িয়ে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গনবদ্ধ ক'রে শূন্যে চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলাম। শেষে অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে এক কাপ গরম দুধ সংগ্রহ করলাম। এবং সোজা ঘরের বার হয়ে রেস্তোরাঁ থেকে খানিকটা মাংস কিনে খাওয়া গেল। ক্ষুধা নেই বটে, কিন্তু দেহের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি একরকম অসাড় হয়ে পড়েছে যেন।

বাজারে ঢুকে কাপড়ের দোকানের দিকে গেলাম। মনে হ'ল, সস্তায় একটা পুরোনো ওয়েস্ট কোট কেনবার চেষ্টা দেখলে হয়। কোটের নীচে পরবার মত যে কিছুই নেই, একটা কিছু হ'লেই হয়।

সারি সারি জামার দোকান। তারই এক দোকানে একটা ওয়েস্ট-কোট দেখছিলাম। এমন সময় একজন চেনা-লোক এসে সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার নাম ধ'রে ডাকল এবং নমস্কার জানাল। ওয়েস্ট কোটটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে নক্সা তৈরি করে। আপিসে যাচ্ছিল।

আমায় বললে, 'এসো না, এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া যাক। বেশি দেরি করতে পারব না, সময় হয়ে গেছে। ··· কাল রাত্তিরে যে নারীকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলে সে কে হে ?'

তার এ খোলামেলা প্রশ্নে একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'কেন ? ও যদি আমার প্রেয়সী হয় !'

সে বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'তাই নাকি হে !'

কাল যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।'

এ কথা শুনে ও কি করবে কিছুই স্থির করতে পারল না। ও আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে একান্ত ক'রে বিশ্বাস করল। ওর হাত এড়াবার জন্যে একটি চমৎকার মিথ্যা কাহিনী অবলীলাক্রমে বলে ফেললাম। দোকানে ঢুকে বিয়ার দিতে বললাম, চোঁ ক'রে সবটা গিলে ফেলে বেরিয়ে এলাম।

'আচ্ছা, তা হ'লে আসি। ভাল কথা, শোন।' ও হঠাৎ ব'লে উঠল, 'তুমি আমার কাছে কয়েকটা টাকা পাবে। অনেক দিন হয়ে গেল, লজ্জার বিষয়, এতদিন দিতে পারি নি। সে যাই হোক, দিন কয়েকের মধ্যেই দিয়ে দেবো।'

জবাব দিলাম, 'বেশ ভাল কথা।'

আমি কিন্তু জানতাম টাকা কয়টা ও আর দেবে না। বিষয়টা সোজা আমার মাথায় গিয়ে চড়াও হল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলাকার কথা মনে হয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম—বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল। আচ্ছা, মঙ্গলবারে যদি ল্যাজালি দেখা না করে ? যদি সব কিছু ভেবে চিন্তে দেখে ওর মনে সন্দেহ আসে ··· কিন্তু কিসের সন্দেহ ? ··· চিন্তাগুলি একবার ধাক্কা খেয়ে টাকার খাদ দিয়ে বয়ে চলল। ভারী ভয় পেয়ে গেলাম, নিজের জন্যই সাংঘাতিক ভয় পেলাম।

কেমন ক'রে ছেলেটাকে ঠকিয়ে টাকাগুলি আত্মসাৎ করেছিলাম—সবকিছু বিস্তারিতভাবে হুড়মুড় ক'রে মনে পড়ে গেল। কল্পনার চোখে সেই ছোট্ট দোকানখানি, তার সেই কাউণ্টার, টাকাগুলি তুলে নেবার সময় আমার সে কম্পিত হাতখানি—সবকিছু নজরে এল। গ্রেফ্‌তার করতে এসে পুলিশ যে ব্যবহার করবে কল্পনায় আমার সে রূপ দেখতে পেলাম, হাতে পায়ে হাত-কড়া, শিকল, না, কেবল হাতেই হাত-কড়া পরাবে; হয় ত এক হাতেই শুধু কড়া লাগাবে; আদালতের সেই এজলাস, কাঠগড়া, জবানবন্দী, বিচারকের রায় লেখা, তার গুরুগম্ভীর ভীতিপ্রদ দৃষ্টি, তারপর ট্যানজেন মহাশয়ের কারাগারের সেই চির-অন্ধকার কুঠরিতে অধিষ্ঠান ···

দূর হোক গে! হাতের মুঠো শক্ত ক'রে ধ'রে মনে সাহস আনলাম এবং জোর পায়ে এগিয়ে অবশেষে বাজারে পৌঁছে সাম্‌নেকার একটা আসনে বসে পড়লাম।

ধরে নেওয়াটা ছেলেখেলা নয়, ধরলেই হ'ল কি-না। কে বলবে যে আমি চুরি করছি, প্রমাণ? তা ছাড়া, ছেলেটা কারুর কাছে এ কথা বলতেও সাহস পাবে না। একদিন না একদিন তার একথা মনে হতেও পারে, কিন্তু তখন যে আর কোন উপায়ই থাকবে না, কেন না, এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে তার চাকরি যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা, চাকরিটা ওর কাছে ঢের দামি

কিন্তু সে যাই হোক, এ টাকাটা পকেটে রেখে আমার মোটেই স্বস্তি ছিল না, পাপের জগদ্দল পাথরের মতই এটা ভারী ঠেকছে। আপনার মনে নিজরই সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। স্পষ্ট মনে হ'ল, আগে আমি ঢের বেশি সুখী ছিলাম। তখন হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সম্মানের সঙ্গে দিন কাটাতাম। আর ল্যাজালি? যদি তাকে আমার এই পাপের হাতে স্পর্শ না করতাম। ভগবান, ভগবান,

ল্যাজালি। আমি যেন তখন পাঁড় মাতাল। হঠাৎ লাফ দিয়ে ডাক্তারখানার সামনে যে এক বেটী কেকবিস্কুট বিক্রি করছিল তার কাছে চলে গেলাম। এখনও ত নিজেকে সকল অসম্মানের উর্ধ্বে তুলতে পারি, এখনও সময় আছে; জগৎকে দেখাব যে আমি তা পারি।

বুড়ীর কাছে যেতে যেতে পকেট থেকে টাকাটা হাতের মুঠোয় তুলে নিলাম। এবং বুড়ীর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লাম, যেন আমি কিছু কিনব। বিনা বাক্যব্যয়ে বুড়ীর হাতে টাকা-পয়সাগুলি গুঁজে দিলাম। একটি কথা না ব'লেই পিছন ফিরে চলে গেলাম।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সত্যি নিজেকে এখন সাধু বলেই মনে হ'ল। ট্যাঁক একেবারে খালি কিন্তু তাই ব'লে মনে কোন অস্বস্তিই আর রইল না। আমি যে এখন টাকাটা দিয়ে ফেলে হাত সাফ করতে পেরেছি, এ কথা মনে হতেই ভারী তৃপ্তি হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটা আপনার মনে বিচার ক'রে দেখে মনে হ'ল, এই টাকাটা সত্যিই আমার মনে একটা অশান্তি এনে দিয়েছিল, অথচ সেটা আমি এতক্ষণ বুঝতে পারি নি। এই টাকাটার কথা যতই ভেবেছি ততই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির সঞ্চার হয়েছে। আমি ত আর নিষ্ঠুর নই, আমার স্বভাবত মানী স্বভাব এই হীনকাজে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ভগবান, তুমিই সত্যি, আবার আমার নিজের বিচারে আমি ঠিক জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। বাজারে তখন লোকের ভিড় জমে গেছে, সেই দিকে তাকিয়ে নিজেই নিজেকে মনে মনে ব'লে উঠলাম, 'আমি যে রকমটা করলাম, তোমরাও সে রকম ক'রো!' এক বুড়ীকে এমন খুশি ক'রে ফেলতে পেরেছি যে, সে আর কথাটিও কইতে পারল না। আজ ওর ছেলেমেয়েরা পেটভরে খেতে পাবে নিশ্চয়। ··· একথা ভাবতেই আমার মনে এতটা আনন্দ হ'ল যে, মনে হ'ল আমি যা করলাম তা সকলেরই আদর্শ।

ভগবান তুমিই সত্য। টাকা-পয়সা আর ট্যাঁকে একটিও নেই।

আধ-মাতাল ও আধ-ভীত হয়ে সারাটা রাস্তা ঘুরে বেড়ালাম এবং আত্মপ্রসাদে আমার অন্তরটা ভ'রে গেল। ল্যাজালির সঙ্গে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ মন নিয়ে যে দেখা করতে পারব সে ভরসায় প্রাণে বড় আনন্দ হ'ল। তার মুখের দিকে তাকাতে যে এখন আর আমার কোনই সঙ্কোচ নেই—এই কথাটাই বার বার ভাবছিলাম। কোন রকম ব্যথাবেদনা সম্বন্ধেই তখন আমার কোন জ্ঞান ছিল না। মাথাটা বেশ পরিষ্কার। মনে হ'ল যেন মাথার কোন গলদই আর নেই। উন্মাদের মত আচরণ আমার কিছুতেই ভাল লাগল না। ছেলেমানুষী ক'রে গোটা শহরটাকে মাতিয়ে তুলতে স্বতই আমার অনিচ্ছা হ'ল। সারাটা রাস্তা পাগলের মত চললাম। কান দিয়ে বোঁ বোঁ শব্দ হচ্ছে, দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে বসেছে, তখন যেন আমি একেবারে মাতাল। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, দৌড়ে গিয়ে পাহারাওয়ালাটাকে আমার বয়সটা ব'লে বসলাম। সে কিন্তু একটি কথাও কইল না। সহসা তার হাত দুখানা ধরে তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম, কিন্তু পরক্ষণে তার হাত ছেড়ে দিয়ে, কিছু না বলে চলে এলাম। প্রত্যেকটি পথচলতি লোকের কণ্ঠস্বর ও হাসি ঠাট্টার সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ কানে আসছিল। রাস্তায় ছোট ছোট পাখীগুলি আপনার মনে এখানে সেখানে কি সব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, কিছুই চোখ এড়াল না। ফুটপাথের প্রকাণ্ড পাথরগুলি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে চললাম—তাতে কত বিচিত্র দাগকাটা, এখানে-সেখানে কি যা-তা সব ছড়িয়ে রয়েছে। এমনি ক'রে পার্লামেণ্ট প্লেশ-এ পৌছলাম। সহসা কি মনে ক'রে স্থাণুর মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে দিয়ে কত বিচিত্র রঙের ও বিভিন্ন আকারের মোটর, বাস, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম যাওয়া-আসা করছে; কোথাও বা গাড়োয়ান-কোচোয়ান, ড্রাইভার, সহিস মিলে গল্পগুজব করছে, তাদের সে

দিল-খোলা উচ্চহাস্য দেখে মনে হ'ল, তাদের যেন কারুরই কোন দুঃখ নেই, অভাব নেই। শীতে ঘোড়াগুলি ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে, চলতে তাদের একান্ত অনিচ্ছা, কিন্তু চাবুক তাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গা-ঝাড়া দিয়ে নিজেই নিজেকে বললাম, 'এগিয়ে চল।' সামনেই যে গাড়ীখানা পেলাম তাতে উঠে পড়েই কোচোয়ানকে ৩৭ নং উল্লেভোজ্ন্স্ভোন-এ পৌঁছে দিতে বললাম। গাড়ী এগিয়ে চলল।

কোচোয়ান বিস্মিত হ'য়ে বার কয়েক আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। ও কি আমায় সন্দেহ করছে না কি? হাঁ, তাতে কিমাত্র সন্দেহ নেই; আমার এ নোংরা পোশাকই ওর দৃষ্টিকে আমার দিকে আকৃষ্ট করেছে।

আপনা থেকেই যেচে ওকে বললাম, 'একজনার সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।' আমার যে কি দরকার তাও গম্ভীরভাবে তার কাছে বর্ণনা করলাম। সাইত্রিশ নম্বরের সামনে আসতেই গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তেতলায় গেলাম এবং একটা ঘরের কড়া ধরে নাড়লাম। কড়া নাড়ায় ভিতরেও একটা বিশ্রী শব্দ হ'ল।

একটা ঝি এসে দোর খুলে দিল; তার কানে সোনার ইয়ারিং আর গায়ে ধূসর রংয়ের বডিস, তাতে সুন্দর সুন্দর চারটি কালো বোতাম। সে যেন ভয়ে ভয়েই আমার দিকে তাকাল।

তাকে বললাম যে, আমি কিয়েরল্ফকে চাই।

বোয়াচিন কিয়েরল্ফ্—যে-সে লোক নয়, তাকে ভুল হবার জো নেই।...

মেয়েটি মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'ও নামের ত কেউ এখানে থাকে না।'

আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে সে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত

হ'ল। লোকটিকে খুঁজে দেখবার মেহনতটুকুও সে নিতে চাইল না। সে এমন ক'রে আমার দিকে তাকাল যে, আমি যাকে চাইছি, সে যেন তাকে সত্যই জানে, একবার সামান্য একটু ভেবে দেখলেই যেন তার পাত্তা মিলবে। পাজী কোথাকার! কুঁড়ের বাদশা! ভারী বিরক্ত হলাম, তখ্‌খুনি পিছন ফিরে হন্‌ হন্‌ ক'রে নীচে নেমে এলাম।'

কোচোয়ানকে গিয়ে বললাম, 'সে এখানে নেই।'

'তিনি কি এখানে থাকেন না ?'

'না, টম্‌টেগ্যাদেন-এ নিয়ে চল, এগার নম্বরে।'

আমি তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কোচোয়ানটার মনেও ঠিক আমারই ভাবটা চারিয়ে দিলাম। ওর মনে হ'ল আমার দরকারটা হয় ত খুবই জরুরি, তাই সিধা গাড়ী হাঁকিয়ে চলল, আর কোন প্রশ্ন করল না। ঘোড়াটা অনর্থক চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত হ'ল।

কোচবাক্স থেকে পিছন ফিরে কোচোয়ান আমায় শুধালে, 'ভদ্র লোকের কি নাম বললেন ?'

'কিয়েরুল্‌ফ্‌—পশমের কারবার করে।'

কোচোয়ানেরও যেন কেন মনে হ'ল যে, এর সম্বন্ধে কোন ভুলই কারুর হতে পারে না।

'আচ্ছা, তিনি কি সচরাচর একটা ডোরা-কাটা কোট প'রে থাকেন ?'

চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম, 'সে কি! ডোরা-কাটা কোট? তুমি কি পাগল হয়েছ, এ কি চায়ের বাটী যে ডোরা-কাটা হবে ?'

ডোরা-কাটা কোটের প্রসঙ্গটা বড় অসময়ে উপস্থিত হ'ল। এতে লোকটার সম্বন্ধে আবার যে ধারণা হয়েছিল তা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল,

কেন না, এর পর আমার সে না-দেখা মানুষটি সম্বন্ধে আমার আর কোন উৎসাহই রইল না।

'ভদ্রলোকের নাম না কি বলছিলেন?—কিয়েরুল্‌ফ্‌?'

'হ্যাঁ', জবাব দিলাম। 'তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? নামটায় ত কারুর অসম্মান করছে ব'লে মনে হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, তাঁর মাথার চুল কি লাল?'

তা—তা হতে পারে। তার লাল চুলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোচোয়ানের ইঙ্গিত আমার মনে হ'ল যে লোকটা ঠিকই বলেছে। বেচারা কোচোয়ানের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল। তাই তক্ষুনি তাকে বললাম, আমি যাকে খুঁজছি কোচোয়ানও তাকে ঠিকই চিনেছে। এও তাকে বললাম যে, ভদ্রলোকের চুল যদি লাল রঙের নাই হয় ত সেটা যে নেহাতই অদ্ভুত ব্যাপার হবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

'আমি যাঁর কথা বলছি, তিনিই যদি হন ত বলতে পারি, তিনি অনেকবার আমার গাড়ী ভাড়া খাটিয়েছেন। তাঁর হাতে সব সময়েই একগাছা মোটা লাঠি থাকে।

এর থেকে লোকটি সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ক'রেই ধারণা জন্মাল। 'হাঁ, হাঁ! ঠিক বলেছ, তিনি কখনও মোটা লাঠি ছাড়া চলেছেন, এ কথা কেউই বলতে পারবে না। তুমি ঠিক ধরেছ, সত্যিই তাই।'

সত্যিই, তিনি এর গাড়ী ইতিপূর্বে বহুবার ভাড়া নিয়েছেন। কোচোয়ান তাঁকে ঠিক চিনতে পেরেছে। কেন না, সে এমন তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে যে ঘোড়ার খুরে আগুন ছোটে।

এই দারুণ উত্তেজনার মুখেও কিন্তু মুহূর্তের জন্য আমি জ্ঞান হারাই নি। যেতে যেতে তার নম্বরটা আমার নজরে পড়ল—উনসত্তর। তৎক্ষণাৎ এই 'উনসত্তর' সংখ্যাটা আমায় একেবারে পেয়ে বসল—এমন-

ভাবে পেয়ে বসল যে, ওটা যেন তীরের ফলার মত গিয়ে আমার মগজ ভেদ ক'রে বসল—উনসত্তর, ঠিক উনসত্তর। এ সংখ্যাটা আমার কখনও ভুল হবে না। সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে বসেছিলাম, এবং কত রকম উদ্ভট কল্পনাই না আমায় একান্ত ক'রে পেয়ে বসল; গাড়ীর এককোণে গুড়িশুড়ি মেরে এমনই ক'রে বসলাম যেন কেউ না আমায় দেখতে পায়। আপনার মনেই নিজের সঙ্গে বোকার মত ঠোঁট নেড়ে কথা কইতে শুরু ক'রে দিলাম। একটা উন্মাদনা এসে আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলল এবং তাকে ছাড়া দিলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম যে, যে শক্তি আমায় অভিভূ ক'রে ফেলেছে তাকে সংযত করবার মত কোন শক্তিই তখন আমার নেই। অনুরাগের সঙ্গে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। বলা বাহুল্য, সে হাসির কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। যে কয় গ্লাস বিয়ার পান করেছিলাম তারই নেশা আমায় একটা অননুভূত পুলক এনে দিল। একটু একটু ক'রে উত্তেজনা কমে এল, ক্রমে শান্ত হয়ে এলাম। আহত আঙুলটা শীতে কন্‌কন্‌ করছিল, তাই সেটাকে একটু গরম করবার জন্যে কোটের কলারের মধ্যে দিয়ে হাত দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে টম্‌টেগ্যাদেন-এ এসে পৌছলাম। কোচোয়ান গাড়ী থামাল।

তাড়াহুড়ো না ক'রে অন্যমনস্কভাবে নিঃশব্দে মাথা নীচু ক'রে গাড়ী থেকে নামলাম। সোজা একটা ফটকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে একটা আঙিনায় পৌছলাম। আঙিনা পাড় হয়ে সামনেই একটা ছোট্ট পথ-প্রকোষ্ঠ, তাতে দুটো জানালা আছে। এককোণে দুটো বাক্স, একটার উপর আর একটা সাজান, আর এক পাশে দেয়াল-ঘেঁষে একখানা খাটের উপর কম্বল বিছানো। ডান দিকে আর একটি ঘরে লোকজনের কথাবার্তার ও একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম এবং দোতলায় ঠিক আমার মাথার উপরে লোহার পাত পিটানোর শব্দ কানে এল। ওখানে ঢুকেই এ সব লক্ষ্য করলাম।

বলা বাহুল্য, পালাবার উদ্দেশ্য আমার আদৌ ছিল না, তবু ঘরের মধ্যে গিয়ে অলসমন্থর গতিতে অপর দিককার দরজাটা খুলে ফেললাম। দেখি আর একটা রাস্তায় এসে পড়েছি। সে বাড়ীটার মধ্যে দিয়ে চলে এলাম, একবার পিছন ফিরে সে বাড়ীর দিকে তাকালাম—লেখা আছে, 'পথিক-জনের থাকা ও খাওয়ার স্থান।'

কোচোয়ানটা তখনও আমার প্রতীক্ষা করছিল জানি, কিন্তু তাকে কোনরকম ঠকাবার বা পালাবার মতলব আমার মোটেই ছিল না।

স্থিরভাবে রাস্তা বেয়ে চললাম, মনে কোন আশঙ্কা নেই, কোন রকম অন্যায় করছি তাও আমার মনে হ'ল না। যে পশমওয়ালার নাম এতক্ষণ আমার মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে ছিল—এই ব্যক্তি, যার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা আমার একান্ত প্রয়োজন ব'লে মনে করেছি—তার কথা সহসা আমার স্মৃতি থেকে আপনা থেকেই অন্তর্ধান করল। যেমন আরও কত উন্মাদ খেয়াল এসেছে, আবার চ'লে গিয়েছে—ঠিক তেমনই। এটা একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মতই আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল, তার কথা আর মনেও করলাম না।

সামনের দিকে এগিয়ে চললাল। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে আমার মধ্যে একটা স্থৈর্য এসে গেল। দারুণ অবসাদে ক্লান্তিতে পা দুটোকে যেন আর বয়ে নিতে পারছিলাম না। তখনও চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা—বরফ ঝরছে। এমনি করে গ্রোনল্যাণ্ড-এ এসে পৌছলাম, গীর্জার অদূরে রাস্তার একপাশে এক বেঞ্চিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। পথ-চল্‌তি লোকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি তখন গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেছি।

ভগবান, আর কত দুঃখ দিবে? কি নির্মমভাবেই না আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এ দুঃখকষ্টের বোঝা যে আর সইতে পারছি বে দয়াময়!

চরম শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁচেছি—আর যে সইতে পারি নে ঠাকুর! অনাহারে অনিদ্রায় অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তায় শরীর-মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। কি ছিলাম, আর কি হয়েছি, এই কঙ্কালসার দেহ! চোখ কোটরে ঢুকেছে, গাল ভেঙেছে, বুকে লাগে এ জন্ত খাড়া হয়ে হাঁটতে পারি নে। একদিন সারা দুপুরে কুঠরিতে বসে সর্বাঙ্গ পরীক্ষা ক'রে কেবলি কেঁদেছি। কয় সপ্তাহ আগে যে এই শার্টটি পরেছি বলতে পারি নে। ঘামে ধুলোয় কি বিশ্রীই না হয়েছে। আহত স্থানটা থেকে সামান্য একটু রক্ত জলের সঙ্গে মিশে বার হয়ে এসেছে। ঘা খুব বেশি নয়, কিন্তু পেটের মত দেহের কোমল অংশে সামান্য ঘা থাকলেও ভারী যন্ত্রণা দেয়। ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করতে পারি নি, আপনা থেকেই যে এটা সেরে যাবে তারও কোন লক্ষণ দেখছি নে। একান্ত সাবধানতার সঙ্গে আহত জায়গাটা ধুয়ে মুছে শার্টটা আবার গায়ে দিলাম। এ ছাড়া আর যে কোন উপায়ই নেই, কেন না, এটা ...

এই সব নানা বিষয়, আরও কত কি সব ব'সে ব'সে ভাবলাম। মনটা ভারী বিষণ্ণ। নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা এল। হাত দুটোও যেন আমার কাছে ভারী ফাল্‌তু বলে মনে হচ্ছিল। কাঠির মত হাতের সরু সরু কদাকার আঙুলগুলি, হাতের শিরা ফুলে যেন ঝুলে পড়েছে—দেখে দুঃখও হ'ল, আবার বিতৃষ্ণায়ও মনটা ভ'রে উঠল। আমার সে দুর্বল বিশীর্ণ কাহিল দেহটার প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা এসে আমায় আচ্ছন্ন ক'রে দিল, এ দেহের ভার যেন আর বইতে পারছিলাম না। ভগবান, যদি এই মুহূর্তেই এই দুঃখকষ্টের অবসান হয়, তা হ'লে সানন্দে সাগ্রহে আমি মরতে পারি।

নিজের বিচারে নিজেকে একটা পরম অপদার্থ, হেয়, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত ব'লে মনে হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত উঠে বাড়ী-মুখো হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। পথে চলতে চলতে একটা দরজার

গায়ে পাথরে লেখা আছে দেখতে পেলাম—'ডান দিকে মিস্ য়্যাণ্ডার্-শনের কাছে জামাকাপড় তৈরি হয়।'

হ্যামার্সবার্গ-এ আমার সেই পুরানো ঘরখানার কথা মনে হ'ল, মনে হ'তেই আপনার মনে বিড়্ বিড়্ ক'রে ব'লে উঠলাম, 'পুরোনো স্মৃতি! আমার সেই চিলেছাদের সেই কুঠরি, সেই দোলা চেয়ারখানা, সেই পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া দেয়াল—যাতে বাতিঘরের ও রুটি-ওয়ালার বিজ্ঞাপন শুয়ে শুয়েও পড়তে পেয়েছি—সব একে একে মনে পড়ল। সত্যি বলছি, আমার তখনকার অবস্থা এখনকার চাইতে ঢের ভাল ছিল। তখন এক রাত্রিরে একটা গল্প শেষ ক'রে দশটা টাকা পেয়েছিলাম, আর আজ কিছুই লিখতে পারি নে। লিখতে গেলেই মাথা যেন একেবারে ফাঁকা ব'লে মনে হয়। এ আর সইতে পারছি নে, এখনই এর শেষ ক'রে ফেলব। বলতে বলতে আপনার মনে হেঁটে চললাম।

খাবারের দোকানের যতই কাছাকাছি হলাম, ততই একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু করতে লাগল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অটল রইলাম। একেবারে খোলসা হতে চাই। ত্বরিতপদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম। এক বালিকা চায়ের বাটী নিয়ে যাচ্ছিল, দরজার সামনে তার সঙ্গে দেখা হ'ল। তাকে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দোকানী-ছেলেটা আর আমি আর একবার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম।

ছেলেটা বলে উঠল, 'নমস্কার! ভাল ত! দিনটা কি বিশ্রী হয়েছে, তাই না?'

ওর এ কথার অর্থ কি? ও কেন দেখতে পেয়েই আমায় পাকড়ালে না? ভারী রাগ হ'ল, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, 'আমি তোমার সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে আসি নি, বুঝলে!'

শুরুতেই ও কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমার এ রকম মেজাজ দেখাবার কি কারণ ও তা বুঝতে পারল না। আমি যে ওকে দশ শিলিং ঠকিয়েছি এটা ওর মনে কিছুতেই এল না।

অধীরভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি তবে জান না যে, আমি তোমায় ঠকিয়ে টাকা গাপ্ করেছি?' উত্তেজনায় রাগে আমি থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিলাম। ও যদি না বুঝতে চায় ত গায়ের জোরে ওকে তা বোঝাতে প্রস্তুত হলাম।

কিন্তু ছোক্‌রার ত্রুটি যে কোন্‌খানটায় তা সে ধরতেই পারলে না।

কি দুর্ভাগ্য! দুনিয়ায় থাকতে হ'লে মানুষকে কত রকম নির্বোধের সঙ্গেই না চলতে হয়! ছেলেটাকে গালাগালি দিলাম, কেমন ক'রে ব্যাপারটা ঘটেছিল, একে সব খুলে বললাম, কেমন ক'রে কোথায় কখন নোট দেওয়া হয়, আমি কেমন ক'রে মাঝখান থেকে টাকাটা পেয়েছিলাম—সব। ছেলেটা নীরবে সব কথা শুনে গেল। তার মনে ভারী অস্বস্তি এল, পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমায় চুপ করবার জন্য ইঙ্গিত করে, বলল, 'একটু আস্তে কথা বলুন।' তারপর বলল, 'অমনি ক'রে টাকাটা নেওয়া কি আপনার সঙ্গত হয়েছে?—এ যে দস্তুর মতো ঠকানো!'

তাকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলাম, 'না, শোন বলছি। আমায় যতটা নীচ মনে করছ, আসলে আমি ততটা নীচ নই, বুঝলে মুখ্যু কোথাকার! আমি ত তার সে টাকাটা নিজের জন্যে রাখি নি; অন্যের টাকা গাপ্ করবার মতলব আমার কখনও আসতেই পারে না। অমনি ক'রে টাকা যোগাড় করতে আমি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করি, কেন না, তা আমার স্বভাবত সাধু চরিত্রের বিরোধী।'

'তা হ'লে সে টাকা কি হ'ল?

'এক বুড়ী ভিখিরীকে দিয়েছি—সবটা।' ও বুঝুক, আমি ওই রকমের লোক ; গরীবকে কখনও ভুলে যাই নে। ...

ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবল, আমি সত্যি সাউকার কি-না। তারপর ও বলল, 'টাকাটা কি ফেরত দেওয়া আপনার উচিত ছিল না ?'

বললাম, 'শোন কথা। তোমায় কোন রকমে বিপদে ফেলার ইচ্ছা আমার নেই কি-না, তাই দেখছি মানুষের ভাল করতে গেলে এ রকম ধন্যবাদই মিলে। নিজে এসে সব ব্যাপার তোমায় খুলে বললাম, কোথায় তুমি নিজের কাজের জন্যে লজ্জিত হবে, তা নয়, উলটে আবার আমায় অভিযোগ করছ ! তা যাক, আমি ত ব'লে খালাস, তারপর তুমি গোল্লায় যাও, বা যেখানে খুশি যাও, তা দেখবার আমার দরকার নেই। চললাম আমি।'

ঘরের বার হয়ে দরজা টেনে দিলাম। কিন্তু যখন আমার সে আনন্দহীন কুঠরিতে ঢুকলাম—তখন অল্প অল্প বরফ পড়ে সর্বাঙ্গ আমার ভিজে গিয়েছে, সারাদিনের হাঁটা-হাঁটিতে হাঁটুদুটো দস্তুর মত কাঁপছে। সওয়ার থেকে নেমে একদম বিছানায় নেতিয়ে পড়লাম।

বেচারা ছেলেটার উপর যে অনর্থক চড়াও হয়েছিলাম তার জন্যে ভারী অনুতাপ হ'ল, একেবারে কেঁদে ফেললাম। তাতেও কিন্তু মন শান্ত হ'ল না। ছেলেটার প্রতি ও রকম দুর্ব্যবহার করায় নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যে নিজের গলা টিপে ধরলাম। আমি যেন তখন একেবারে বদ্ধ পাগল। বেচারা ভয়ে কিছু বলতেও পারলে না, পাছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে তার চাকরিটি যায় ! এতগুলি টাকা যে ক্ষতি হ'ল তা নিয়েও ভয়ে কোন রকম গোলমাল করতে সাহস পেলে না। আর তাই, ওর সেই ভয়ের সুযোগ নিয়ে দুর্ব্যবহারের

চূড়ান্ত ক'রে ছাড়লাম। দারুণ উত্তেজিত হয়ে যে কথাগুলি চেঁচিয়ে ওকে বলেছি, তা সুতীক্ষ্ণ ছুরিকায় মত ওর মর্ম বিদ্ধ করেছে। সম্ভবত তখন দোকানী ভিতরে তার ঘরে উপস্থিত ছিল। আর একটু হ'লেই হয় ত সে বাইরে বেরিয়ে এসে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করত। নাঃ, এমন ক'রে ত তার চলছে না; এতটা অধঃপতন আমার হয়েছে, যে-কোন নীচ কাজ করতেও এখন আর আমার এতটুকু বাধে না!

আচ্ছা, আমায় উন্মাদ ব'লে শিকল দিয়ে বাঁধে না কেন? তা হ'লে ত সকল অশান্তির সমাপ্তি ঘটে! বন্ধনের জন্যে প্রায় ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তখন বাঁধলে এতটুকু বাধাও আমি দিতাম না, বরং তাদের সাহায্যই করতাম। ভগবান, জীবনে আর একদিন আর একটি শুভ মুহূর্ত আমায় দাও! এই শেষ প্রার্থনা আমার পূরণ কর দয়াময়! ...

গায়ের জামা-কাপড় সবই ভিজা আর সেই অবস্থাতেই বিছানায় পড়ে রইলাম। মনের মধ্যে একটা অনিশ্চিত ধারণা এসে গেল যে, রাত্তিরেই হয় ত আমার এ ব্যর্থ জীবনের শেষ হয়ে যাবে। তাই বিছানাটা ঝেড়ে ঝুড়ে নেবার জন্যে একবার চেষ্টা করলাম। সকাল বেলা যেন লোকেরা সব কিছুতে একটা শৃঙ্খলা দেখতে পায়। হাত মুঠো ক'রে অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাজালির কথা মনে পড়ে গেল। গোটা সন্ধ্যাটা ত তার কথা ভুলে যেতেও পারতাম! সঙ্গে সঙ্গেই মনের কোণে ক্ষীণ আলো যেন দেখা গেল—সামান্য একটু সূর্যালোকে যেন আমায় ধন্য করল; একটা সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ আলোক-রেখা আমায় একান্ত প্রীতির সঙ্গে আদর ক'রে আমার মনের সব ব্যথা দূর ক'রে দিল। ক্রমে সূর্যালোক তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হ'ল, কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে, দুর্বল

মগজ যেন সেই উগ্রতার তাপে সিদ্ধ হচ্ছিল। আর শেষটায় একটা পাগল-করা আলোক-শিখা লেলিহান হয়ে আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠল। স্বর্গে-মর্ত্যে এক সঙ্গে যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল, নর-নারী, পশু-পাখী, পাহাড়-পর্বত, দৈত্য-দানব—সব যেন এক বিরাট অগ্নি, চারিদিকে অসীম অনন্ত অগ্নিশিখা, সর্বত্র এক প্রচণ্ড আগুনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, বিশ্ব যেন পুড়ে ছাই হ'ল—চারিদিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন—বিশ্বের যেন আজই শেষ হয়ে যাবে!

তারপরর আর কিছুই জানি নে। ...

* * *

পরদিন ঘুম থেকে যখন জেগে উঠলাম, দেখি ঘামে একেবারে ভিজে গেছি, চারদিক স্যাঁৎসেঁতে, যেন এই মাত্র স্নান ক'রে উঠেছি। ভীষণ জ্বর হয়েছিল। প্রথমটায় আমার যে কি হয়েছিল কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম না। বিস্ময়ে অবাক হয়ে নিজের দিকে তাকালাম, মনে হ'ল, আমি যেন একদম বদলে গেছি, নিজেকে আর কিছুতেই চিনে উঠতে পারছিলাম না। তবে হাত-পায়ের অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম বটে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জানলাটা যেখানটায় ছিল ঠিক সেখানটাতেই রয়েছে, জায়গা বদল হয় নি; আর নীচে আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের শব্দও কানে আসছিল, প্রথমটা মনে হচ্ছিল যেন শব্দটা দূর থেকে আসছে। নিজেকে ভারী পীড়িত মনে হচ্ছে—গা বমি-বমি করছে। মাথার চুল ভিজে গেছে, সেই ভিজে চুল কপাল অবধি এসে পড়েছে, তাতে কপালে ভারি ঠাণ্ডা লাগছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বালিসের দিকে তাকালাম, মাথার চুল এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। জুতো পরেই শুয়েছিলাম, পা ফুলে গেছে কিন্তু তার জন্য ব্যথাবেদনা অবশ্য কিছুই নেই, তবে পায়ের গোড়ালি ফুটো আরম্ভ হয়ে গেছে, নাড়াচাড়া করতে পারছি নে।

বিকেল হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে আঁধার হয়ে আসছিল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং ঘরের মধ্যেই একটু পাইচারি আরম্ভ ক'রে দিলাম। পাইচারি করবার পক্ষে ঘরের মেঝেটা অত্যন্ত সংকীর্ণ, কাজেই খুব সাবধান হয়েই পা চালাতে হচ্ছিল, কেন-না, নইলে দেয়ালে হোঁচট্ লাগার সম্ভাবনা ছিল পদে পদে। ব্যথাবেদনা তখন তেমন একটা ছিল না, সুতরাং কান্নাকাটি করবারও দরকার হয় নি। সমস্ত অবস্থাটা মিলিয়ে দেখতে গেলে বিষণ্ণ হবার মত কোন হেতুই ছিল না। বরং একটা পরম তৃপ্তিই অনুভব করছিলাম। খুশি না থাকা ছাড়া যে আর কিছু হতে পারা যায়, এটা ঠিক তখন আমার মনে হয় নি।

তারপর বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

তবে একটা জিনিস আমার মনে একটু অস্বস্তি এনেছিল, সে হচ্ছে ক্ষুধা। যদিও খাবারের কথা ভাবতেই গা বমি-বমি করছিল। আবার সেই নির্লজ্জ ক্ষুধার জ্বালা সম্বন্ধে তীব্রভাবেই সচেতন হ'তে লাগলাম। জ্বালা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে লাগল; তার সে নিষ্ঠুরতা আমায় একেবারে যেন শেষ ক'রে দিচ্ছিল। আমার বইরেটা দেখে কিছুই জানবার বা বুঝবার জো ছিল না, ভিতরে ভিতরে আমায় নিকাশ ক'রে ফেলছিল। মনে হ'ল, যেন কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র পোকা দৈত্যের মত আমার দেহে প্রবেশ ক'রে দেহটা খুঁড়তে লেগে গেছে, তাদের সে অবিরাম দংশনে ক্ষান্ত দিয়ে আবার তারা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল এবং তারপর আবার নতুন উদ্যমে খুঁড়তে শুরু ক'রে দিল—নীরবে, যেন কোন তাড়াহুড়ো নেই, যেন পথ চলতে চলতে তারা জিরিয়ে নিচ্ছে। ...

অসুস্থ নই বটে, কিন্তু নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। ঘাম হচ্ছিল। খানিকটা জিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বাজারের দিকে যাব ঠিক করলাম। কিন্তু সে যে অনেকটা পথ আর অতটা পথ চলবার মত উৎসাহও তখন

আমার ছিল না, তাই অনেক কষ্টে শেষটায় গিয়ে প্রায় সেখানে পৌঁছলাম। বাজারের যে কোণটা মার্কেট স্ট্রীটের দিকে, সেখানটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কপালের ঘাম ঝর ঝর ক'রে ঝ'রে মুখ বেয়ে ছড়িয়ে দৃষ্টি ঝাপসা ক'রে দিলে। ঘাম মুছে ফেলবার জন্যে একটু দাঁড়ালাম। আগে লক্ষ্য করি নি; সত্যি বলতে কি, লক্ষ্য করবার কথা একবার মনেও হয় নি; আমার চারপাশেই দেখি ভীষণ একটা হট্টগোল চলেছে।

সহসা একটা ঘণ্টা বেজে উঠল—নীরস থন্‌থনে, যেন সাবধান ক'রে দিল। ঘণ্টার শব্দ বেশ স্পষ্ট ক'রেই শুনতে পেলাম, প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম, তারপর আমার শ্রান্ত পা দুখানি যত তাড়াতাড়ি পারল, একপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা রুটি-বয়ে-নেওয়া গাড়ী আমায় জবর একটা ধাক্কা দিল, আর একটু তাড়াতাড়ি যদি সরবার চেষ্টা করতাম তা হ'লে আর কোন গোলমালই হ'ত না। যাক, কি করব, উপায় নেই ত কিছু। একটা পায়ে ভারী ব্যথা হ'ল—মনে হ'ল, পা-টা যেন মড়মড় ক'রে ভেঙে গেল।

কোচোয়ান প্রাণপণে ঘোড়ার বল্‌গা টেনে ধরল। এবং আমার দিকে চেয়ে শুধাল, তেমন লাগে নি ত?' আর একটু হ'লেই যে কি কি সর্বনাশই না আমার হ'ত! ··· যাক্‌, তেমন কিছু হয় নি ত। ··· হাড় ভেঙেছে ব'লে মনে হ'ল না।

যতটা পারলাম ছুটে গিয়ে একটা আসনে বসে পড়লাম; পথ-চলতি লোকগুলা চলতে চলতে কৌতূহলী হয়ে থেমে গেল, তাদের সে দৃষ্টি আমায় লজ্জায় অভিভূত ক'রে ফেলল। পরম ভাগ্য যে, আঘাত তেমন গুরুতর হয় নি; বলতে গেলে বিপদটা যেমন তেড়ে এসেছিল, নেহাৎ ভাগ্যের জোর বলেই তেমন কিছু হয় নি। দুঃখের বিষয়, জুতোটা একদম ছিঁড়ে গেছে, গোড়ালি কোথায় গেছে তার সন্ধান পেলাম না।

তলাটা লড়বড় করছে। পা-টা তু'লে ধ'রে দেখলাম, আঘাতটা থেকে তখনও রক্ত বেয়ে পড়ছে। যাই হোক, এ দুর্ঘটনার জন্যে কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। লোকটা যে ইচ্ছে ক'রেই গাড়িশুদ্ধ ঘোড়াটা এনে হুড়মুড় ক'রে আমার উপর ফেলেছে এ কেউ বলবে না, অবশ্য তাকে কিন্তু ভারী উৎকণ্ঠিতই দেখা গেল। আমি যদি তখন তার কাছে একখানা রুটি চাইতাম তা হ'লে সে যে গাড়ী থেকে একখানা রুটি নিয়ে আমার নিশ্চয়ই দিত সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আনন্দের সঙ্গেই সে দিত। ভগবান তাকে সকল আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। ...

আমি তখন সাংঘাতিক ক্ষুধার্ত, এবং আপনাকে ও নির্লজ্জ ক্ষুধাকে নিয়ে যে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ব'সে ব'সেই গা মোড়ামুড়ি দিলাম এবং হাঁটু পর্যন্ত বুকটা নামালাম। একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। অন্ধকার হ'তেই মন্থর গতিতে টাউন হলের দিকে এগিয়ে চললাম। ভগবান জানেন, কেমন ক'রে সেখানে গিয়ে পৌছলাম। সিঁড়ির একপাশে গিয়ে ব'সে পড়লাম। কোটের একটা পকেট ছিঁড়ে ফেড়ে সেই ছিন্ন কাপড়ের টুকরাটাই আপনার মনে চিবোতে শুরু ক'রে দিলাম। এবং তা যে কোন একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থেকেই করলাম তা অবশ্য বলা চলে না, অমনি অমনি—নিছক, খামকা। তার পরই সামনেকার খালি জায়গার দিকে অর্থহীন অন্ধের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। অদূরে একপাল ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, পথ দিয়ে যে লোকজন যাওয়া-আসা করছে তাও বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কোন দিকেই আমার লক্ষ্য মাত্রও ছিল না।

হঠাৎ আমার খেয়াল গেল, বাজারের একধারে যে সারি সারি মাংসের দোকান রয়েছে তারই একটা দোকানে গিয়ে এক টুকরো কাচা মাংস চাইব। তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গিয়ে সামনে যে কশাইটা পড়ল

তাকেই ব'লে বসলাম, 'ভাই, আমার কুকুটার জন্যে একখানা পাঁঠার হাড় দিতে পার? সামান্য একখানা হাড় দিলেই হবে। মাংস না থাকলেও কিছু এসে যাবে না, কুকুরটাকে একটা কিছু চিবোতে দিতে চাই মাত্র।'

লোকটি তৎক্ষণাৎ এক টুক্‌রো হাড় দিল। তাতে একটু-আধটু মাংস তখন ছিল। মূল্যবান বস্তুজ্ঞানে হাড়ের টুক্‌রোটা পরম যত্নে কোটের পকেটে রেখে দিলাম। এমন প্রাণ খুলে লোকটাকে ধন্যবাদ জানালাম যে, সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'না, না, এর জন্যে অত করে ধন্যবাদ জানাতে হবে না।'

অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই জানাতে হবে। এ তোমার একান্ত অনুগ্রহ।' ব'লে চলে এলাম।

আমার হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ডভাবে স্পন্দিত হতে লাগল। গুড়ি মেরে একটা সরু গলি-পথে ঢুকে পড়লাম। সামনে একখানা জীর্ণ শীর্ণ ঘর—বেজায় অন্ধকার। সেইখানটায় দাঁড়িয়ে হাড়ের টুক্‌রোখানা চিবোতে শুরু ক'রে দিলাম।

হাড়ে কোন রকম স্বাদ নেই, বরং একটা উৎকট গুম্‌সা গন্ধ। ফলে, তৎক্ষণাৎ বমি হয়ে গেল। আর একবারও চেষ্টা করলাম। যদি কোন রকমে একবার খানিকটাও পেটে ধ'রে রাখতে পারতাম, তা হ'লে তাতেই খানিকটা ফল হ'ত। এ একরকম জোর ক'রে পেটে ধ'রে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র; কিন্তু আবারও বমি হয়ে গেল। একদম ক্ষেপে গেলাম এবং রেগে হাড়ের টুকরোটাকে দ্বিগুণ জোরে কামড়াতে শুরু ক'রে দিলাম এবং নিছক ইচ্ছাশক্তির জোরে সেটাকে ভেঙে ফেললাম, কিন্তু তবু কোন কাজে এল না। হাড় থেকে যে সামান্য মাংস পেটে পড়েছিল তা গরম হতে না হ'তেই আবার হড়্ হড়্ ক'রে

বেরিয়ে এল। কি করব, দুর্ভাগ্য! পাগলের মত হাত দুটো মুঠো ক'রে কেঁদে ফেললাম, যেন আমায় ভূতে পেয়েছে। চোখের জলে হাড়ের টুকরোটা ভিজে একটু লবণাক্ত হবে এ ধারণা আমার ছিল। আবারও বমি হ'ল। নিজের অদৃষ্টকে অভিশাপ দিলাম এবং রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে আর একবার বমি করলাম।

চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ—কেউ কোথাও নেই, আলো নেই, গোলমাল নেই। তখন আমি সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত। শ্বাস-প্রশ্বাস খুব কমই পড়েছিল, যা-ও পড়েছিল তা-ও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে কেঁদে উঠলাম। উপকার হ'বে মনে ক'রে হাড় থেকে যে মাংস খুঁটে খেয়েছিলাম, তা কয়বারে বমি হতেই বেরিয়ে এল। অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন দেখলাম যে, মাংস কিছুতেই উদরে থাকছে না তখন নিরুপায় হয়ে হাড়খানা ছুঁড়ে দরজার সামনে ফেলে দিলাম। দুর্বলের সম্বল ঘৃণা এসে আমায় অধিকার ক'রে বসলো। হাত মুঠো ক'রে ক্রোধভরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে গালাগালি দিয়ে উঠলাম।

'ঈশ্বর, তুমি নেই, তোমার অস্তিত্ব নেই। যদি থাকত, তা হ'লে এমন অভিশাপ দিতাম যে, নরকের অগ্নিশিখা তোমায় পুড়িয়ে ছাই করে দিত। তোমার সেবা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি—তুমিই তা হ'তে দিলে না। তাই আজ পেছন ফিরেছি—আর তোমার দিকে ফিরব না কোন দিন। তুমি যখন আমায় নিলে না, তখন আমিই বা তোমায় নিই কেন! আজ মরতে বসেছি, তবু তোমায় ব্যঙ্গ করছি! মরণ-দেবতা আমার দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—তাই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি নরকের দাসত্ব করতেও রাজী, তবু তোমার রাজ্যের স্বাধীনতা আমার কাম্য নয়। তোমার এ স্বর্গীয় নীচতার

প্রতি আমার চিত্তে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা। তাই নরকই আজ আমার একান্ত কাম্য। কেন না, আর যাই হোক, সেখানে ভণ্ডামি নেই!

'মর্ত্যের যত নির্বোধের দল, তারাই তোমার রাজ্যের বাসিন্দা—যারা পৌরুষের দিক দিয়ে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত ফতুর, যারা মৃত্যুকালে একবার তোমায় ডেকেছে তারা—সেই নির্বোধেরাই তোমার রাজ্যে আশ্রয় পায়। আমার বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়িয়েছ, তোমায় আমি জানি নে, চিনি নে। তুমি সর্বজ্ঞ বটে কিন্তু তোমার কোন সত্তাই নেই। তাই তোমার বিরুদ্ধাচারণের কাছে কোন দিনই আমি মাথা নত করি নি। হে স্বর্গের অধিরাজ, তাই আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে, আত্মার সকল শক্তিতে তোমায় ব্যঙ্গ করবার তীব্র অভিলাষ পোষণ করছি। যদি আমার ক্ষমতা থাকত ত আমার এ মনোভাব আমি বিশ্বের সকল নরনারী, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি পাতা, প্রত্যেকটি শিশির-কণায় চারিয়ে দিতাম। মহাবিচারের দিন তোমায় উপহাস করতাম, তোমার অসীম করুণার জন্তে তোমায় প্রাণপণে অভিশাপ দিতাম। আজ থেকে সকল রকমে তোমায় অস্বীকার করতে চললাম। যদি কখনও ভুল ক'রে চিত্ত তোমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তা হ'লে তাকে চরম অভিশাপ দিব এবং যদি কখনও রসনা তোমার নাম উচ্চারণ করে ত তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলব। তোমায় বলছি, সত্যিই যদি তুমি থেকে থাক, ত এই আমার শেষ কথা—তোমায় সর্বান্তঃকরণে আমার নমস্কার জ্ঞাপন ক'রে বিদায় নিচ্ছি। আর কখনও তোমার দিকে ফিরেও তাকাব না।'

চুপ ক'রে গেলাম।

দারুণ উত্তেজনা ও ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, এক জায়গাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে অভিশাপ আওড়ে যাচ্ছিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ আবার স্বকৃত অন্যায় আচরণের জন্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলাম। অদূরে দুজন লোক কি বলাবলি করতে করতে

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। তৎক্ষণাৎ পাশ কেটে এসে আলোকিত রাস্তায় পৌছলাম। এগিয়ে যেতে যেতে কত উদ্ভট কল্পনাই না এল। বাজারের যে অংশে নানা রকমের পুরানো জিনিস ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল সেখানটার কথা মনে হতেই মনটা বিষিয়ে উঠল। ওগুলো যেন বাজারের সকল শ্রী, সকল সৌন্দর্য ঢেকে রেখেছে। এ যেন শহরটার একটা দারুণ কলঙ্ক। এ বিশ্রী রাবিসগুলা কেউ সরিয়ে দেয় না! তৎক্ষণাৎ আবার মনে হ'ল, এই যে প্রকাণ্ড বাড়ীটা যেখানে ভৌগলিক জরিপের আপিস—এটা এখান থেকে সরাতে কত খরচ পড়ে! যত বার এখান দিয়ে গিয়েছি তত বারই এর গঠন-পারিপাট্যে চমৎকৃত হয়েছি। তিন-চার হাজার টাকায় সম্ভবত সরানো চলবে না। তিন-চার হাজার টাকা,—সে ত কম নয়! তা, মন্দ কি, তিন-চার হাজার টাকা দিয়েই কাজটা শুরু ক'রে দেওয়া যেতে পারে ত। তখনই আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। হাত-খরচের টাকা থেকেই এটা হ'তে পারে। তখনও সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, কান্নার পর থেকে কাশিও মাঝে মাঝে আমাকে বিব্রত করে তুলছিল। মনে হচ্ছিল, জীবনীশক্তি যেন আর বেশি নেই—তাই পদ্যে শেষ প্রার্থনাটি আবৃত্তি করলাম। মরতে বসেছি, তার জন্যে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা বা দুঃখ আমার ছিল না, বরং শহর ছাড়িয়ে রেল স্টেশনের দিকে চললাম - আমার সে ঘর থেকে দূরে—বহু দূরে। রাস্তায় পড়ে মরি তাও তখন আমার কাছে কাম্য, তবু আর সে ঘরে নয়। দুঃখ-লাঞ্ছনা আমায় একান্তভাবে নির্বিকার নির্দয় ক'রে তুলেছে। পায়ের টনটনানি ক্রমেই বেড়ে উঠছে; পায়ের ব্যথাটা, মনে হচ্ছিল, যেন তিড় তিড় ক'রে সারা পা-টা বেয়ে উঠছে। কিন্তু তাতেও যে তেমন অস্বস্তি বোধ করছি তাও নয়; কেন না, এর চাইতেও ঢের বেশি জ্বালা আমি ভোগ করেছি।

কোন রকমে রেল স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। অদূরে জাহাজঘাটা।

কাজকর্ম সব তখন বন্ধ, লোকজন বড় একটা নেই—কেবল এখানে-সেখানে দু-একজন কুলী বা খালাসি পাইচারি করছে। হঠাৎ দেখি সামনে একটা খোঁড়া লোক। তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নান' ছেড়েছে কি-না। এই জাহাজখানার কথা আমার মনের মধ্যে যে বাসা বেঁধেছিল এটা আমারও স্পষ্ট জানা ছিল না।

'হ্যাঁ, ছেড়েছে।'

কোন্ দেশে গেল ও বলতে পারল না।

লোকটা এক-পা ঝুলিয়ে আর এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর জবাব দিল, 'না। এখান থেকে কি নিয়ে গেল?'

জবাব দিলাম, 'জানি নে।'

ইতিমধ্যে 'নান' জাহাজ সম্বন্ধে আমার ঐকান্তিক কৌতূহল একেবারে উপে গেল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হোম্‌স্ট্রাড্ কয় মাইল দূর?'

'হোম্‌স্ট্রাড্? মনে হয় ...'

'হাঁ, হোম্‌স্ট্র্যাড, নয় ত কি হনুলুলু?'

'কোন্ জায়গার কথা বলব!—হোম্‌স্ট্র্যাডের কথা, না হনুলুলুর কথা?'

'তোমায় ত হোম্‌সট্রাডের কথাই শুধাচ্ছি।'

আবার পরক্ষণেই বললাম, 'ওহে, আমায় একটু তামাক দিতে পার? আছে?'

লোকটা তৎক্ষণাৎ খানিকটা তামাক দিল। প্রাণ খু'লে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে চললাম। তামাকটা আমার কোন কাজেই এল না, পকেটে রেখে দিলাম মাত্র। লোকটা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল, হয় ত কোন কারণে আমার উপর ওর সন্দেহ জেগেছে।

দাঁড়িয়েই থাকি, চলতেই থাকি, আমার যেন মনে হ'তে লাগল, লোকটার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমায় অনুসরণ করছে। এ লোকটা যে আমায় এমনিভাবে তাড়না করবে এটা আমার বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল না। তাই তাড়াতাড়ি তাকে পিছনে ফেলে হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে গেলাম। যাবার মুখে কেবলমাত্র 'মুচি'—এই একটি মাত্র শব্দ আওড়ালাম। শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে ওর দিকে তাকালাম, যেন শুধু দুটো চোখ দিয়েই তাকাই নি, সর্বাঙ্গ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। আর একবার শব্দটা উচ্চারণ ক'রেই পিছন ফিরে রেলওয়ে স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটা কিন্তু একটা কথাও বললে না, কেবল চোখ দুটো পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

'মুচি!' আবার থমকে দাঁড়ালাম। হাঁ, সত্যিই ত। ওর সঙ্গে দেখা হবার মুহূর্তে এই শব্দটার কথাই ত আমার মনের মধ্যে ছিল; ওর সঙ্গে যেন পূর্বে কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল ব'লে মনে হ'ল! যে দিন আমার ওয়েস্ট-কোটটা বাঁধা দিই, সে দিন যেন ওর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। সে যেন অনন্তকাল আগেকার কথা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এই সব ভাবছিলাম তখন রেলওয়ে স্কোয়ার ও হারবার্ স্ট্রীটের মোড়ের একখানা বাড়ীর দেওয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সহসা চমকে উঠেই তৎক্ষণাৎ এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। সামনেই দেখি—সম্পাদক মশাই! আমার তখন বেপরোয়াভাব। তাঁর দৃষ্টিতে পড়বার উদ্দেশ্যেই চেষ্টা ক'রে এক পা এগিয়ে যেতে চাইলাম। তার মানে, এর দ্বারা তাঁর সহানুভূতি উদ্রেক করাই নয় বরং নিজেকে যথেষ্ট শাস্তি দিতেই চেয়েছিলাম। রাস্তার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আমার দেহের উপর দিয়ে তাঁকে চলে যেতে অনুরোধ করতাম। কিন্তু তাঁকে সম্ভাষণ করতে হাত দুটো পর্যন্ত তুললাম না।

তিনি হয় ত মনে করলেন যে, আমার কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়।

তাই চলার গতি একটু কমালেন। আমিই বললাম, 'লেখা এখনও শেষ করতে পারি নি, শেষ হ'লেই গিয়ে দেখা করব।'

তিনি সপ্রশ্ন জবাব দিলেন, 'তাই কি এখনও লেখাটা শেষ হয় নি তবে?'

'না, এখনও পেরে উঠি নি।'

তাঁর এ সহৃদয় ব্যবহারে দু-চোখ পূরে জল এল। নিজেকে সামলে নেবার মতলবে জোরে জোরে কেশে ওঠলাম। সম্পাদক মশায় নাক ঝেড়ে আমার দিকে চাইলেন।

তারপর শুধালেন, 'টাকা-পয়সা কিছু আছে ত?'

জবাব দিলাম, 'না। এক পয়সাও নেই। আজ কিছুই খেতে পাই নি, তবে ...'

'তোমার ত না খেয়ে মরবার কোনই অধিকার নেই বাপু!' এই ব'লেই তিনি পকেটে হাত দিলেন।

একটা দারুণ লজ্জা এসে আমায় সজাগ ক'রে দিল এবং দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। টের পেলাম ব্যাগ থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে আমার দিকে ধরেছেন।

একটি কথাও বললেন না, কেবলমাত্র নোটখানা হাত বাড়িয়ে আমায় দিলেন—আমায় অনাহারে মরতে দেবেন না! প্রথমটা নোটখানা নিতে আপত্তি করলাম। ...

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'নাও শীগগীর। ট্রেনের প্রতীক্ষায় আছি, ট্রেন এখনই এসে পড়বে, ঐ দেখা যাচ্ছে।'

নোটখানা হাত বাড়িয়ে নিলাম। আনন্দে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। একটা কথাও কইতে পারলাম না। এমন কি, নমস্কারটা পর্যন্ত জানালাম না।

তখন অগত্যা সম্পাদক মশায়ই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, 'এর

জন্যে অতটা 'কিন্তু' করবার কিছুই নেই। বেশ জানি, লেখা দিয়ে একদিন তুমি এটা শোধ করতে পারবে।'

এই ব'লে তিনি চলে গেলেন।

তিনি যখন খানিকটা এগিয়ে গেছেন, আমার তখন মনে হ'ল যে, তিনি যে উপকার করলেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানান হয় নি, নমস্কারও করা হয় নি। ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ধরতে পারলাম না। পা যেন কিছুতেই তত তাড়াতাড়ি এগোতে পারল না, বার বার হোঁচট খেলাম। ক্রমে তিনি অনেকটা দূরে চ'লে গেলেন। নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম, চীৎকার ক'রে তাঁকে ডাকি। কিন্তু সাহস হ'ল না। সে যাই হোক, অনেক ক'রে সাহস এনে দু-একবার তাঁকে ডাকলামও, কিন্তু তখন তিনি অনেক দূরে, আর আমার কণ্ঠস্বর ততটা দূর পৌছবার পক্ষে নেহাতই দুর্বল।

যেদিকপানে তিনি চলে গেলেন সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীরবে কাঁদলাম। আপনার মনে বললাম, 'এঁর মত ত আর কাউকেও দেখলাম না! দশটা টাকা দিলেন, না চাইতেই! আবার বললেন, অনাহারে আমায় মরতে দিতে পারেন না!' পিছন ফিরে যেখানটায় তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হাবভাব অনুকরণ করলাম। নোটখানা আমার সজল চোখের উপর ধ'রে এপিঠ ওপিঠ দু-পিঠই ভাল ক'রে পরীক্ষা করলাম। তারপর উচ্চকণ্ঠেই শপথ ক'রে ব'লে ওঠলাম যে, আমার হাতের নোটখানা রয়েছে তা দশ টাকারই নোট, এবং এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এক ঘণ্টা পর, হতে পারে ঘণ্টাটা একটু অসাধারণ দীর্ঘ—কেন না, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে—চেয়ে দেখলাম আমি ১১নং টম্‌টেগ্যাদেন-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। খেয়াল হতেই নিজের অবস্থাটা সম্‌ঝে নিতে চেষ্টা করলাম। এবং এই ত সেই 'পথিকজনের খাওয়া ও থাকার স্থান।' সুতরাং আর

একবার সেই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে থাকবার জায়গা চাইলাম। তৎক্ষণাৎ একখানা বিছানা পেলাম।

* * *

মঙ্গলবার।

সূর্য উঠেছে, চারদিক তখনও নিস্তব্ধ—এ রকম উজ্জ্বল দিন সচরাচর বড়-একটা মিলে না। বরফ সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারদিকেই স্ফূর্তি ও আনন্দ, সকলকার মুখে চোখেই তৃপ্তি হাসি, সর্বত্রই একটা সজীবতার আভাস দেখা যাচ্ছে; ফোয়ারা থেকে জল ঝরে পড়ছে, সূর্যকিরণে তা ঝিকমিক করছে। ···

দুপুর পর্যন্ত টম্‌টেগ্যাদেন-এর বাড়ীতেই ছিলাম, বেশ আরামে, তারপর সেখান থেকে শহরের উদ্দেশে রওনা হলাম। মেজাজটা ভারী খুশি। তাই সারাটা বিকেল চেনা রাস্তা দিয়ে লোকজনের দিকে চাইতে চাইতে মন্থর গতিতে হেঁটে চললাম। সাতটা বাজবার আগেই সন্ত ওলেভ্‌স প্লেশ-এ গিয়ে উপস্থিত হয়ে দু নম্বর বাড়ীর জানলার দিকে একবার চোরা-কটাক্ষ হানলাম। আর ঘণ্টা খানেক পরেই ত তার সঙ্গে দেখা হবে। এই একটা ঘণ্টা যে কি উৎকট আনন্দে ও শঙ্কায় আমার কেটে গেল তা বলতে পারি নে। আচ্ছা, কি হবে? সে নীচে নেমে এলে কি ব'লে তাকে সম্ভাষণ করব? নমস্কার?—না, একখানি হাসি? শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, হাসি দিয়েই তাকে সম্ভাষণ করব। অবশ্য মাথাটা যতদূর সম্ভব নোয়াতে হবে।

আবার তখনই চুপি চুপি চ'লেও এলাম। কেন না, এত আগে এসে পড়ায় মনে মনে ভারী লজ্জিত হলাম। কার্ল জোহান স্ট্রীটে খানিকক্ষণ পায়চারি করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটের দিকে নজর রাখলাম। গীর্জার ঘড়িতে আটটা বাজতেই সন্ত্‌ ওলেভ্‌স্‌ প্লেশ-এর দিকে এগোলাম। যেতে যেতে মনে হ'ল, হয় ত দু-চার মিনিট দেরি হয়ে

গেছে। তাই যতটা তাড়াতাড়ি পারি পা চালিয়ে গেলাম। পা-টা টন্‌টন্‌ করছিল, তা ছাড়া, আর কোন কষ্টই ছিল না।

ঝরনাটার সামনে দম বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। দু নম্বর ঘরের জানলার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম কিন্তু সে এল না। তা, একটু অপেক্ষা করি, নিশ্চয়ই সে আসবে। হয় ত কোন কারণে তার দেরি হচ্ছে। শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, সেদিনকার ব্যাপারটা সম্বন্ধে তেমন ক'রে ভাবতেও পারি নি। আচ্ছা, সেদিনকার সাক্ষাৎটা আমার কল্পনার বিষয় নয় ত? এ সম্বন্ধেই ভাবতে আরম্ভ ক'রে দিলাম কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না।

'এই যে!' পিছন থেকে শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু পদশব্দও কানে এল, কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়ে সামনেকার সিঁড়ির দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম।

'নমস্কার!' শুনতে পেলাম। হাসতে ভুলে গেলাম। প্রথমটা মাথা থেকে টুপিটা পর্যন্ত নামালাম না। ওকে ওদিক থেকে আসতে দেখে এতই থতমত খেয়ে গেছলাম।

ও শুধাল, 'কতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আছ?' হেঁটে আসার জন্যে ও একটু হাঁপাচ্ছিল।

বললাম, 'না, এইমাত্র ত এসে দাঁড়িয়েছি। আর তাই যদি হ'ত— যদি একটু বেশিক্ষণই অপেক্ষা করতাম, তা হ'লেই বা কি অন্যায় হ'ত? আমার ধারণা ছিল, তুমি ওদিক থেকে না এসে এদিক থেকেই আসবে।'

'মাকে নিয়ে ও-পাড়ায় এক বাড়ী গেছলাম, তিনি সেখানেই এখন খানিকক্ষণ থাকবেন!'

'ও, তাই নাকি!'

আমরা আপনা থেকেই সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। মোড়ে একটা পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল, আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

ও চলা থামিয়ে বললে, 'তা ত হ'ল, এখন কোথায় চলেছি ?'

'যেখানে তোমার খুশি ।'

'তাই নাকি ! বেশ ! তবে একা একা ঠিক করতে কিন্তু ভারী বিশ্রী লাগে ।'

নীরব ।

তারপর আমি বললাম, কিছু একটা বলার খাতিরেই, 'তোমার ঘরও ত দেখি অন্ধকার ।'

'হাঁ, অন্ধকার,' ও সানন্দে জবাব দিল ; 'চাকরানীটাকেও সন্ধ্যার মত ছুটি দিয়েছি, তাই বাড়ীতে এখন আমি একা ।'

আমরা উভয়েই দু নম্বর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জানলাগুলির দিকে তাকালাম, যেন এগুলিকে এর আগে আমরা কেউ কখনও দেখি নি ।

আমি বললাম, 'তা হ'লে ত তোমার ঘরে গিয়েও বসতে পারি। যতক্ষণ তুমি চাও, তোমার দোরগোড়ায় বসে থাকব খালি ।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি কেঁপে ওঠলাম, মনে হ'ল যেন বড় বেশি এগিয়ে গেছি। হয় ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে এখনই আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে। হয় ত আর কখনও ওর সঙ্গে দেখাও হবে না। হায়, আমার সে কুঠরিটা কি বিশ্রী ! অগত্যা ওর জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ও বললে, 'কেন, দোরগোড়ায় বসবে কেন ?' ওর বলার সুরে সদয় ভাবটাই প্রকাশ পেল, ও স্পষ্টই বলল, 'নিশ্চয়ই দোরগোড়ায় তোমায় বসতে হবে না ।'

আমরা উপরে উঠে গেলাম।

ভিতরে অন্ধকার, তাই দরদালান পার হবার সময় ও আমার হাত ধ'রে আগে আগে চলল। ও বললে, 'এতটা চুপচাপ থাকার কোনই দরকার নেই। কথাবার্তা অনায়াসেই কইতে পার ।'

ঘরে ঢুকলাম। ও বাতি জ্বালাল। বাতি জ্বালতে জ্বালতে ও মৃদু

হেসে বলল, 'এখন তুমি আমার দিকে তাকাতে পারবে না কিন্তু, ভারী লজ্জা হচ্ছে! যাক, আর কখনও—'

'কি আর কখনও?'

'আমি আর কখনও ··· ও ··· না ··· আর কখনও তোমায় চুমো খাব না!'

'চুমো খাবে না?'

উভয়েই হেসে উঠলাম। তারপর আমি দু-হাত বাড়িয়ে দিলাম, ও সরে দাঁড়াল, আমাদের মাঝখানে টেবিল। উভয়ে উভয়ের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলছে।

ও বললে, 'আমায় ধর ত দেখি!'

হেসে ওকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেলাম। দৌড়তে গিয়ে ওর ঘোমটা গেল খসে, টুপিটা ফেলল খুলে; ওর উজ্জ্বল চোখ দুটা আমার দিকে নিবদ্ধ, ও আমার হাবভাব লক্ষ্য করছে। আর একবার ওকে ধরবার জন্যে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। পায়ে বেদনা ছিল, তাই ধরতে পারলাম না। গালিচার উপর টিপ ক'রে পড়ে গেলাম। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালাম।

ও বললে, 'কি আশ্চর্য! তুমি এত লাল হয়ে গেছ! কি বোকা তুমি!'

ওর সঙ্গে এক মত হয়ে বললাম, 'হাঁ, তাই বটে।' তারপর আবার নতুন ক'রে ধরা-ধরি খেলা শুরু করলাম।

'মনে হচ্ছে তুমি যেন খুঁড়িয়ে চলছ।'

'হাঁ, খুঁড়িয়ে চলছি হয় ত একটুকু, তেমন বিশেষ কিছু নয়।'

'সেবারে ছিল, তোমার আঙুলে ব্যথা, আর এবারে দেখছি পায়ে; তোমার ত দেখছি অসুখ লেগেই আছে।'

'হাঁ, তাই বটে। দিন কয়েক আগে পায়ে একটা সামান্য চোট লেগেছিল।'

'চোট লেগেছে? কিসে, কেমন ক'রে লাগল? আবার মাতাল হয়েছিলে? কি উশৃঙ্খল জীবনই না যাপন করছ তুমি!' এই ব'লে তর্জনী দেখিয়ে আমায় ভয় দেখাল এবং আবার তখনই গম্ভীর হয়ে গেল। 'যাক, এখন একটু বসা যাক; না না, দোরগোড়ায় বসতে হবে না বলছি; দেখছি, আজ তুমি ভারী লাজুক হয়ে পড়েছ! এখানে এসে ব'স—তুমি এখানটায়, আর আমি ওখানে—বেশ, সেই ভাল।··· এই যারা কথাবার্তা কয় না, তাদের নিয়ে ভারী বিরক্ত লাগে! যাক, এখন আমার ওই চেয়ারখানায় হেলান দিয়ে অনায়াসেই বসতে পার, আর এইটুকুন বুদ্ধি খরচ করতে অনায়াসেই তুমি পারতে! কিন্তু যেই সে কথা বলতে যাচ্ছি, অমনি চোখ দুটা পাকিয়ে এমনই ক'রে তাকান হচ্ছে যেন আমি যা বলছি তা বাবুর বিশ্বাসই হচ্ছে না, কেমন, নয় কি? হাঁ, সত্যি তাই। অনেকবার আমি এটা লক্ষ্য করেছি, আজও আবার করলাম। যাক, তুমি যে স্বভাবতই এতটা শান্তশিষ্ট, এটা আমায় বিশ্বাস করাবার চেষ্টা না করলেই ভাল করতে। তুমি তখনই শিষ্ট হও যখন সুবোধ শান্ত না হবার মত সাহস তোমার থাকে না। নেশা করলেই তোমার সাহসটা একটু বেড়ে যায় আর তখন লোকের বাড়ী পর্যন্তও অনুসরণ করতে পার আর তখন ব্যঙ্গও বেশ সস্তা হয়ে পড়ে, দেখুন, আপনি আপনার বইখানা ত ফেলে যাচ্ছেন! হা হা, কি নির্লজ্জ বেহায়া তুমি!'

ভগ্নোৎসাহ হয়ে ব'সে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। বুকটা দপ্ দপ্ ক'রে স্পন্দিত হচ্ছিল। শিরায় শিরায় রক্তস্রোত তীব্রভাবে বয়ে গেল। তবু যেন তাতে একটা বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করলাম।

'কথা কইছ না যে?'

ব'লে উঠলাম, 'কি যে ভাল লাগছে তোমায়, বলতে পারি নে। ব'সে ব'সে তাই তোমায় কেবল দেখছি—আর কি ভাল লাগছে! ভাল

না লেগে উপায় কি! ··· তুমি এমন অসাধারণ যে ··· সময় সময় তোমার চোখ দুটা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠে, যার জুড়ি আর কোথাও দেখি নি! চোখ দুটা যেন ফুলের মত ··· কেমন! না না, ফুলের মত হয় ত নয়, কিন্তু ··· এমন প্রচণ্ড ভাবে তোমায় ভালবেসে ফেলেছি অথচ আমাদের মিলন এত অসম্ভব যে, কোন দিক দিয়েই তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। ··· তোমার নাম কি? না, এখন তোমার নাম আমায় বলতেই হবে।'

'না। আগে তোমার নাম বল। সে কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি একদম ভুলেই গেছলাম! কাল সারাদিন এই কথাটাই কেবল মনে মনে চিন্তা করেছি যে, তোমার নামটা সর্বাগ্রে জানতে হবে। হাঁ, বলতে গেলে সারাদিনটা কেবল ওই একটি কথাই মনে ভাবি নি, তবে—'

'জান, আমি তোমার কি নাম রেখেছি? আমি নাম রেখেছি ল্যাজালি। নামটা তোমার কেমন লাগছে? নামটার সঙ্গে যেন কেমন একটা সচ্ছন্দ গতির ভাব মনে জেগে ওঠে। ···'

'ল্যাজালি!'

'হাঁ।'

'শব্দটা কি কোন বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া?'

'না, বিদেশী ত নয়।'

'মোটের উপর তেমন বিশ্রী নয়, বলতে পারি।'

অনেক আলোচনার পর আমরা পরস্পরের নাম বললাম। ও আমার পাশেই একটা সোফায় বসে চেয়ারখানা পা দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গল্প চলল।

ও বলল, 'আজ বিকেলে তুমি কামিয়েছ দেখছি। সেবারের থেকে এবারে তোমায় মোটের মাথায় একটু ভালই দেখাচ্ছে—এই সামান্য

ভাল আর কি। না, বাজে কথা ভেবো না ··· না না, তা হবে না। সেবারে সত্যিই ভারী অপরিষ্কার ছিলে, তার উপর হাতে ছিল একটা জীর্ণ মলিন কম্বল, আর সেই অবস্থায় তুমি আমায় এক জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, তোমার সঙ্গে গিয়ে মদ খেতেও অনুরোধ করেছিলে। রক্ষা কর, ও-কাজ আমার দ্বারা হয় না।'

বললাম, 'তা হ'লে বল যে, আমার জীর্ণ মলিন জামা-কাপড় দেখেই সে দিন তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও নি, কেমন?'

ও চোখ নামিয়ে জবাব দিল, 'না, তা নয়। ভগবান জানেন, আমি তা মনে করি নি। সত্যি, সেদিন সে কথা আমার মনেও হয় নি।'

বললাম, 'তুমি নিশ্চয় ধারণা ক'রে ব'সে আছ যে, যেমন খুশি পোশাক পরা আমার ইচ্ছাধীন, কেমন, নয় কি-না?—মোটেই তা নয়। আমি নেহাৎ গরীব।'

ও আমার দিকে তাকাল। তার পর শুধাল, 'সত্যি?'

'হাঁ সত্যি। কি করব, অদৃষ্ট।'

খানিকক্ষণ কেটে গেল।

ও বললে, 'তা আমিও বড় গরীব।' ব'লেই হৃষ্টচিত্তে ও মাথা নাড়ল।

ওর প্রত্যেকটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী আমায় মাতাল ক'রে তুলল, যেন তা এক এক বিন্দু সুরা। আমি যখন কিছু বলি, ও এমন কায়দায় ঘাড় বাঁকিয়ে ব'সে শোনে যে, সে ভঙ্গীটুকু আমায় মুগ্ধ করে। ওর নিঃশ্বাস আমার মুখে হাওয়া বুলিয়ে দেয়, এটা অনুভব করি।

বললাম, 'জান যে ··· কিন্তু এখন রাগ করতে পারবে না—কাল যখন শুতে যাই তখন যেন এ বাহু তোমারই জন্যে নির্দেশ ক'রে রেখেছি ··· কাজেই ··· যেন এ-বাহুকে উপাধান ক'রেই ··· তুমি শুয়েছ ··· মনে ক'রেই ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'তাই নাকি? বা, ভারী মজা ত!'

চুপচাপ।

'দূর থেকেই সেটা করেছ, বেশ করেছ, নতুবা ...'

'আমি যে সাম্‌নাসাম্‌নিও তা করতে পারতাম এটা কি তুমি বিশ্বাস কর না?'

'না, তা সত্যিই বিশ্বাস করি নে ত।'

'আমার দ্বারা সব কিছু সম্ভব,' বললাম। এই ব'লে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম।

'আমি পারি কি?' ও আর কিছু বলল না।

ওর এ কথায় বিরক্ত হলাম, বলতে গেলে ভারী আঘাতই পেলাম যে, ও যেন সত্যিই গোবেচারী ভালমানুষ, এ ভাবটাই ও দেখাচ্ছিল। মনটাকে শক্ত ক'রে নিজেই নিজেকে আলিঙ্গন করলাম, এবং হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরলাম, কিন্তু ও আস্তে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে আমার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে বসল। ফলে আমার সব সাহস উবে গেল! ভারী লজ্জিত হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম, অবস্থা তখন চরম; আমি যে একটা মানুষ এ কথাও তখন ভাবতে পারছিলাম না। যখন আমার ভদ্রলোকের মত চেহারা ছিল তখন যদি ওর সঙ্গে দেখা হ'ত ত বেশ হ'ত। কেন না, সেদিন আমার অবস্থা ঢের ভাল ছিল, পোশাক পরিচ্ছদও ভদ্রগোছেরই পরতাম, চেহারাটাও উপোসে উপোসে এতটা ক্যাকলাসের মত দেখায় নি। আর আজ কতদূর অবনতি হয়েছে!

ও বললে, 'এখন দেখছি সামান্য চোখ রাঙানিতেই তোমায় যে-কেউ দাবিয়ে দিতে পারে—সামান্য কারণেই তোমায় অপ্রস্তুত ক'রে দেওয়া অত্যন্ত সহজ। ...' এই ব'লেই ও অর্ধনিমিলিত চোখে হেসে উঠল—ওর চোখে মুখে একটা ধূর্তামি প্রকট হয়ে পড়ল; কিন্তু বাইরে এমন ভাব দেখাল যেন ও চোখ চাইতেই পারছে না।

মেজাজ আমার কেমন হয়ে গেল, ফট্ ক'রে ব'লে ফেললাম, 'আচ্ছা দেখ পারি কি-না !' এই ব'লেই প্রবল জোরে দু-হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম। ও মনে করেছে আমি আনাড়ি, ওর এ ধারণায় প্রথমত ভারী দমে গেলাম। ও কি সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছে ? ও কি সত্যি মনে করে যে, আমি নেহাতই আনাড়ি ! আচ্ছা, বেশ, ও দেখুক যে, আমি মরি নি ··· এ বিষয়ে যে আমি আনাড়ি এ কথা কেউ বলতে পারবে না। আচ্ছা, দেখা যাক কত দূর কি ···

ও নীরবে চুপ ক'রে ব'সে ছিল, তখনও ওর চোখ দুটা বোজা ; আমরা কেউ কোন কথা বলছিলাম না। ওকে জোর ক'র আমার দিকে আকর্ষণ করলাম, সাগ্রহে ওকে বুকে চেপে ধরলাম—ও কিন্তু একটা কথাও কইল না। ওর বুকের স্পন্দন বেশ টের পাচ্ছিলাম—আমারটাও শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল, যেন দূরে কে ঘোড়ায় চড়ে আসছে।

ওকে চুমো খেলাম।

তখন আর আমি আমাতে ছিলাম না। মনে পড়ে, কতকগুলি অর্থহীন কথা আওড়ে ছিলাম, শুনে নিজেই আবার হেসেছি। আদুরে নামে ডেকে ওর ঘাড়ের দিকটায় চুলকিয়ে, চুমো খেয়ে খেয়ে ওকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললাম। ওর বডিসের গোটা দুই বোতাম খুলে ফেলে বুকের দিকে তাকালাম—সাদা মুডৌল বক্ষস্থল আর সেখানেই রয়েছে মানুষের চিরন্তন-কৌতূহল ও চির-রহস্যের প্রতীক।

বললাম, 'দেখব ?' এই ব'লে আরও গোটাকয়েক বোতাম খুলে ফেলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার চালচলনটা নেহাৎ অসভ্যের মত। তা ছাড়া, বডিসের সব শেষ বোতাম কয়টা খুলতে পারলাম না, কেন না, সেইখানেই বডিসটা আঁটা ছিল।

'একটু দেখব ··· সামান্য একটু—'

হাত দিয়ে ও আমার ঘাড়ে আস্তে আস্তে চাপ দিল—ওর নিঃশ্বাস আমার ডান গালে বয়ে গেল। এক হাতে ও নিজেই ওর বোতামগুলি একটা একটা ক'রে খুলতে লাগল। কেমন যেন এক রকম বিব্রত-হাসি হাসল এবং বার বার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল, ওর ভীতি আমার নজরে পড়েছে কি-না। তারপর কোমরে আঁটা রজ্জু খুলে দিল—বুকের ঠেসটাও আলগা ক'রে দিল। আমার নোংরা হাতখানা দিয়ে বোতামগুলি ও রজ্জুটাকে স্পর্শ করলাম। ...

ওর দিক থেকে আমার মনটাকে বিষয়ান্তরে টেনে নেবার জন্যে ও বাঁ হাত দিয়ে আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললে, 'এ কি, তোমার মাথায় এত চুল উঠছে!'

জবাব দিলাম, 'হাঁ।' এবং বডিসের ভিতরে ওর বুকে আমার মুখখানাকে ঢুকিয়ে দিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে ও শুয়ে পড়েছিল, ওর জামা-কাপড় তখন একদম খোলা। হঠাৎ যেন ও ওর মত বদলে ফেলেছে, যেন মনে করেছে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর উচিত নয়, এই মনে ক'রে সহসা ও ওর গায়ের জামা-কাপড় আবার ঢাকা দিয়ে একটু উঠে জামা-কাপড় সামলাতে সামলাতে আমার মাথার চুল ওঠার প্রসঙ্গটাকে নতুন ক'রে ফেঁদে বসল।

'আচ্ছা, তোমার মাথায় এত চুল উঠছে কেন বলতে পার?'

'জানি নে ত।'

'আমার কিন্তু মনে হয়, তুমি অতিমাত্রায় মদ খাও ব'লেই তোমার চুল ওঠে এবং সম্ভবত ... দূর হোক গে, আর বলব না। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। না, তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি নে! আচ্ছা, একবার ভেবে দেখ না, তোমার বয়স ত আর বেশি নয়, এই সবে যৌবন শুরু হয়েছে, এখনই এত চুল ওঠে! যাক সে কথা, কেমন ক'রে তুমি জীবনযাত্রা চালাও তারই কথা সব আমায় বলতে হবে—আমার

বিশ্বাস, প্রচণ্ড অনিয়ম উশৃঙ্খলতার মধ্যে দিয়ে তুমি জীবনটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ! আজ আমায় সত্যি কথা সব বলতে হবে, ফাঁকি চলবে না। সত্য বলছ কি বাদ দিয়ে বলছ, আমি অবশ্য বুঝতে পারব—যাক, এবার বলতে শুরু কর!'

'আচ্ছা, সব কথা বলব' খন, কিন্তু তার আগে তোমার বুকে আমায় একটি চুমো খেতে দাও।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ? যাক, এখন বলতে আরম্ভ কর।'

'না, মণি, আগে আমায় চুমো খেতে দাও।'

'চুপ, না, তা হবে না। ··· আগে বল সব, তারপর তোমার দাবি মিটতেও পারে ··· আগে আমি শুনতে চাই, তুমি কেমন মানুষ। ··· আমার বিশ্বাস, ভীষণ—সাংঘাতিক—

আমার ভারী দুঃখ হ'ল, ও আমার সম্বন্ধে জঘন্যতম ধারণা ক'রে ব'সে আছে। ভয় হ'ল, পাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কেন না, আমার সম্বন্ধে যে কেউ কোন রকম ভুল বিশ্বাস পোষণ করবে এটা আমি কিছুতেই সইতে পারব না। ওর চোখে নিজেকে পরিষ্কার ক'রে তু'লে ধরতে হবে, নিজেকে ওর যোগ্য প্রমাণ করতে হবে—ওকে বুঝতে দিতে হবে, ও যার সামনে বসে আছে সে দেবচরিত্রের লোক। জীবনে স্খলনের সংখ্যা অঙ্গুলিপর্বে গুণতে পারে। সব ইতিহাস তখন একে একে ওর কাছে ব'লে গেলাম—কিছুই বাদ দিলাম না—সব সত্যি কথাই বললাম। আমার প্রতি ওর অনুকম্পা বাড়ে এ অবশ্য আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমার সত্যিকারের পরিচয়ই ওকে দিলাম। এ কথাও ওকে জানালাম, একদিন সন্ধ্যায় আমি কয়টা টাকা চুরি করেছিলাম।

ব'সে ব'সে সব কথা ও হাঁ ক'রে শুনল। ওর উজ্জ্বল মুখেচোখে একটা বিষাদ ও ভীতি ফুটে উঠল। দুঃখের কাহিনী ব'লে মনের মধ্যে যে একটা বিক্ষোভ এসেছিল, তা দূর ক'রে দেবার জন্যে ব'লে উঠলাম,

'কেমন, এবার ত সব বলা হ'ল! এ সব আর নয়। এবারে আমি বেঁচেছি ...'

ওর মেজাজ কিন্তু কিছুতেই চাঙা হ'ল না। 'ভগবান রক্ষা করুন!' এ ছাড়া আর একটা কথাও ওর মুখ দিয়ে বার হ'ল না, ও একদম চুপ মেরে গেল। একটু পর পরই আবার সেই একটি কথা—'ভগবান রক্ষা করুন'—বলে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।

হাসি-ঠাট্টা ক'রে, ওকে আমার বুকে টেনে এনে ওর মনের নেতিয়ে-যাওয়া ভাবটা দূর করতে চাইলাম। জামার বোতাম ও ইতিমধ্যেই এঁটে দিয়েছিল। এ দেখে সত্যি সত্যি ভারী দুঃখ হ'ল। ফের কেন ও জামার বোতাম এঁটে দিল? স্বকৃত অন্যায়ের জন্যে মাথার চুল ওঠার চাইতে এখন কি আমি ওর চোখে কম অযোগ্য? ... যাক, ওসব বাজে কথা। ... ওকে বোঝাতে চাই, আমি পারি এবং এইটে বোঝাবার জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টায় ওকে সোফার উপর শুইয়ে দিলাম। ক্ষীণ দুর্বল ভাবে ও বাধা দিল এবং বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল।

বলল, 'না, ... কি চাও তুমি?'

'আমি কি চাই?'

হায়! ও শুধোচ্ছে আমি কি চাই! আমি শুদ্ধ দেখাতে চাই, আমি পারি, ঠিক পারি। কেবল দূর থেকে নয়, সামনাসামনিও পারি। সে রকমের লোক আমি নই। এইটেই প্রমাণ করতে চাই, আমায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলবে না, আর চোখ-রাঙিয়েও আমায় দাবিয়ে রাখা অসম্ভব। না, না, বাস্তবিকই তাই; এ রকম ব্যাপারে আজ পর্যন্ত আমার মতলব হাসিল না ক'রে আমি কখনও বিরত হই নি ... এবং এ ক্ষেত্রেও হাসিল করতে চাইলাম।

'না! ... না, তবে ...'

'হাঁ, আমি চাই-ই; এই আমার মতলব।'

'না, শোন আগে !' ও চেঁচিয়ে উঠল। পরে আমায় আঘাত দেবার জন্যে বললে, 'তুমি যে উন্মাদ নও, এ বিষয়ে নিশ্চিত নই !'

আপনা থেকেই নিজেকে সামলে নিলাম এবং বললাম, 'তুমি সত্যই কি তাই মনে কর ?'

'নিশ্চয়, ভগবান জানেন, নিশ্চয় তাই বিশ্বাস করি। কি অদ্ভুত তোমায় দেখাচ্ছে। আর সেই সেদিন বিকালে তুমি যখন আমার অনুসরণ কর, তখন কি তুমি মাতাল অবস্থায় ছিলে না ?'

'না। তবে একান্ত ক্ষুধার্তও ছিলাম না ; তখন সবেমাত্র খেয়েছিলাম। ...'

'হাঁ, তা হবে ; তাইতেই তোমার শরীর আরও খারাপ ছিল !'

'মাতাল থাকাটাই কি বাঞ্ছনীয় ছিল ?'

'হাঁ ... উঃ ... তোমায় ভারী ভয় করছে ! ভগবান, আমায় বাঁচাও !'

মুহূর্তকাল ভাবলাম। না, ওকে ছাড়তে পারি নে। সোফায় ব'সে সন্ধ্যেবেলা বাজে কথা মনে করবার দরকার নেই। 'পেটিকোটটা খুলে ফেলো—এক্ষুনি।' এমন সময়ে কি সব বাজে অজুহাতও লোকের মনে আসে, এ ওর বাজে লজ্জা, কৃত্রিম সতীপনা ; আমি বুঝতে পারি নি যেন ! একটু কঠিনই আমায় হতে হচ্ছে ! 'চুপ ! গোল করতে হবে না !'

প্রাণপণ চেষ্টায় ও আত্মরক্ষা করতে লাগল—এ চেষ্টার মধ্যে লজ্জাশীলতার কোনই লক্ষণ নেই। আমার হাত লেগে বাতিটা নিভে গেল, এ যেন নেহাতই আকস্মিক। ও হতাশ হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।—তারপর চুপিচুপি বললে, 'না, ও নয়—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ও নয় ! তুমি বরং যত ইচ্ছা চুমো খাও, কিন্তু ও নয় ! ওগো, দয়া কর, দয়া কর আমায় ...'

তৎক্ষণাৎ থামলাম। ওর কণ্ঠস্বর এমন ভীতু, অসহায় করুণ যে আমার মর্মে গিয়ে তা বিঁধল। চুম্বন করবার সুযোগ দিয়ে ও গুণা-

গারি দিতে চায়! কি সুন্দর, কি সুন্দর সরলতা! হাঁটু গেড়ে ওর সামনে আমার বসা উচিত।

সম্পূর্ণ উদভ্রান্ত হয়ে বললাম, 'কিন্তু সুন্দরী, বুঝতে পারছি নে … সত্যি আমি ধারণাও করতে পারছি নে যে, এ তোমার কি খেলা! …'

ও উঠে বাতিটা আবার জ্বালল, ওর হাত কাঁপছিল। সোফায় হেলান দিয়ে বসলাম মাত্র, আর কিছুই করলাম না। এখন কি হবে? সত্যি বলতে কি, মেজাজটা আমার একদম বিগড়ে গেল।

দেয়ালে একটা ঘড়ি ছিল, ও তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বললে, 'ওঃ, এত রাত হয়ে গেছে! পাশের ঘরের মেয়েটি হয় ত এখনই ফিরবে।' এই কথাটাই মাত্র ও প্রথম বলল। ইঙ্গিতটা বুঝে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম। ও ওর জ্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে দেবার জন্যে হাতে তুলে নিল, তারপর কি ভেবে আবার ফেলে রেখে চুল্লীর পাশে গেল। ও যেন আমায় চলে যেতেই ইঙ্গিত করছে। আমি বললাম, 'তোমার বাবা কি সৈন্য-বিভাগে কাজ করতেন?' জিজ্ঞাসা ক'রেই চ'লে আসবার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

'হাঁ; তিনি সামরিক কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তুমি কেমন ক'রে তা জানলে?'

'আমি জানতাম না, তবে আমার যেন কেন তা মনে হ'ল।'

'ভারী অদ্ভুত ত!'

হাঁ, অদ্ভুতই বটে। জীবনে এমন অনেক জায়গায় এসেছি যেখানে এসেই আমার পূর্ব-সংস্কার এমনি ধারা মিলে গেছে। এ আমার উন্মত্ততার একটা লক্ষণ নয় ত!'

তৎক্ষণাৎ ও আমার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। মনে হ'ল, আমার উপস্থিতি ওকে ভারী উত্যক্ত ক'রে তুলছে। কাজেই

অগোণে চ'লে আসব স্থির করলাম। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ও কি আর আমায় চুমো খাবে না —করমর্দনও কি করবে না? দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ও বললে, 'তা হ'লে তুমি কি এখনই চলে যাচ্ছ?' ও চুল্লীর সামনে তবু চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল।

জবাব দিলাম না। দারুণ অপ্রতিভ অবস্থায় দাঁড়িয়ে কিছু না ব'লে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। চলেই ত যাচ্ছি, যাওয়ার সময় ও কেন আমায় একটু সম্ভাষণও করছে না? ওকে ত আর বিরক্ত করছিনে। ও যেন এরই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আমার এলাকার বাইরে। বিদায় নিতে গিয়ে এমন কিছু বলা দরকার মনে করলাম, যা ওর মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে। ওর ব্যবহারে একেই ত মনটা বিরূপ হয়ে গিয়েছিল, তাই ও কথা মনে হ'তেই সব প্রথম গর্বিত বা উদাসীন, উদ্বিগ্ন বা ক্ষুণ্ণ—কিছুই না হয়ে তৎক্ষণাৎ যা-তা বাজে বকতে শুরু ক'রে দিলাম। কিন্তু সে রকম হৃদয়গ্রাহী কোন কথাই মুখ দিয়ে বার হ'ল না; আমার সমস্ত বলা-কওয়ার মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। আচ্ছা, ও কেন আমায় সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছে না? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। হাঁ, সত্যিই ত, কেন দিবে না? এর জন্যে এতটুকু 'কিন্তু' করবার দরকার নেই। 'পাশের ঘরের মেয়েটি এখনই ফিরবে,' এ কথা মনে করিয়ে না দিয়েও ত ও অনায়াসেই স্পষ্ট বলতে পারত, 'এখনই তোমায় যেতে হবে, মাকে আনতে যাব আমি। এবং আমার সঙ্গে তোমার যেতে হবে না।' তা হ'লে এই কথায় কি বুঝতে হবে যে, ওর ব্যবহারের সঙ্গে ওর মনের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। হাঁ, সত্যি; ও এ কথাও মনে করছে নিশ্চয়। তৎক্ষণাৎ ওর মনের ভাব বুঝতে পারলাম। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে আমার বেশি বেগ পেতে হ'ল না। ওর জ্যাকেটটা ও যে ভাবে গ্রহণ

করল এবং পরক্ষণেই একপাশে ফেলে রাখল তার থেকেই ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারলাম। আগেই বলেছি, এ সম্বন্ধে আমার আগে বুঝবার একটা সহজাত সংস্কার রয়েছে, তাই এর মূলে নিছক বাতুলতা আছে ব'লে মনে করবার কোন কারণই নেই। ...

ও চেঁচিয়ে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই, ও কথাটার জন্যে আমায় ক্ষমা করো, মুখ-ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে এসেছে।' এ কথা ব'লেও কিন্তু ও নীরবে একই জায়গায় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আমার সামনে পর্যন্তও একটু এল না।

রোখ্‌ চড়ে গেল। যা-তা বাজে ব'কে এবং চ'লে না এসে ওকে যে উত্যক্তই করছি মাত্র এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তবু সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ জানতাম যে, আমার কথায় ওর মনের কিছুমাত্র বদল হবে না, তবু থামলাম না।

জোর ক'রেই বলতে পারি, লোকে বাতুল নাও হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে যে তার জ্ঞানগম্য কিছুই থাকতে নেই, এ কথা অবশ্য কিছুতেই বলা চলে না। এমন প্রকৃতির লোকও আছে যারা সামান্যতেই খুশি হয়ে থাকে এবং একটা কঠিন শব্দেই একেবারে ঘায়েল হয়ে পড়ে। আমার প্রকৃতিও সেইরূপ, এই হচ্ছে আমার বলবার কথা। আসল কথা, আমার দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আর সেই কারণে, এ ব্যাপারটায় আমার মনটা ভারী অপ্রীতিকর হয়ে উঠল। হাঁ, সত্যি অপ্রীতিকর; কি করব, দুর্ভাগ্য! কিন্তু তা হ'লেও এই অপ্রীতিকর ভাবেরও একটা উপযোগিতা আছে। জীবনের কোন কোন অবস্থাবিশেষে এর থেকে অনেক সাহায্যও আমি পেয়েছি। পরম বুদ্ধিমানের চাইতে সামান্য বুদ্ধিমান ঢের বেশি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়ে থাকে। দরিদ্র এক-পা এগোতে গেলে চারিদিক বিশেষ ক'রে দেখে নেয়, এবং কে কি বলাবলি করে

তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনে—এটা যেন তার স্বভাব, তার চিন্তা আর বোধশক্তির একটা দারুণ কর্তব্য। শোনার শক্তি তার অপরিসীম, সে অত্যন্ত অভিমানী; জীবনের অভিজ্ঞতা তার প্রচুর, জীবনের দহনজ্বালা সে অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে—একান্তে গোপনে।...

অন্তরের সে দহনজ্বালা সম্বন্ধে যতই বলি, ও ততই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অবশেষে হতাশ হয়ে ও বার কয়েক ব'লে উঠল, 'ভগবান!' 'ভগবান!' সঙ্গে সঙ্গেই হাততালি দিল। বেশ বুঝতে পারছি যে, আমি ওকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছি। অথচ ওকে যন্ত্রণা দেবার ইচ্ছে মোটেই আমার ছিল না কিন্তু তবু যন্ত্রণা দিলাম। ওকে আঘাত দেবার যে মতলব আমার ছিল, তা যখন এই ভাবে সার্থক হ'ল তখন ওর সেই হতাশব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে আমি অনেকটা নরম হয়ে গেলাম। এবং ব'লে উঠলাম, 'এই যাচ্ছি, আমি এখনই যাচ্ছি। দোরও খুলেছি। আসি তা হ'লে! চ'লেই ত যাচ্ছি, একটা কথা অবশ্য জবাবে বলতে পার। যদি ব্যথা পাও, আর কখনও দেখাও করব না তোমার সঙ্গে। কিন্তু শেষ সময়ে কেন একটু শান্তি দিচ্ছ না? আমি তোমার কি করেছি? তোমার চলার পথে আমি ত আর বাধা হয়ে দাঁড়াই নি, দাঁড়িয়েছি কি? তুমি যেন আমায় আর চিনতেই চাও না, এত শীঘ্রই আমার প্রতি বিমুখ হ'লে? আমায় এমন করে ছেড়েছ যে, সত্যি মনে করছি, আগের চাইতে আজ আমি ঢের বেশি দুর্ভাগা কিন্তু সত্যি আমি পাগল নই। তুমি বেশ জান, এবং একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে যে, আমা হ'তে তোমার আর ভয়ের কোন কারণই নেই। কাজেই সামনে এসে বিদায় দাও—নয় ত বল আমিই তোমার সামনে গিয়ে বিদায় নিই। তোমার আর কোন ভয় নেই, কোন ক্ষতি করব না। শুধু তোমার সামনে এক মিনিটের জন্যে হাঁটু গেড়ে বসব—একটি বার মাত্র এই মেঝের ওইখানটায় হাঁটু গেড়ে বসব, সে সুযোগও কি পাব

না? দেখছি তুমি ভয় পেয়ে গেছ। না, আর তোমায় স্পর্শও করব না, সত্যি বলছি, তোমায় স্পর্শও করব না; শুনছ? এত ভয় পাচ্ছ কেন? চুপ ক'রেই ত দাঁড়িয়ে আছি, নড়াচড়াও ত করছি নে গালিচার উপর একবার হাঁটু গেড়ে বসব মাত্র—ওই খানটায়, ওই লাল জায়গাটায়, কিন্তু তুমি দেখছি ভারী ভীত হয়ে পড়েছ, তোমার চোখে মুখে একটা দারুণ ভীতি ফুটে উঠেছে আর তাই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যখন বলেছিলাম যে আমি পারি, তখন থেকে আর এক-পাও আমি এগোই নি; এগিয়েছি কি? সেই তখন থেকে একেবারে অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি, তুমি আমার সামনে আসতে ভয় পাচ্ছ। আমি ভাবতেও পারছি নে যে, কি ক'রে তুমি আমায় উন্মাদ বলতে পারলে। মনে হয়, আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা যে সত্য তুমিও তা বিশ্বাস কর না; কেমন, নয় কি? সে অনেক দিন আগের কথা, একবার গরমের দিনে আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। তখন কঠোর পরিশ্রম করতাম, যথাসময়ে খেতে ভুল হ'ত, কত বিষয়ই না চিন্তা করতাম। দিনের পর দিন এ ভাবে কেটেছে। সময়মত খাবার কথা মনে থাকা আমার উচিত; কিন্তু সত্যি বলছি, রোজই আমার ভুল হ'ত। মিথ্যা যদি ব'লে থাকি ত ভগবান আমায় শাস্তি নিশ্চয় দেবেন। কাজেই তুমি যদি আমার সম্বন্ধে এ ভাবই পোষণ কর ত আমার প্রতি বিশেষ অবিচার করা হবে। অভাবে পড়ে যে ও রকম করতাম তা নয়, পয়সা না থাকলে ধারও ত যথেষ্টই পেতে পারি—দু-তিনখানা দোকানে ধার পেয়েও থাকি। তা ছাড়া, তখন পকেটে বেশ টাকাপয়সাও থাকত, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাবার কিনতে একদম ভুলে যেতাম। শুনছ! তুমি ত কিছুই বলছ না দেখছি; জবাবেও ত কিছুই বলছ না; চুল্লীর সামনে থেকে একটুও ত নড়ছ না; যেন আমার প্রতীক্ষায়ই ওখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছ।...'

তৎক্ষণাৎ ও দু-বাহু প্রসারিত ক'রে চট্‌ ক'রে আমার দিকে এগিয়ে এল। দারুণ অবিশ্বাসের সঙ্গে ওর দিকে তাকালাম। ও কি সত্যিকারের আগ্রহ নিয়েই এল, না, আমার হাত এড়াবার জন্যেই এল? বাহু দুটি দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরল; দেখলাম, ওর চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত; নীরবে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম। ও ওর মুখ এগিয়ে দিল; কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই যে ওর এই দান সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

ও যেন কি বলল! আমি যেন শুনলাম ও বলছে, 'সকল দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে।' খুব নীচু গলায় অস্পষ্টস্বরে কথাটা বলল। হ'তে পারে, আমি ভুলও শুনে থাকতে পারি। হ'তে পারে, ঠিক এই কথাগুলিই ও বলে নি। তা হ'লেও ও কিন্তু আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দু-হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরবার সুবিধা হবে মনে ক'রে গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অবশ্য মিনিটখানেক মাত্র জড়িয়ে ধ'রে ছিল। আমার মনে হ'ল, ও যেন জোর ক'রেই এই মমতাটুকু দেখাল। তাই বললাম, 'বাঃ, এ ত বেশ ভাল!'

আর একটি কথাও বললাম না। দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধ'রে তখনই আবার ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে এলাম এবং দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। ও আমার পিছনে সেইখানটায় দাঁড়িয়ে রইল।

৪

শীত আরম্ভ হয়েছে—আর্দ্র সিক্ত শীত, বলতে গেলে বরফ পড়তে তখনও মোটেই শুরু করে নি। কুজ্ঝটিকাময়, অন্ধকার, দীর্ঘ রাত্রি যেন শেষ হতে চায় না, গোটা সপ্তাহে একবারও জোরে বাতাস বয় নি। রাজপথে দিনের বেলাও গ্যাসের আলো জ্বালতে হয়, তবু কিন্তু কুয়াশায় পথ চলতে লোকের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে, অতটুকু দূর থেকেও কেউ কাউকে দেখতে পায় না। প্রত্যেকটি শব্দ, গীর্জার ঢং ঢং, ঘোড়ার খুরের শব্দ, সব কিছু মিলিয়ে যেন প্রকৃতির কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল এবং সেই কিম্ভূতকিমাকার শব্দ প্রাণে একটা ভীতির সঞ্চার করছিল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চ'লে গেল কিন্তু আবহাওয়ার কিছুমাত্র পরিবর্তন হ'ল না।

আমি তখন ভ্যাটারল্যাণ্ড সরাইখানায় আড্ডা গেড়েছি। যতই দিন যাচ্ছিল ততই এই সরাইখানার প্রতি অকৃষ্ট হচ্ছিলাম, কেন না, অনাহারে থাকলেও এখানে মাথা গুজবার একটি আশ্রয় জুটেছিল। টাকাপয়সা যা সামান্য ছিল, তা অনেক দিন আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছল, কিন্তু তবু প্রতিদিন এখানে এসে রাত্তিরে আশ্রয় নিতাম, যেন এখানে থাকবার অধিকারটা আমার জন্মে গেছে। কেউ আমায় বাধা দিত না, আমারও কোন সঙ্কোচ ছিল না। বাড়ীওয়ালি কিছুই বলত না বটে কিন্তু তা সত্বেও তাকে যে ভাড়া দিতে পারছিলাম না, তার জন্যে আমার মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না। এমনই ক'রে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। অনেক দিন পরে আবার রীতিমত লিখতে শুরু ক'রে

দিয়েছিলাম বটে কিন্তু এমন কিছুই লিখতে পারছিলাম না—যা আমার চিত্তে আত্মপ্রসাদ এনে দিতে পারে। ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা দিনরাত্তির ভীষণ খাটছিলাম। কি লিখছি সে দিকে খেয়াল ছিল না, তবে লেখা শেষ হ'লেই দেখতে পেতাম যে তা ভাল হয় নি। পূর্বেই বলেছি, ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, তবু বৃথা চেষ্টাই আমি করছিলাম। তেতলার একখানা সর্বোৎকৃষ্ট ঘরে বসে আমার এ ব্যর্থ চেষ্টা ক্রমাগত চলছিল। যত দিন আমার পকেটে পয়সা ছিল এবং আবশ্যক খরচ চালাতে পেরেছি, তত দিন এই ঘরে কোন রকম অসুবিধাই আমার হয় নি। সব সময়ই আশার দোলায় আমার মন দুলত, একটা না একটা লেখা ভাল ক'রে লিখতে পারলে তার থেকেই ঘরভাড়া ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয় যোগাতে পারব। তাই ক্রমাগত ওই রকম মেহনত ক'রে চলেছিলাম। বিশেষ ক'রে আগুন সম্বন্ধে একটা রূপক নিয়ে আমার সকল শক্তি সকল কল্পনার ভাণ্ডার উজার ক'রে দিয়েছিলাম। আশা ছিল, এ লেখাটা দিয়ে সম্পাদক মশায়ের কাছ থেকে বেশ মোটা রকম কিছু পাবই। এবারে তিনি বুঝতে পারবেন, তাঁর দয়া অপাত্রে ন্যস্ত হয় নি। লেখাটা পেয়েই যে তিনি সাগ্রহে সেটি প'ড়ে দেখবেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অনুকূল প্রেরণার অপেক্ষায় আমি দিন গুণছিলাম। কিন্তু সে প্রেরণা আমার মধ্যে এখনও কেন এল না? আজ যে আমার অন্তর একেবারে ফাঁকা। বাড়ীওয়ালি প্রতিদিনই আমায় সকালে বিকেলে খানিকটা রুটি-মাখন দিত। কাজেই উপবাসের দুর্বলতা তখন বড় একটা আমার ছিল না। এখন অবশ্য লিখতে গেলে হাত জ্বালা করে না এবং তেতলার জানলা দিয়ে দূরে চাইতে গেলেও মাথা ঘোরে না। সকল রকমেই ভাল আছি, কিন্তু তবু কেন যে আমার সে রূপকটা শেষ করতে পারছিলাম না তা বোঝা দুঃসাধ্য। কেন এমন হয়! ···

তারপর একদিন এল, যেদিন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সত্যি সত্যি আমি কতটা দুর্বলই না হয়ে পড়েছি, কি শোচনীয় অসামার্থ্য নিয়েই না আমার নিরেট মস্তিষ্ককে পরিচালনা করতে হচ্ছিল।

সেদিন সকালে বাড়ীওয়ালি এসে একটা হিসাব দেখে দিতে বললে। হিসাবটা নাকি সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। কোথায় নাকি গোলমাল থেকেই যাচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ হিসাবটা নিয়ে ঠিকটা দেখতে লেগে গেলাম। বাড়ীওয়ালি আমার সামনে ব'সে আমার দিকে চেয়েছিল। একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিকটা দেখে গেলাম, ঠিকটা ঠিকই আছে। দ্বিতীয় বারও সেই একই ফল হ'ল। বাড়ীওয়ালির দিকে তাকালাম, আমি কি বলি তারই প্রতীক্ষায় ও তখন সাগ্রহে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমার দৃষ্টি এড়াল না যে, বাড়ীওয়ালি গর্ভবতী ; বলা বাহুল্য, যাকে হাঁ ক'রে তাকান বলে, তেমনিভাবে অবশ্য তার দিকে আমি তাকাই নি।

'হিসাবটা ঠিকই আছে,' বললাম।

'না, ঠিক নেই। আর একবার প্রত্যেক দফা ধ'রে ধ'রে যোগ দিয়ে দেখ।' বাড়ীওয়ালি বলল। 'ও অঙ্কটা কোন মতেই হ'তে পারে না, আমি ঠিক জানি।'

অগত্যা আমি প্রত্যেক দফা পর পর বসিয়ে দেখতে লাগলাম—

রুটি ২ খানা	৶১০
সাবান	।০
ল্যাম্পের চিমনি	৶০
মাখন ।৴০ ছটাক	

এ রকম হিসেব ঠিক দিতে প্রচুর বিদ্যার দরকার হয় না—দু-দশ আনার হিসেব ত মুখে মুখেই হতে পারে। কোথায় যে ভুল তা বার করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। হিসেবটা নিয়ে মিনিট কয়েক

চেষ্টাচরিত্তির করবার পর মনে হ'ল যে, হিসাবের সবগুলি অঙ্ক যেন আমার মগজে তাণ্ডব নৃত্য শুরু ক'রে দিয়েছে এবং কোন্‌টা জমা আর কোন্‌টা খরচ কিছুই হদিস পেলাম না। সব যেন গুলিয়ে গেছে, সবকিছু একসঙ্গে তাল পাকিয়ে ফেললাম। সর্বশেষে আর একটা খরচের অঙ্কে এসে আমার মননশক্তি আর এগোতে পারলে না,—পাঁচ ছটাক পনির—৷/০ আনা। এই অঙ্কটার দিকেই হাঁ-ক'রে চেয়ে রইলাম।

'কি বিশ্রী ক'রেই না লেখা হয়েছে,' হতাশ হয়ে ব'লে উঠলাম। 'কি বিপদ, এখানে দেখছি আবার পাঁচ ছটাক পনির খরচ লেখা রয়েছে। এমন ধারা হিসেব কেউ কখনও শুনেছে? হাঁ, এই দেখ, নিজেই দেখতে পাবে।'

'হুঁ,' ও বললে; 'এ জিনিস অমনি ক'রেই লেখা হয়। দিনেমারদের তৈরি কি-না। হাঁ, ঠিক আছে—পাঁচ ছটাক পনির—ঠিক আছে।'

ওকে বাধা দিলাম বটে কিন্তু আমিও তার বেশি আর কিছুই বুঝতে পারি নি। বললাম, 'হাঁ, সবকিছুই বুছতে পেরেছি।'

মাসকয়েক আগে যে হিসেব মুহূর্তের মধ্যে ঠিক দিতে পারতাম, সেই সামান্য হিসেবটা নিয়ে আর একবার ব'সে গেলাম। ভয়ানক ভাবে ঘাম হ'তে লাগল। প্রাণপণে এই খুদে দুর্জ্ঞেয় হিসেবটা নিয়ে মগজ চালনা করতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। খুব যেন হিসেবটা নিয়ে ভাবছি এমনই ভাবখানা দেখিয়ে ঘন ঘন মিট্‌ মিট্‌ ক'রে চাইছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হ'ল। এই পনিরের অঙ্কটাই আমার মাথা গুলিয়ে দিল, হিসেবটা ঠিক হচ্ছিল কিন্তু এই পনিরের অঙ্কটা যেন চলতে চলতে হঠাৎ আমার মগজে মট্‌ ক'রে ভেঙে গেল—হিসেবটা শেষ পর্যন্ত আর এগোতে পারল না।

কিন্তু তবু যেন হিসাবটা নিয়েই ভাবছি, এই ভাবটা দেখাবার জন্যেই বার বার ঠোঁট কামড়িয়ে জোরে জোরে অঙ্কগুলি আওড়াতে লাগলাম।

এখনই যেন হয়ে যাবে। বাড়ীওয়ালি তখনও ব'সে অপেক্ষা করছিল। শেষটায় বললাম, 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ত বার বার দেখলাম, কোনরকম ভুল ত নজরে এল না।'

ও জবাবে বলল, 'তাই নাকি! সত্যি ভুল নেই?'

আমি কিন্তু দেখলাম যে, ও আমার কথা বিশ্বাসই করল না এবং ওর কথায় যেন বেশ একটু বিদ্রূপের সুর প্রকাশ পেল। এ সুর ওর কথায় আর কখনও পাইনি। ও বললে, 'আমি হয় ত ছটাক-কাচ্চার হিসেবে অভ্যস্ত নই, কাজেই বাধ্য হয়েই ও এমন লোককে দিয়ে হিসেবটা দেখিয়ে নেবে, যে ছটাক-কাচ্চার হিসেবে অভ্যস্ত। আমায় লজ্জা দিবার জন্যেই যে ও এ কথাগুলি বললে তা অবশ্য নয়, আঘাত দেবার মতলবও ওর ছিল না; অমনি গম্ভীরভাবে ভেবে চিন্তে ও কথাগুলি বললে। দরজা পর্যন্ত গিয়ে আমার দিকে না তাকিয়েই আবার বলল, 'তোমার সময় নষ্ট করলাম, মাফ করো!'

ব'লেই ও চ'লে গেল।

মুহূর্তের মধ্যেই আবার দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। হয় ত সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল, আবার তখুনই ফিরে এল।

বললে, 'আমায় ভুল বুঝো না। তোমার কাছে কিঞ্চিৎ পাওনা হয়েছে, হয় নি কি? প্রায় তিন সপ্তাহ হ'ল এখানে এসেছ। দেখতেই ত পাচ্ছ আমার সংসারটি নেহাৎ ছোট নয়, কাজেই খরচপত্তরও আছে, তার উপর যদি আবার তোমাদেরও ধারে দিতে হয় ত আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হয় না কি? বেশি কি ...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'তোমায় ত বলেইছি যে, আমি একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি। ওটা শেষ করতে পারলেই তার টাকা থেকেই তোমার পাওনা সব শোধ দিতে পারব। তুমি ভেবো না কিছু। ...'

'হাঁ; কিন্তু ও লেখাটা যে তোমার কখনও শেষ হবে না এ কথাও ঠিকই।'

'তুমি কি তাই মনে কর? হয় ত কালই লেখার ঝোঁক আসবে, আজ রাত্রেও আসতে পারে। কিছুই অসম্ভব নয়, আজ রাত্রেই হয় ত আসবে আর তা হ'লে লেখাটা শেষ করতে বড় জোর আধ ঘণ্টাই লাগবে। বুঝতেই ত পাচ্ছ, অন্য লোকের মত আমার কাজ নয়, যখন খুশি লিখতে বসলেই লেখা আসে না। আমায় অনুকূল প্রেরণার প্রতীক্ষা করতে হয়, আর সেই প্রেরণা যে কখন্ কোন্ সময় আসবে তা কেউ বলতে পারে না—সে আপনা থেকেই আসে। ...'

বাড়ীওয়ালি চ'লে গেল কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, আমার প্রতি যে তার বিশ্বাস ছিল তার মূল যেন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে।

ও চ'লে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিরাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলাম। না, না, কিছুতেই আর আমার নিস্তার নেই। মস্তিষ্ক যেন একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। তুচ্ছ পাঁচ ছটাক পনিরের হিসেবও যখন কষতে পারলাম না তখন যে আমি একেবারে নিরেট অপদার্থ ব'নে গেছি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও ত এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে কত প্রশ্নই না করছি, তবু কি বলতে হবে যে, আমি সকল জ্ঞানই হারিয়েছি? হিসেবটা দেখবার ফাঁকেই কি এটা আমার নজরে আসে নি যে, বাড়ীওয়ালি গর্ভবতী? এটা জানবার ত আর কোন উপায়ই ছিল না, কেউ ত সে কথা আমায় বলে নি, আর চেষ্টা ক'রেও তা আমায় দেখতে হয় নি। নিজের চোখেই ঘরে ব'সে ব'সে দেখলাম—ছটাক-কাচ্চার হিসেব মেলাতে গিয়ে যখন নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম তখনই চোখে পড়ল এবং দেখেই বুঝতে পারলাম। এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কেমন ক'রে নিজের কাছে দিই?

জানলার সামনে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দূরে একটা

গলিতে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছিল। ছেলেগুলির সকলকারই পোশাক নোংরা, ছেঁড়া। তারা একটা খালি শিশি নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছিল এবং চেঁচামিচিও কম করছিল না। সংসার করতে যে সব জিনিস দরকার হয় তা বোঝাই হয়ে রাস্তায় একটা গাড়ী অপেক্ষা করছে। মনে হ'ল, কোন পরিবার হয় ত বাসা বদল করছে।* তোষক, আসবাবপত্র, লাল রঙের খান কয়েক তিনপায়া চেয়ার, একটা মাদুর, একটা পুরানো ইস্ত্রি, টিনের বাসনকোসন ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে।

একটা কুৎসিত ছোট্ট মেয়ে, মুখময় তার সিক্‌নি, ঝাঁকুনি লেগে প'ড়ে না যায় তাই দু-হাতে জিনিসপত্র শক্ত ক'রে ধ'রে বোঝার উপর ব'সে আছে। মেয়েটি রং-চটা দাগ-লাগা মাদুরগুলির উপর পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বসে ছেলেদের খেলা দেখছিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সবই দেখছিলাম। সুমুখে যা যা সব ঘটছে তা বুঝতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হচ্ছিল না। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এই সব লক্ষ্য করছিলাম তখন বাড়ীওয়ালির দাসীটা রান্নাঘরে গান করছিল, ঠিক আমারই পাশের ঘরে। তার গানের সুরটা আমারও জানা ছিল এবং সে ঠিক সুরে গাইতে পারে কি-না জানবার জন্যে আগাগোড়া গানটা শোনলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল যে, মগজ দেউলে হ'লে সত্যি কেউ কখনই তা পারে না। অন্য আর দশ জনের মতই আমার জ্ঞানও তখন বেশ টন্‌টনেই আছে তা হ'লে।

হঠাৎ দেখলাম, রাস্তায় যে ছেলেগুলি খেলা করছিল তাদের দুজন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পরস্পরকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল। দুটো বাচ্চা ছেলে, তাদের একটিকে চিনলাম,—বাড়ীওয়ালির ছেলে। তারা

* নরওয়েতে বাড়ী বদল করতে হ'লে বছরে দুই বার—মার্চ ও অক্টোবর মাসের ১৪ই তারিখ করতে হয়।

পরস্পরকে কি বলাবলি করছে শুনবার জন্যে জানলার কপাট দুখানা ভাল ক'রে মেললাম এবং তৎক্ষণাৎ ছেলেগুলি আমার জানলার নীচে এসে জমায়েত হ'ল এবং ঔৎসুক্যের সঙ্গে উপরের দিকে তাকাল। তারা কি কিছু চাইছে? সে কিছু কি আমায় নীচে ছুঁড়ে দিতে হবে? শুক্‌ন ফুল, চুরুটের টুকরো বা অমনি আর কিছু—যা নিয়ে তারা তাদের তুষার পীড়িত মুখে সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এদিকে সেই খুদে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি পরস্পরকে বেশ গালাগালি দিচ্ছিল।

দুটি বালকের মুখ থেকে দুষ্ট কীটের ভীষণ ভন্‌ভনানির মত ঝাঁকে ঝাঁকে গালাগাল বেরুতে লাগল; ভীষণ গালাগালি—চোর-ডাকাতের ইতর ভাষা, খালাসীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ, কিছুই বাদ গেল না; সম্ভবত এ সব তারা জেটি থেকে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। ছেলে দুটো এতটা মত্ত হয়ে গেছল যে, বাড়ীওয়ালির 'আগমনটা লক্ষ্যও করতে পরে নি। গোলমাল শুনে ব্যাপার কি জানবার জন্যে সে বেরিয়ে এসেছিল।

মাকে দেখতে পেয়েই পুত্র বলতে লাগল, 'হাঁ মা, ও আমার গলা টিপে ধরেছিল, এতক্ষণ নিঃশ্বাসও আমি নিতে পারি নি।'

এদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দারুণ বিদ্বেষের সঙ্গে দন্তপ্রদর্শন ক'রে পাশেই দণ্ডায়মান ছিল, ভীষণ রেগে উঠে চেঁচিয়ে সে ব'লে উঠল, মিথ্যেবাদী পাজী কোথাকার! তোর মত হারামিকে কেউ গলা টিপে ধরতে পারে রে উল্লুকের বাচ্চা। পাব না একদিন …'

দশ বছর বয়সের গুণধর পুত্রকে মাতা ঘাড়ে ধ'রে ভিতরে টানতে টানতে বললে, 'হতভাগা ছেলে, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! নোড়া দিয়ে তোর দাঁত না ভাঙ্গি ত আমার নামই নেই। এসব আকথা কুকথা কোথায় শিখলি? বাজারে গালাগাল কে তোকে শেখাল বল্ হতভাগা! আয়, ভিতরে আয় আগে!'

'না, যাব না আমি।'

'যেতেই হবে তোকে।'

'না, আমি যাব না।'

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, মায়ের মেজাজ ক্রমে চড়ে যাচ্ছে। অপ্রীতিকর দৃশ্য আমায় ভয়ানক উত্তেজিত ক'রে তুলল। সহ্য হ'ল না, ছেলেটাকে ডাকলাম। তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে এ অপ্রীতিকর দৃশ্যটা বন্ধ ক'রে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

শেষবার খুব জোরে চেঁচিয়েই ডেকেছিলাম, আমার ডাক শুনতে পেয়ে মাতা আমার দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনে একবার চাইল। তৎক্ষণাৎ সে শান্ত হ'ল, বিরক্তি ও স্পষ্ট বিদ্বেষসূচক দৃষ্টি হেনে ছেলেকে ভৎ'সনা করতে করতে বাড়ীতে ঢুকল। সে ভৎ'সনা বাক্য এত জোরে আওড়াল যেন আমি শুনতে পাই। ছেলেকে বলছিল, 'ধিক তোকে, তোর এ অশিষ্ট ব্যবহার বাইরের লোক পর্যন্ত দেখতে পেল, তোর লজ্জিত হওয়া উচিত।'

সব কিছুই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম—একটা সামান্য খুঁটিনাটিও আমার মনোযোগ এড়াতে পারে নি। প্রত্যেকটা বিষয়ই বিশেষ ক'রে ভেবে চিন্তে তার সম্বন্ধে নিজের অভিমত দাঁড় করিয়েছি। সুতরাং আমার মস্তিষ্কবিকৃতির কোনই লক্ষণ খুঁজে পেলাম না।

নিজেই নিজেকে তখন বললাম, 'শুনছ, নিজের মস্তিষ্কবিকৃতি নিয়ে নিজেকে এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে কতই না উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছ। তোমার এই ফাঁকি আর চলবে না। প্রত্যেকটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করতে চাওয়াটা কি উন্মত্ততার লক্ষণ?' নিজেই আবার জবাব দিলাম, 'বাধ্য হয়েই তোমার ব্যবহারকে বিদ্রূপ না ক'রে উপায় নেই। এর বিচারের ভার যদি আমারই উপর ন্যস্ত হয় ত বলতে পারি যে, এতে

ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবারও একটা দিক আছে। কেন না, সামান্য বিষয়ে, ঠেকতে হয়, এ ত আকছার প্রত্যেকের জীবনেই দেখতে পাওয়া যায়। এতে আর এমন কি বিশেষত্ব আছে—এ একেবারে নিছক আকস্মিক ব্যাপার। সামান্য হিসেবের ব্যাপারে অবশ্যই তোমায় আমি মোটেই দোষ দিচ্ছি নে। নেহাৎ সামান্য পাঁচ ছটাক পনির ত সাধরণ একটা ভিখিরীও কিনে থাকে, তার মধ্যে আর বাহাদুরী কি আছে। হাঃ হাঃ।—রসুন ও মরিচ দিয়ে পনির খেতে কি আরাম! আবার সত্যি বলতে গেলে, এই পনির থেকেই কত রকম পোকা জন্মায়। ··· সেই তুচ্ছ পনিরের কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, দুনিয়ার সব চাইতে চালাক লোকের মাথাও তাতে গুলিয়ে যেতে পারে; পনিরের সে দুর্গন্ধেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যায়; ··· আর আমি সেই পনির নিয়েই সব চাইতে বড় তামাসা করেছি। ··· হাঁ, হিসেবে আমার যোগ্যতা আছে কি নেই তার প্রমাণ পেতে পার সত্যিকারের খাবারযোগ্য জিনিসের হিসেব গুণতে দাও, এখনই ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তা নয়,—পনির—ছোঃ! হ্যাঁ, মাখনের হিসাব বলতে বল, পাঁচ ছটাক কেন, পাঁচ কাচ্চার দামও বলতে আমার আটকাবে না। এ যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।'

নিজের এই উৎকট খেয়ালে নিজেই হেসে উঠলাম এবং এ যে এক মজার আমোদ তা বুঝতে পারলাম। একটু পরেই ও-ব্যাপারটা আমার মন থেকে একেবারে নিঃশেষে চ'লে গেল। অবস্থা তখন আমার বেশ ভাল, বলতে কি, খুব ভাল অবস্থাই; ভগবানের অনুগ্রহে মাথা বেশ পরিষ্কার, কোন গোল নেই, অভাব নেই সেখানে। মেঝেতে পাইচারি করতে করতে আমার খুশি ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং আপন মনেই নিজের সঙ্গে বিস্রম্ভালাপে মত্ত হয়ে পড়লাম। জোরে জোরে হেসে উঠলাম এবং তাতে ভারী আনন্দ বোধ হ'ল। তা ছাড়া আমার মন ও মস্তিষ্কটাকে কাজের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে এ রকম এক-

আধঘণ্টা একটু আনন্দ করা দরকার, যে সময়টা আর কোন চিন্তা-ভাবনাই থাকবে না কোন দিক থেকে।

খানিক বাদেই লেখাটা নিয়ে ব'সে গেলাম; তর্ তর্ ক'রে লেখা এগোতে লাগল, এত দিন যা হয় নি, আজ তাই হ'ল। লেখা অবশ্য খুব দ্রুত হয় নি, তবে আমার মনে হ'ল যে, যতটুকু লিখেছি তা প্রথম শ্রেণীর রচনা। ঘণ্টাখানেক অবলীলাক্রমে লিখে গেলাম, একটুও ক্লান্তি এল না।

লেখাটায় এ কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, একটা বইয়ের দোকানে আগুন লেগেছে। অতিক্রত কলম চলেছে। বিষয়টা এমন গুরুতর যে, আমার মনে হ'ল, এ পর্যন্ত যা-কিছু লিখেছি, এর তুলনায় তা কিছুই নয়। এই বিষয়টিতে আমার চিন্তাশক্তিকে গভীরভাবে নিয়োগ করলাম। দোকানের বইগুলিতেই আগুন ধরে নি, ধরেছে মগজে, মানুষের মগজ সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এই কথাটাই জোরের সঙ্গে আমি বলতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ ঠাস ক'রে একটা শব্দ ক'রে আমার ঘরের দোর খুলে গেল। বাড়ীওয়ালি হন্তদন্ত হয়ে ধা ক'রে ঘরে ঢুকল। সোজা এল, মুহূর্তের জন্য এক বার থামলও না।

ভাঙা গলায় একবার একটু চেঁচিয়ে ওঠলাম। আমার তখন এমন অবস্থা যেন আমায় কেউ একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরেছে।

ও বললে, 'কি ? কিছু বলছিলে কি ? আমি বলছিলাম কি—একজন লোক এখানে এসেছে এবং এই ঘরটায় তাকে থাকতে দেব ঠিক করেছি। আজ আমাদের সঙ্গে তোমায় নীচে শুতে হবে। হাঁ, সেখানে বিছানাও একটা পাবে।'

জবাব দেবার আগেই ও আর কোন রকম শিষ্টাচার না দেখিয়েই টেবিলের উপরকার ছড়ান কাগজপত্রগুলি আপনার মনে গোছাতে লেগে গেল। বলা বাহুল্য, তাতে ক'রে কাগজ-পত্র সবই তাদের শৃঙ্খলা হারাল।

আমার মনের সে অনুকূল অবস্থাটি একেবারে উবে গেল। একটা সুবিপুল হতাশা ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আপনার মনে জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে ফেলল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা কথাও বললাম না। গোছানো কাগজ-পত্রের পুলিন্দাটা আমার হাতে ছুঁড়ে দিল।

আমার তখন আর কিছু করবার ছিল না। ঘর ছেড়ে আসতে বাধ্য হলাম। এমনই ক'রে আমার সেই শুভ প্রেরণাটি একদম বিনষ্ট হয়ে গেল। সিঁড়ি-পথেই আগন্তুকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; যুবকের হাতে নঙ্গরের উল্কি-পরা। সঙ্গে তার জাহাজঘাটের একটা কুলি, তার কাঁধেপ্রকাণ্ড একটা সিন্দুক। সে যে খালাসী তা দেখলেই বোঝা যায়। রাত্রিবাসের জন্য এসেছে। কাজেই ঘরখানা সে বেশি দিনের জন্যে অধিকার ক'রে থাকবে না হয় ত। হয় ত কালই সে চলে যাবে, তখনই আমার ঘরে যাবার সৌভাগ্য হবে এবং তখন আবার অনুকূল প্রেরণা পাওয়া অসম্ভব হবে না। আর মিনিট পাঁচেকের জন্যে লিখবার প্রেরণা পেলেই লেখাটা আমার শেষ করতে পারব। কাজেই, অদৃষ্টের আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

ইতিপূর্বে বাড়ীওয়ালির ঘরে আর কখনও ঢুকি নি। এই একটি মাত্র ঘরেই বাড়ীওয়ালি, তার বাপ, তার স্বামী, চারটি ছেলে-মেয়ে দিনরাত্তির বসবাস করে। দাসীটা শোয় রান্নাঘরে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। কেউ সাড়া দিল না, তবে ভিতরে লোকজনের গলার স্বর শুনতে পেলাম।

বাড়ীওয়ালির স্বামী আমায় দেখে একটি কথাও বললে না, নমস্কার করলাম, প্রতি-নমস্কার জানাল না, একবার মাত্র অবজ্ঞাভরে আমার দিকে তাকাল—দেখে মনে হ'ল যেন আমার সঙ্গে তার কোন চেনা নেই। তা ছাড়া, সে তখন একজনের সঙ্গে ব'সে ব'সে তাস খেলায় মত্ত

ছিল, লোকটাকে জাহাজঘাটে আমি দেখেছি, ও কুলি; সে অঞ্চলে ওর ডাক-নাম 'কাচের টুকরো'। বিছানায় একটি শিশু আবোল-তাবোল বকছিল, এক পাশে এক বৃদ্ধ, বাড়ীওয়ালির বাপই হয় ত, বুকে হাত চেপে ঝুঁকে পড়ে ছিল, দেখেই মনে হয় যে, তার বুকে যেন একটা ভয়ানক ব্যথা। মাথার চুল তার প্রায় সবই পেকে গেছে এবং এমনই ভাবে গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিল যে, দেখলেই মনে হয় যেন একটা সাপ তার লিক্‌লিকে ফণা বাড়িয়ে শিকারের অপেক্ষা করছে।

লোকটাকে বললাম, 'রাত্তিরটার মত এখানেই আজ থাকতে হবে, উপর থেকে নেমে আসতে হ'ল।'

'উনি কি তাই নির্দেশ দিয়েছেন?' সে জানতে চইল।

'হাঁ। আমি যে ঘরে থাকতাম সে ঘরে একজন নতুন লোক এসেছে।'

জবাবে লোকটা আর কিছুই বললে না এবং হাতের তাস ভাঁজাতে শুরু ক'রে দিল। লোকটা দিনের পর দিন ওই একই জায়গায় বসে তাস খেলে। বাড়ীতে যখন যে উপস্থিত থাকে সে-ই তখনকার মত তার খেলার সাথী হয়। ওর এ খেলার আর কোন সার্থকতাই ছিল না—নিছক সময় নষ্ট করা মাত্র। ও নিজে সারা দিনরাত কোন কাজই করে না, কেবল তাস খেলে। স্ত্রী কিন্তু সারাদিন উপর-নীচ ক'রে সর্বক্ষণই দারুণ ব্যস্ত থাকে। সব ব্যাপারের শৃঙ্খলা করা ও খদ্দের ডাকা ইত্যাদি কাজে সমস্ত ক্ষণই সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। রেল-স্টেশনে ও জাহাজঘাটার কুলিদের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে! প্রত্যেকটি নতুন লোক আনার জন্যে কুলি কেবল রাত্রি-বাসের স্থানই যে পায়, তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু দস্তুরিও পেয়ে থাকে। এবার নতুন আগন্তুক নিয়ে 'কাচের টুকরো' এসে উপস্থিত হয়েছে।

দুটি ছোট মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল, এদের উভয়ের মুখই ইতর

লোকের ছেলেপিলেদের মত বিশীর্ণ, মেচেতা-পড়া; জামা-কাপড় ভারী নোংরা ও ছেঁড়া। খানিক বাদে বাড়ীওয়ালি স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকল। রাত্রিটার মত কোথায় শুব জানতে চাইলাম। ও বললে যে, এখানেই আর সকলকার সঙ্গে শুতে পারি, নয় ত পাশের ঘরে সোফার উপরও শুতে পারি—দু-জায়গার যেখানে আমার খুশি। ঘরের জিনিস-পত্র গুছোতে গুছোতে আমার দিকে না তাকিয়েই ও জবাব দিল।

ওর জবাবে আমার উৎসাহ একেবারে দমে গেল। এক রাত্তিরের জন্যে নিজের ঘর আর একজনকে দিয়ে আমি যে অখুশি নই এ ভাবটা দেখানর জন্যে দরজার এক পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালাম, যেন অনেকখানি জায়গায় আমার দরকার নেই। না চটে এই উদ্দেশ্যে প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম, কেন না, একেই ত ও আমার উপর সন্তুষ্ট ছিল না, তার উপর সাংসারিক কাজে ভারী ব্যস্ত হয়েই থাকে দেখেছি।

বললাম, 'বেশ, তাই হবে। আর—একটা রাত্তির ত, এক রকমে কাটিয়ে দিলেই চলবে'খন!'—বলেই রসনা সংযত করলাম।

ও তখনও ঘরময় তাড়াহুড়ো ক'রে বেড়াচ্ছিল। বলল, 'তা ব'লে বিনি পয়সায় দুনিয়াশুদ্ধ লোককে খাওয়া থাকা যোগাতে আমি পারব না, আগেও বলেছি, এখনও সোজা ব'লে দিচ্ছি। বুঝলে বাপু?'

জবাবে বললাম, 'তা ত নিশ্চয়ই। তবে এই কয়টা দিন সবুর কর, লেখাটা শেষ হ'লেই তোমার পাওনা পাই-পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দেবো। এমন কি, খুশি হয়েই তোমায় দুটো টাকা বেশি ধ'রে দেব। বুঝলে?

যতদূর বোঝা গেল, তাতে মনে হ'ল যে, আমার লেখাটা সম্বন্ধে ওর কিছুমাত্র আস্থা নেই। তা হোক, তাই ব'লে এ সময় অত মান-অহঙ্কার দেখালে চলবে না, তুচ্ছ এই কারণেই ত আর এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারি নে। চলে গেলে আমার যে কি হবে তা বেশ ভাল ক'রেই জানতাম।

*　　*　　*

দিন কয়েক কেটে গেছে। এখনও আমি বাড়ীওয়ালির ঘরেই থাকি, কেন না, পাশের ঘরে ভারী ঠাণ্ডা এবং আগুন রাখার মত কোন ব্যবস্থাই নেই। রাত্তিরে ঘরের মেঝেতেই ঘুমাই।

সেই আগন্তুক খালাসী তখনও আমার ঘরেই বাস করছিল, এবং শীঘ্র তার যাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। দুপুরে বাড়ীওয়ালি এসে জানাল, আগন্তুক তাকে ইতিমধ্যেই একমাসের ভাড়ার টাকা আগাম দিয়েছে। ও নাকি খালাসীর কাজের পরীক্ষা দেবার জন্যে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। বুঝতে পারলাম, ও-ঘরে থাকা আর আমার অদৃষ্টে নেই।

পাশের ঘরখানায় গিয়ে বসে পড়লাম। লেখবার মত যোগ্যতা ও মানসিক আবস্থা যদি থাকতই ত এখানে বসেই লেখাটা শেষ করতে পারতাম, কেন না, এখানে ত কোন রকম গোলমালই নেই। সেই রূপকটা শেষ করবার মত তাগিদ আর আমার নেই। কেন না, তখন আর একটা ভারী চমৎকার নতুন ভাব আমার মাথায় এসেছে। একটি একাঙ্ক নাটিকা—"ক্রুশের প্রতীক" রচনা করব ঠিক করেছি; মধ্যযুগের কাহিনী থেকে বিষয়-বস্তু নেওয়া হবে। প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধে সব কিছুই ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি। এক প্রচণ্ড স্বর্গবিদ্বেষী বারাঙ্গনা বিদ্বেষবশে মন্দিরের ভিতর পাপানুষ্ঠান করে। বেদীর পাদদেশেই দেবতার সম্মুখে সে দুষ্কার্য করে, তখন বেদীর পবিত্র বস্ত্রখণ্ড তার মাথায় জড়ানো ছিল। এক তীব্র মধুর বিদ্বেষ তাকে এ কার্যে প্ররোচিত করে। এই নতুন ভাবটি সম্বন্ধে যতই চিন্তা করতে লাগলাম ততই এই ভাবটি আমায় একেবারে পেয়ে বসল। অবশেষে সেই বারাঙ্গনা মূর্তি ধ'রে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল, যেমনটি আমি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনটি। তার আকৃতি ভারী কুৎসিত, দেখলেই ঘৃণা জন্মে, দীর্ঘকায়া, কৃশতনু, কৃষ্ণবর্ণা; তার সে দীর্ঘ বাহু দুটি জামা-কাপড়ের মধ্যে দিয়েও প্রতি

পাদক্ষেপে স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক বৃহৎ, কিন্তু তাতে বড় একটা বিশেষত্ব কিছুই নেই, তবে সে দৃষ্টি সহ্য করা কিছু কষ্টকর। তার যে বিশেষত্ব আমায় বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তার অত্যদ্ভুত নির্লজ্জতা এবং তার চোখ মুখের সুবিপুল দুষ্কৃতির লক্ষণ! আমার নাটকে একে চিত্রিত করতে ব্যস্ত ছিলাম—এরূপ অত্যদ্ভুত জীবের চিত্র আঁকতে গিয়ে আমার মস্তিষ্ক একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠল—সুদীর্ঘ দু ঘণ্টা কাল একযোগে কলম চালিয়ে গেলাম। একটুও থামি নি। প্রায় বার-তের পৃষ্ঠা লিখলাম, এক এক সময়ে লিখতে ভারী কষ্ট হয়েছে, একবার একটা গোটা পৃষ্ঠাই ছিঁড়ে ফেলেছি। শীতে ও শ্রান্তিতে অবশ হয়ে গেলাম। তখন নিরুপায় হয়ে লেখা ছেড়ে উঠে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঘরের মধ্যে ছেলেপিলের চীৎকারে কান্নায় শেষের আধঘণ্টা ভারী বিরক্ত হয়ে পড়লাম তখন বাধ্য হয়েই লেখা আর কিছুতেই এগোল না। কাজেই রাস্তায় রাস্তায় পাইচারি করতে করতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাটকের বিষয়ই ভাবতে লাগলাম। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরবার আগে এই ঘটনাটি ঘটে :

কার্ল জোহান স্ট্রীট ছাড়িয়ে রেলওয়ে স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা জুতার কারখানার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এইখানটাতেই কেন দাঁড়িয়ে ছিলাম ভগবান জানেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে ভিতরের দিকে চাইলাম, কিন্তু আমার যতদুর মনে পড়ে, জুতার কথা আমার মনেও ছিল না; আমার মন তখন দুনিয়ার আর এক প্রান্তে বিচরণ করছিল। আমার পিছন দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকজন কথাবার্তা কইতে কইতে যাচ্ছিল কিন্তু তাদের একটি কথাও আমার কানে পৌঁছয় নি, হঠাৎ কে একজন আমায় সম্ভাষণ ক'রে উঠল :

'এই যে, নমস্কার!'

আরে, এ যে 'মিশি'! খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে তবে তাকে চিনতে পারলাম।

'ওহে, কেমন আছ, ভাল ত?' ও জানতে চাইল।

'ভালই ··· আমি ত সব সময়ই ভাল থাকি।'

'ভাল কথা, তুমি এখনও ক্রাইস্টির ওখানেই বেরুচ্ছ ত?' ও শুধাল।

'ক্রাইস্টি? কোন্ ক্রাইস্টি?'

'মনে পড়ে একবার যেন বলেছিলে যে, তুমি ক্রাইস্টির ওখানে হিসাব-মুহুরির কাজ কর। কেমন, নয় কি?'

'হাঁ, বলেছিলাম বটে! তবে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তার ওখানে কারুর টিঁকে থাকা একেবারে অসম্ভব। সে-ই আমায় ছাড়িয়ে দিলে।'

'কেন, কি হয়েছিল?'

'একদিন একটা হিসেব একটু ভুল হয়েছিল এবং তাই—'

'মিথ্যে হিসেব?'

মিথ্যে হিসেব! মিশি আজ আমার মুখের উপর এ কথা বলতে সাহস পেল! তার প্রশ্নে একটা উৎকট কৌতূহলের ভাব প্রকাশ পেল, যেন খবরটা শোনবার জন্যে তার আগ্রহের আর সীমা নেই। তার পানে তাকালাম, ভারী অপমান বোধ হ'ল! তার প্রশ্নের কোন জবাব দিলাম না।

'তার জন্যে দুঃখ কি, ভুল কার না হয়!' আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলেই ও যেন ও-কথা বললে। ওর বিশ্বাস, ইচ্ছে ক'রেই আমি হিসেবে ভুল করেছি।

বললাম, 'তাই ত, ভুল হয় মানুষেরই, আর—আর আমি যখন মানুষ তখন আমার ভুল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! তুমি কি সত্যিই

মনে কর যে, আমি ইচ্ছে ক'রেই ও রকম একটা হীন কাজের প্রশ্রয় দিয়েছি ? য়্যাঃ !'

'তা হবে কিন্তু তোমায় যে ও-কথা বলতে আমি স্পষ্ট শুনেছি !'

'না, আমি তা কখনও বলি নি। আমি বলেছি যে, হিসাবে একটা অতি তুচ্ছ ভুল রয়ে গেছল। অপরাধের মধ্যে হয়েছিল এই যে, একদিন হিসেবে একটা ভুল তারিখ বসিয়ে ছিলাম। না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখনও ভাল-মন্দ বিবেচনাশক্তি হারাই নি। এখনও সম্মান বজায় রেখেই চলেছি, নইলে আজ আমার কি দশাই না হ'ত। একমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞানই আমায় এখনও রক্ষা ক'রে আসছে আর সেই আত্মসম্মানজ্ঞানও বেশ শক্তিমান, তার জোরেই এখনও টিঁকে আছি।'

সহসা পিছন ফিরে আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। একটা লোকের সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক লাল পোশাক প'রে আমাদের দিকেই আসছিল, আমার দৃষ্টি সেই লাল পোশাকের উপরই নিবদ্ধ হ'ল। মিশির সঙ্গে আমার আলাপ না হ'লে, তার এ হীন সন্দেহ আমায় এতটা আঘাত দিতে পারত না এবং আমিও এতটা উত্যক্ত হতাম না। আর তা হ'লে এই লাল পোশাক-পরা স্ত্রীলোকটি আমার নজর এড়িয়েই চ'লে যেত। কিন্তু, আসলে ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? এ পোশাক-পরা স্ত্রীলোকটি যদি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েই হয় তাতেই বা আমার কি এসে যায় ? মিশি তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা ব'লে তার ভুল শোধরাতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তার কোন কথাই আমার কানে আসছিল না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিক-পানে-আসা লাল পোশাকটির দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে ছিলাম। প্রাণে একটা বিপুল পুলকের শিহরণ ব'য়ে গেল। ঠোঁট না নেড়ে আপনার মনে ব'লে উঠলাম :

'ল্যাঞ্জালি!'

ইতিমধ্যে মিশিও পিছন ফিরে সেই লাল পোশাক-পরা মহিলা ও তার সঙ্গের পুরুষটিকে দেখতে পেল এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে টুপি উচিয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল। আমি কিন্তু টুপি ওঠালাম না। হয় ত এ আমার খেয়াল। লাল পোশাকের দল কার্ল জোহান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিশি শুধাল, 'লোকটিকে চেন?'

'কেন, উনি ডিউক, ওঁকে কি তুমি দেখনি কখনও? সেই নামকা-ওয়াস্তে ডিউক। মহিলাটিকে তুমি চেন?'

'হাঁ একরম চিনি বই-কি। তুমি কি ওকে চিনতে না?'

'না।'

'আমার যেন মনে হ'ল, গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে ওকে তুমি নমস্কার করলে।'

'তাই নাকি?'

'হয় ত তুমি নমস্কার করো নি!' মিশি বললে। অথচ স্ত্রীলোকটি কিন্তু সারাক্ষণ কেবল তোমার দিকেই চেয়েছিল। ভারী আশ্চর্য ত!'

বললাম, 'কত দিন থেকে ওকে চেন তুমি?'

মিশি ওকে আগে চিনত না। বেশি দিন হয় নি, শরৎকালের এক সন্ধ্যা বেলা ওদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; তারা তিনটি আমুদে প্রাণী গ্র্যাণ্ড থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসছিল। এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ওদের তখন দেখা হয় এবং তারা ওর সঙ্গে আলাপ করে। প্রথমটা ও ভারী বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন ওদের দলের একজন ওকে বাড়ী পৌঁছে দিতে চায়, কেন না, সেটাই নাকি সভ্যতার লক্ষণ। মিশির সেই বন্ধু দুনিয়ায় কাউকে ভয় করে না, আগুনকেও না, জলকেও না। সে বললে, কেবল ওর সঙ্গে সঙ্গে

দোর পর্যন্ত গিয়ে ওকে বাড়ী পৌছে দেবে, ওর কোন অনিষ্টই করবে না, ওকে পৌছে না দিলে রাত্তিরে তার ঘুম হবে না। হেঁটে যেতে যেতে সে ক্রমাগত বকে যেতে লাগল এবং একজন সম্রান্ত ফটোগ্রাফার ব'লে নিজের পরিচয় দিল। মেয়েটির বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও লোকটির মন কিছুতেই দমল না, তখন অগত্যা বাধ্য হয়েই মেয়েটি হেসে উঠল। শেষ পর্যন্ত তাকে ও যেতে সম্মতি দিল।

আমি মিশিকে শুধালাম, 'সত্যি, ও সঙ্গে গেল? তারপর কি হ'ল?'

ও কি জবাব দেয় শুনবার জন্যে দম বন্ধ ক'রে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

'তারপর কি হ'ল?—থাক্, সে কথা শুনে আর কাজ নেই। ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে অতটা কৌতূহল সঙ্গত নয়।'

মিশি আর আমি উভয়েই নীরব হলাম।

খানিক পরে মিশি গম্ভীরভাবে ব'লে উঠল, 'দূর হোক ছাই! ওই কি সেই ডিউক?—তা হবে। আচ্ছা, ও যদি এই ব্যক্তির সংস্পর্শেই এসে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ওর হয়ে কোন কথাই আর বলতে চাই নে।'

আমি তবু চুপ ক'রে রইলাম, হাঁ, ডিউক ওর সাথে যাবে বই-কি, তাতে আর অশ্চর্য হবার কি আছে? ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? ওর কাছে থেকে ত আমি চিরবিদায়ই নিয়েছি। এখন আর ওর ভাল-মন্দ, ছল-চাতুরী কিছুতেই আমায় পাবে না। ওকে জঘন্য রঙে চিত্রিত ক'রে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, ওর সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করতে যেন একটা পরম তৃপ্তি বোধ করছিলাম। এ কথা মনে হ'তেই মনটা বিষিয়ে উঠল যে, সত্যিই কি টুপি তুলেছিলাম? এ রকম লোককে দেখে কেন টুপি তুলতে গেলাম! ওর সম্বন্ধে ত আর আমার এতটুকু মোহও নেই, আমার চোখে ও এখন পতিতা। কি মলিনই

না আমি ওকে দেখেছিলাম! ও যে আমার দিকে তাকিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি কিন্তু এতে কিছুমাত্র আশ্চর্য হই নি; ওর মনে একটা অনুশোচনা এসেছিল হয় ত। তাই ব'লে নির্বোধের মত ওকে সেলাম ক'রে নিজেকে খাটো করবারও কোন সুসঙ্গত হেতু ছিল না, বিশেষত, বর্তমানে যখন ওর এতদূর জঘন্য অধঃপতন হয়েছে! ওর কাছে ডিউকের আজ খাতিরের সীমা নেই; ডিউক সুখী হোক! এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারব। ঈশ্বর করুন, ও সোজা আমার দিকে সাগ্রহে তাকালেও যেন সে দিন আমি মুখ ফেরাতে পারি। ওর যেন এমনি আরও সুন্দর সুন্দর দামি পোশাক পরবার সুযোগ হয়। এটা সহজেই হতে পারবে। হাঃ, হাঃ! সে কি বিজয়-উল্লাস! ··· নিজের শক্তির যদি ঠিক খবর জেনে থাকি, তা হ'লে আজ রাত্তিরের মধ্যেই নাটিকাটি শেষ করতে পারব এবং সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই এই নারীকে পায়ের তলায় এনে ফেলতে পারব! রূপসী! হাঃ, হাঃ, সে দিন ওর রূপের গুমর কোথায় থাকবে দেখব। ···

সংক্ষেপে আওড়ালাম, 'তা হ'লে এখন আসি।'

মিশি কিন্তু আমার পথরোধ ক'রে শুধালে, 'আচ্ছা, এখন তুমি সারাদিন কি কর?'

'কি করি? কেন—লিখি,—প্রায়ই। তা ছাড়া আর কি করব? আর লেখা থেকেই ত এখন পেট চলে। একটা বড়দরের নাটিকা লিখতে ব্যস্ত আছি—'ক্রুশের প্রতীক'। মধ্যযুগের কাহিনী থেকে বিষয়-নির্বাচন করেছি।'

মিশি গম্ভীর হয়ে ব'লে উঠল, 'তাই নাকি! বেশ বেশ, যদি লেখাটা শেষ করতে পার, তা হ'লে যেন ···'

'তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই,' জবাবে বললাম। 'এক

সপ্তাহের মধ্যেই তোমরা আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু শুনতে পাবে।'

এই বলে চ'লে এলাম।

বাড়ী পৌছে বাড়ীওয়ালির কাছে একটা আলো চাইলাম। আলোটা তখন আমার সব চাইতে বেশি দরকার। আজ আর ঘুমোব না, মাথার মধ্যে ভাব টগবগ ক'রে ফুটছে, সুতরাং বিশ্বাস ছিল, ভোর হওয়ার আগেই নাটিকার সব চাইতে ভাল অংশটা শেষ করতে পারব। বিনীত-ভাবেই বাড়ীওয়ালিকে আমার প্রার্থনা জানালাম। কেন না, বসবার ঘরে পুনরায় প্রবেশের দরুন আমার দিকে ওর বাঁকা চাউনি লক্ষ্য করেছিলাম! জানালাম, গোটাকয়েক দৃশ্য লিখতে পারলেই লেখাটা শেষ করতে পারি এবং তা হ'লেই কোন নাট্য-মন্দিরে তার অভিনয়ের ব্যবস্থা করা অগৌণেই চলতে পারে, এখন যদি ও আমার এই মহা-উপকারটি করে ...

কিন্তু বাড়ীওয়ালির অতিরিক্ত আলো ছিল না। খানিকক্ষণ কি ভাবলে কিন্তু কোথাও যে তার একটা আলো আছে তা মনে করতে পারল না। বললে, বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে রান্নাঘরের আলোটা পাওয়া যেতে পারে। তার চেয়ে আমি কেন নিজে একটা ক্যাণ্ডল কিনে আনি না?

রসনা সংযত করলাম। ট্যাকে একটা আধলাও নেই, ক্যাণ্ডল কিনব কি দিয়ে! অথচ, আমার বিশ্বাস, এ খবর ওর বেশ জানা ছিল। শেষ পর্যন্ত আমায় নিরাশই হ'তে হ'ল! চাকরানীটা ঘরের ভিতর আমাদের সঙ্গেই ব'সে ছিল—শুধু ব'সেই ছিল এবং রান্নাঘরে তখন তার কোনই কাজই ছিল না, কাজেই আলোটাও তখন নেবানোই ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথাটাই ভাবলাম, কিন্তু কিছু বললাম না। সহসা চাকরানীটা আমায় বললে, 'আমি যেন তোমায় হোটেল থেকে বেরুতে দেখলাম,

নেমন্তন্ন ছিল বুঝি?' ব'লেই ও নিজের রসিকতায় নিজেই চেঁচিয়ে হেসে উঠল।

ইতিমধ্যে কিছু লিখবার জন্যে কাগজপত্র নিয়ে সেখানেই বসে গেলাম। হাঁটুর উপর কাগজগুলি নিয়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে অবিচলিত ভাবে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চেয়ে রইলাম। সে অখণ্ড মনোযোগ কিন্তু এতটুকুও কাজে এল না, লেখা কিছুতেই এগোলো না। বাড়ীওয়ালির ছোট্ট মেয়ে ছুটো ঘরে ঢুকেই লোমহীন রোগাটে কিম্ভূত একটা বিড়াল নিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বেচারা অবোলা জীব পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। বাড়ীওয়ালা দু-তিন জনকে নিয়ে তাস খেলছে। গৃহিনী কার্যান্তরে অতিব্যস্ত হয়ে এ-ঘর সে-ঘর করছে। খানিক বাদে ঘরে এসে ছেঁড়া জামা সেলাই করতে আরম্ভ ক'রে দিল। ছেলেদের হৈচৈ-এ আমার লেখা যে এতটুকু এগোচ্ছে না ও তা বেশ বুঝতে পারছিল, কিন্তু তাই ব'লে সে সম্বন্ধে এতটুকু বিবেচনা আরও কর্তব্য মনে করল না। বরং আমি হোটেল থেকে খেয়ে এলাম কি-না চাকরানীটা যখন ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, ও তখন একটু হাসল মাত্র। গোটা পরিবারটাই যেন আমার উপর বিরূপ হয়ে রয়েছে। যেন একটা নেহাৎ নগণ্য লোক, নিজের ঘর আর একজনকে ছেড়ে দেয়ার অসম্মানটুকুই যেন আমার প্রাপ্য,—এমন কি, বিড়ালাক্ষি চাকরানী ছুঁড়ীটাও আমায় ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না। চাকরানীটা বললে হোটেলেই যদি না খাই ত খাই কোথায়! কেন না, ও কখনও আমায় গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বেরুতে দেখে নি। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, ও আমার দুর্ভাগ্যের কথা সবই জানে এবং ও যে তা জানে এটা বুঝতে গিয়ে ও বেশ আমোদই বোধ করছিল।

অজ্ঞাতসারে কখন নাটকের বিষয় থেকে ওই সব ব্যাপারেই মনটা চাড়িয়ে গেল। মাথার মধ্যে একরকম অদ্ভুত শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। তখন বাধ্য হয়েই লেখা ছেড়ে দিলাম। কাগজপত্র পকেটে

রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম! চাকরানীটা ঠিক আমার সুমুখেই বসেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—ওর পিঠটা নেহাৎ সরু, কাঁধ দুটো বাঁকা, যেন এখনও পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পায়নি। আমার পিছু লাগার কি কারণ থাকতে পারে, ভেবে পেলাম না। যদি গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকেই খেয়ে এসে থাকি ত তাতেই বা ওর কি? তাতে কি ওর কিছুমাত্র ক্ষতি হয়েছে? চেহারাটা একটু খারাপ দেখলে বা সিঁড়িতে হোচট্ খেতে দেখলেই ধৃষ্টতার হাসি হেসে ওঠে, হয় ত আমায় চলতে দেখে পিছন থেকে জামাটা ধ'রেই টানে। একদিন টানের চোটে জামাটার খানিকটা ছিঁড়ে গেল। এই কালও ও আমার নাটকের গোটাকয়েক পরিত্যক্ত পৃষ্ঠা পাশের ঘর থেকে চুরি ক'রে এনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়েছে এবং এমন বিশ্রী ক'রে পড়েছে যে, ঘরের সকলেই তাতে হেসেছে। কোন দিনই ত ওর অসম্মান করি নি! এমন কি, ওকে কোন কাজ করতে কখনও বলি নি। রোজই নিজের বিছানা নিজেই ঘরের মেঝেয় বিছিয়ে নিই, পাছে ও রাগ করে এই ভয়ে কখনও ওকে কোন অনুরোধই করি নি। আমার মাথার চুলগুলো নিয়েও ব্যঙ্গ করতে ত ও কসুর করে না। পূর্বেই বলেছি, ইদানীং আমার মাথার চুল উঠে যাচ্ছিল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যে পাত্রটায় মাথা ধুই তাতে মাথার চুল ভাসে, চাকরানীটার তা নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিরাম ছিল না। জুতা জোড়াটা ভারী পুরানো হয়েছে, তার উপর সেদিন রুটিওয়ালার গাড়ীখানা পায়ের উপর দিয়ে অবাধে চ'লে গেছল, তার ফলে একপাটি ছিঁড়েখুড়ে গেল। সেই ছেঁড়া জুতা সম্পর্কেও ওর ব্যঙ্গ অব্যাহত চলে। ও হয় ত ছেঁড়া জুতা জোড়াটার দিকে তাকিয়ে হেসে ব'লে ওঠে, 'ভগবান, তোমায় ও তোমার এ জুতা জোড়াকে আশীর্বাদ করুন! দিন দিনই তোমার এ জুতা জোড়া যেমন প্রশস্ত হয়ে শ্রীযুক্ত হচ্ছে, তাতে আস্ত একটা কুকুরও অনায়াসেই ওতে ঘুমুতে পারবে!'

ও হয় ত ঠিকই বলছে, কিন্তু বর্তমানে আমার যে অবস্থা তাতে এক জোড়া নতুন জুতা কেনা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ব'সে ব'সে যখন এ সব ভাবছিলাম আর দাসীটার ধৃষ্টতায় আশ্চর্য হয়ে পড়ছিলাম, তখন বাচ্চা মেয়ে দুটো বাড়ীওয়ালির বুড়ো বাপকে ভারী উত্যক্ত ক'রে তুলেছিল। তার চার পাশে লাফঝাঁপ ক'রে তারা বেশ আমোদ পাচ্ছিল। একটুক্‌রো খড় এনে বুড়ার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ মেয়ে দুটোর এই অসঙ্গত উৎপীড়ন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু তাদের বাধা দিলাম না। বেচারী পঙ্গু বৃদ্ধ আত্মরক্ষার জন্যে একটা আঙুলও নাড়তে পারছিল না। কেবল উগ্রদৃষ্টিতে উৎপীড়কযুগলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার নাকে খড়ের টুকরো গুঁজে দিতেই বেচারী অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। এ দৃশ্যে আমার মেজাজ চ'ড়ে গেল, তাই সেদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। খেলায় মত্ত মেয়ে দুটোর বাপ একবার মাথা তুলে মেয়েদের এই দুর্ব্যবহার বেশ উপভোগ করল। শুধু তাই নয়, সঙ্গীদের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট করল। বুড়ো বেচারী কেন নড়তে চড়তে পারছে না! বুড়োটা কেন মেয়ে দুটাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিচ্ছে না? আমার যেন অসহ্য বোধ হ'ল, উঠে বিছানার সামনে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ীওয়ালা ব'লে উঠল, 'থাক্, থাক, ওদের খেলতে দাও! উনি পঙ্গু।'

পাছে লোকটার বিরাগভাজন হ'লে রাত্তিরে আশ্রয়টুকু না দেয় তা হ'লে ত রাস্তায়ই থাকতে হবে, এই ভয়ে নীরবে পিছু হটে এসে নিজের জায়গায় ব'সে পড়লাম। ওদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা কইতে গিয়ে আমার এ আশ্রয়টুকু ও রুটি-মাখনটুকু খোয়াই কেন? বুড়োটা ত আধ-মরা, আজ আছে ত কাল নেই, ওর জন্যে নির্বোধের মত কাজ করা

উচিত নয়! এই ভেবেই মনকে প্রবোদ দিয়ে চুপ ক'রে থেকে আত্ম-প্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা পেলাম।

মেয়ে দুটো কিন্তু তবু বুড়াকে উৎপীড়ন করছিল; বুড়োটা কোন রকম বাধা দিতে পারছে না দেখে ওদের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, ওরা বুড়োর নাক কান ও চোখ তিনটে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল; বুড়ো কটমট ক'রে ওদের দিকে তাকাল কিন্তু তা অসহায়ের নিস্ফল ক্রোধ ছাড়া ত আর কিছুই নয়। তার সে অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসি থামানো দায়। একটা কথা বলতে বা হাত পর্যন্ত নাড়তে পারছিল না। হঠাৎ সে দেহের উর্ধ্বাংশ একটুখানি তুলে মেয়ে দুটোর মুখে গায়ে থুথু নিক্ষেপ করল, কিন্তু তাদের একজনের গায়েও তা লাগে নি; সে একটু দূরে ছিল। এ দেখে বাড়ীওয়ালা হাতের তাস টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে লাফ দিয়ে গিয়ে বিছানার সম্মুখে দাঁড়াল। রাগে তার চোখ মুখ লাল। সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, 'বুড়ো শূয়ার কোথাকার, ওদের গায়ে থুথু দিলি যে? চুপ ক'রে শুয়ে থাক্।'

আমি সেখানে ব'সেই ব'লে উঠলাম, 'বেচারীকে ওরা কি বিরক্তই না করছে, ওকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।'

ভয় হচ্ছিল, সোজাসুজি প্রতিবাদ করলে এখুনি নিশ্চয় ও আমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিবে, তাই কথাটায় তেমন জোর দিলাম না, কেবল সাধারণভাবে বললাম মাত্র। রাগে দুঃখে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি ক'রে কাঁপছিল। বাড়ীওয়ালা আমার দিকে ফিরে বলেল, 'তোমার সাক্ষ্য কে চেয়েছে? চুপ ক'রে থাক, আর কখনও এ রকম মোড়লি করতে এসো না।'

ততক্ষণে বাড়ীওয়ালির আওয়াজ কানে এল, চেঁচিয়ে গালাগালি দিয়ে সারা বাড়ীটা মাথায় তুলেছে। ও বলেছিল, 'মরুক গে, তোমরা সকলেই কি পাগল হ'লে নাকি!' তার পর আমায় আর সেই হতভাগ্য

বুড়োকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'এখানে যদি থাকতে চাও ত চুপ ক'রেই থাকতে হবে। দুধকলা দিয়ে সাপ পুষতে পারব না আমি। চুপচাপ ব'সে থাক। এত নবাবী কেন? ট্যাঁকে যাদের একটা কাণাকড়ি নেই তাদের জুলুম সইব কেন? রাত দুপুরে এসে বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা! গোলমাল করতে চাও ত যাতে মুখ বন্ধ হয় তারই চেষ্টা আমায় করতে হবে। ভবিষ্যতে এ রকম অনধিকারচর্চা আর কখনও সইব না, ব'লে রাখছি, বুঝলে? পছন্দ না হয় এখুনি তোমরা বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে পার। সুখের চাইতে সোয়াস্তি আমার ঢের ভাল।'

আমি টু শব্দটি করলাম না। দরজার পাশেই ব'সে পড়লাম এবং ওদের হল্লা শুনতে লাগলাম। সকলে মিলে একসঙ্গে চেঁচাতে শুরু ক'রে দিল—মেয়ে দুটো ও চাকরানীটা গোলমালের মূল কারণ বর্ণনা করতে চেষ্টা করছিল। কেবল আমিই চুপ ক'রে ছিলাম। বেশ জানতাম যে, চুপ ক'রে থাকলে গোলমালটা আর বেশি দূর গাড়াতে পারবে না, তা ছাড়া, আমারই বা বলবার কি ছিল? বিশেষত, তখন শীতকাল, রাত্তির অনেক, এ অবস্থায় ওদের চটিয়ে রাস্তা দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। কাজেই চুপ ক'রে থাকাই সঙ্গত মনে করলাম, মেজাজ দেখাবার সময় ত এটা নয়। বোকামি করলে চলবে না ··· কাজেই চুপ ক'রে বসেই রইলাম, বাইরে এক পাও নড়লাম না। ওরা বলতে গেলে আমায় একরকম ঘরের বার ক'রেই দিয়েছিল, তবু তাতে লজ্জিত বা ক্ষুণ্ণ হলাম না। হাঁ ক'রে দেয়ালে টাঙানো যীশুর প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাড়ীওয়ালির কণ্ঠ ক্রমেই সপ্তমে চড়ছিল—কত গালাগালিই না দিল, কিছুতেই আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে পারল না।

বাড়ীওয়ালার সঙ্গে যারা এতক্ষণ তাস খেলছিল তাদের একজন

ব'লে উঠল, 'আমায় যদি চুপ করতে বলত বলতে পারি 'আমার দ্বারা আর কখনও গোলমাল হবে না।' এই ব'লেই সে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আর আর সঙ্গীরাও উঠে পড়ল।

বাড়ীওয়ালি তাদের লক্ষ্য ক'রে বললে, 'না, না, তোমাদের কিছু বলছি নে, তোমরা বস। আমি যাকে লক্ষ্য ক'রে বলছি, প্রয়োজন হ'লে এক্ষুনি তাকে রাস্তা দেখাতে জানি, এবং পারিও। কাকে লক্ষ্য করেছি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। ...'

বলতে বলতে এক-একবার থামছিল এবং কাকে বলছে তা স্পষ্ট ক'রেই আমায় বুঝিয়ে দিল। নিজের মনেই ব'লে উঠলাম, 'চুপ, একটি কথাও নয়!' ও আমায় সোজা স্পষ্ট ভাষায় চলে যেতে বললে না। গালাগালের সঙ্গে যেন আমার কোন সম্পর্ক নেই, এমনি নির্বিকারভাবে সেগুলি হজম করলাম। এ অসময়ে মান-অহঙ্কার দেখান সঙ্গত নয়। পরম ধৈর্যের সঙ্গে নীরবে সব লাঞ্চনাই সহ্য করলাম। ... দেয়ালে টাঙানো তৈলচিত্রে যীশুর মূর্তির চুলগুলি অপূর্ব সবুজ। ... কতরকম উড়ো ভাবই না ছায়াচিত্রের মত একে একে আমার মনে দেখা দিল। সবুজ ঘাস থেকে চিন্তার সূত্র বাইবেলের একটা কথায় গিয়ে ঠেকল: তার পর এল মহা-বিচারের দিনের কথা, যে দিন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর একে একে লিসবন-এ ভূমিকম্প, ল্যাজালির ঘরের সেই সুন্দর কলমটি, সম্পাদকের মহানুভবতা ... সব কিছুই একে একে মনে হল, আর ঠিক সেই সময়ই বাড়ীওয়ালি আমাকে ঘরের বার ক'রে দিচ্ছিল।

বাড়ীওয়ালি চেঁচিয়ে বলছিল, 'ইনি শুনতে পাচ্ছেন না যেন! ন্যাকামি দেখে গা জ্বালা করে। ওহে শুনছ, তোমায়ই বলছি মশায়, এ বাড়ী তোমায় ছাড়তে হবে—এখনই। বুঝলে? যেখানে খুশি এখনই চলে যাও—এখানে আর তোমার থাকা চলবে না।'

দরজার দিকে তাকালাম, চলে যাওয়ার মতলব অবশ্য নয়—না, মোটেই সে মতলব আমার ছিল না। একটা দারুণ দুঃসাহসিক মতলব আমায় পেয়ে বসল,—দরজায় যদি চাবি থাকত ত তখনই তা চাবিবন্ধ ক'রে দিতাম,—ভিতর থেকে কেউ যেন না ঘর থেকে বাইরে বেরুতে পারে। সত্যি বলতে কি এই রাত্তিরে রাস্তায় বেরুতে আমার ভারী ভয় পাচ্ছিল।

কিন্তু দরজায় চাবি ছিল না।

সহসা গিন্নির কণ্ঠের সঙ্গে বাড়ীওয়ালার আওয়াজ পেলাম। যে লোক এই কিছুক্ষণ আগে ভয় দেখাচ্ছিল, এখন সহসা তাকে আমার পক্ষ সমর্থন করতে দেখে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলছিল, 'না, এই রাত্তির বেলা কাউকে বাইরে যেতে হবে না। জান, ওকে এখন তাড়িয়ে দিলে আমাদের বে-আইনী কাজ করা হবে, তার জন্তে শাস্তি পর্যন্ত হতে পারে।'

এরূপ কোন আইন ছিল কি-না আমার জানা নেই। থাকতে পারে —আমার জানা ছিল না। সে যাই হোক, বাড়ীওয়ালি অবস্থাটা ভেবে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গেই শান্তভাব ধারণ করল, একটি কথাও আর বলল না।

রাত্তিরে খাবারের জন্ত বাড়ীওয়ালি দু-টুকরো রুটি, একটু মাখন এনে আমার সামনে ধ'রে দিল কিন্তু আমি তা স্পর্শ করলাম না। বাড়ীওয়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভ'রে উঠল। এমন ভাবটা দেখালাম যেন শহর থেকে যৎসামান্ত কিছু খেয়ে এসেছি, না খেলেও চলবে।

খানিকক্ষণ বাদে পাশের ঘরে শুতে গেলাম, বাড়ীওয়ালিও পিছন পিছন এসে দোরে থামল, তার চেহারা অন্ধকারে স্পষ্ট নজরে এল না। চেঁচিয়ে দম্ভভরে বলে উঠল, 'শুনে রাখ, আজই তোমার শেষরাত্রি, কাল থেকে আর এখানে থাকবার সুবিধা হবে না।'

জবাবে বললাম, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

কাল কোথাও না কোথাও একটু আশ্রয় জুটবেই, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। জায়গা একটু নিশ্চয়ই পাব। আজ রাত্তিরেই যে যেতে হ'ল না সেটা ঈশ্বরের পরম করুণা।

ভোর পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত ঘুমালাম—ঘুম যখন ভাঙল তখনও চারিদিক ফরসা হয় নি—তা না হোক, উঠে পড়লাম। রাত্তিরে বেশ শীত ছিল, জামা-কাপড় পরেই শুয়েছিলাম; সুতরাং পোশাক পরবার আর দরকার ছিল না। খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়েই নিঃশব্দে দরজা খুলে সটান বাইরে বেরিয়ে পড়লাম, ভয় ছিল—বাড়ীওয়ালি পাছে দেখতে পায়।

রাস্তায় কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, কেবল দুটা পাহারা-ওয়ালা সারারাত জেগে তখনও পাহারা দিচ্ছে। খানিক বাদেই রাস্তার আলোগুলি নেবানো শুরু হ'ল। উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম—পথের যেন শেষও নেই, আমারও যেন কোন গন্তব্য স্থান নেই। এমনি ক'রে কিয়ুকেগ্যাদেন পৌছলাম। এইখান থেকেই রাস্তাটা কেল্লার দিকে নেমে গেছে। তখনও আমার ঘুমের রেশ যায় নি, শীতও বেশ লাগছিল, হাঁটাহাঁটিতে পা দুটা শ্রান্তিতে অবশ, ক্ষুধায়ও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। রাস্তার পাশের একখানা বেঞ্চিতে ব'সে ব'সে ঝিমোতে শুরু ক'রে দিলাম। কতকক্ষণ যে ঝিমোলাম, বলতেও পারি নে। গেল তিন সপ্তাহ সকালে বিকালে বাড়ীওয়ালির কাছ থেকে পাওয়া সামান্য কয় টুকরা রুটি, একটু একটু মাখন, খেয়েই কাটিয়েছি। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল কিছুই খাই নি, ক্ষুধা বিপুলভাবে আমায় পেয়ে বসেছিল; কাজেই যতশীঘ্র সম্ভব আশ্রয় একটা জুটিয়ে নিতেই হবে। এ সব ভাবতে ভাবতে সেই বেঞ্চিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার সামনেই লোকজন কথাবার্তা কইছে, গোলমালে জেগে

উঠলাম। দেখলাম, সকলেই কাজে কর্মে ব্যস্ত। বেলা অনেক হয়েছে। উঠে হেঁটে চললাম। সূর্য অগ্নিবর্ষণ করছে—আকাশ পাণ্ডুর, ম্রিয়মান। বহু কাল এমন উজ্জ্বল দিন দেখতে পাই নি, কাজেই সকল দুঃখ কষ্টের কথা একদম ভুলে গেলাম। বুক চাপড়ে আপনার মনে একটা গানের দুটা কলি গেয়ে উঠলাম। কণ্ঠস্বরে শ্রান্তি ক্লান্তি মেশানো, ভারী বিশ্রী শোনাল। কাজেই চুপ ক'রে গেলাম, এমন সুন্দর দিনে—ধরিত্রী আলোর ধারায় স্নান ক'রে অপূর্ব সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে দেখে এই ভাবটা আমার খিন্নক্লিষ্ট চিত্তে একটা প্রভাব বিস্তার করল, এবং আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠলাম।

একটা লোক জিজ্ঞেসা করল, 'তোমার কি হয়েছে ?'

জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি স'রে পড়লাম, লোকজনের চোখের আড়ালে নিজের মুখখানি ঢাকবার সে কি বিপুল আগ্রহ! পুলের কাছে গিয়ে পৌছলাম। একখানা কয়লা বোঝাই বৃহৎ রুশীয় জাহাজ নোঙর করা রয়েছে, তার থেকে কয়লা নামান হচ্ছে। জাহাজখানার নাম লেখা রয়েছে—'কোপারগরো'। এই বিদেশী জাহাজে কি হচ্ছিল, জানবার জন্যে একটা সাময়িক কৌতূহল জেগে উঠল। হয় ত জাহাজ-খানা এখন একেবারে খালি। খালাসীরা এখানে সেখানে ঘোরা-ফেরা করছে।

সূর্যালোক, সামুদ্রিক নোনা হওয়া, এই সব কর্মব্যবস্ততা, চারিদিকে হাসিখুশি ভাব—সব মিলে আমার ধমনীতে রক্তস্রোত তীব্র ভাবে বয়ে গেল। অনেকটা চাঙা হয়ে উঠলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, এখানে বসেই ত নাটকটার খানিকটা লিখতে পারি; তখনই পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার ক'রে লিখতে বসে গেলাম।

এক সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে, সেই কথাই ভাবছিলাল—বক্তৃতাটি গর্ব ও অসহিষ্ণুতায় ভরপুর হয় এই ছিল আমার

উদ্দেশ্য, কিন্তু কাজের বেলা তা হ'ল না! কাজেই সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মন্দির অপবিত্রকারীর বক্তৃতা জুড়ে দিতে চাইলাম। আধ-পৃষ্ঠা লেখার পর থামলাম। বর্ণনার উপযোগী আবশ্যক শব্দ জোয়াচ্ছিল না, চারিদিকে হৈ চৈ, মদের দোকানের হল্লা, জাহাজের ওঠা-নামার সিঁড়ির কলরব, শিকলের অবিশ্রান্ত ঝন্‌ঝনানি—এই অবস্থায় বসে মধ্যযুগের সেই অতিপুরাতন আবহাওয়ার সৃষ্টি—একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল।

কাগজ-পত্তর গুছিয়ে উঠে পড়লাম। তা হোক, মেজাজটা তখন আমার ভারী খুশি। আমার বেশ বিশ্বাস হ'ল যে, কোন রকম গোলমাল না হ'লে লেখাটাকে অনেকটা এগিয়ে নিতে পারব।

ব'সে কাজ করা যায় এমন একটা জায়গা যদি পেতাম। বার বার ভাবলাম, চলতে চলতে ডান দিকে একবার তাকালামও; কিন্তু সারা শহরে এমন একটি নিস্তব্ধ স্থানের নাম মনে পড়ল না যেখানে ঘণ্টাখানেক ব'সেও কাজ করতে পারি। ভ্যাটারল্যাণ্ডের সেই যাত্রী-গৃহেই আমায় যেতে হবে! এ কথা ভাবতেই মাথা নীচু হয়ে এল এবং আপনার মনেই ব'লে উঠলাম, না, তা কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই এগিয়ে চললাম এবং ক্রমেই নিষিদ্ধ স্থানের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম। অবশ্যই স্বীকার করতেই হয় যে, এমন ভাবে আবার সেইখানে ফিরে যাওয়া যথেষ্ট হীনতা স্বীকার করতে হয় কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি? এতে অবশ্য গর্ব করবার কিছু নেই, তবে এ কথা বলবার স্পর্ধা আমার আছে যে আজ পর্যন্ত আমি কখনও দম্ভ প্রকাশ করি নি। সামনের দিকে এগিয়ে চললাম।

বাড়ীটার সম্মুখে এসে আর একবার দরজা খুলবার জন্য হাতল ধরে টানলাম। ফল কি হবে জানিনে, তবু আমায় তা করতেই হবে। অবশ্য বেশিক্ষণ থাকব না, ঘণ্টাখানেক থেকে কাজটা সেরেই চলে যাব, এ

রকম জায়গায় যেন থাকতে না হয়। আঙিনায় ঢুকে যখন আবড়ো-খাবড়ো পাথরগুলির উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনও আমার চিত্তের দৃঢ়তা ছিল না এবং দ্বারের দিকে প্রায় ফিরতে যাচ্ছিলাম। দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম। না! মান করলে চলবে না। নেহাৎ যদি তেমন-তেমন বুঝি ত এই ওজুহাত দেখাতে পারব যে, তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি, আর তোমরা আমার কাছে কত পাবে, যাবার আগে জানতে চাই, একদিন ত দিতে হবে।

লম্বা ঘরটার দরজার খুলে ভিতরে ঢুকেই স্থাণুর মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সামনে ডান দিকেই—এই কয়েক পা দূরেই—বাড়ীওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল। তার মাথার টুপি বা গায়ে কোট ছিল না। সে অন্দরের দিকে উঁকি দিয়ে কি দেখছিল। ইঙ্গিতে শব্দ করতে মানা ক'রে আবার উঁকি দিয়ে দেখল।

চুপি চুপি বললে, 'এখানে এস।'

আঙুলে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে তার কাছে গেলাম।

সে নিঃশব্দে উৎসুক হাসি হেসে বলল, 'ওই দেখ, তাকিয়ে দেখ, ওরা ওখানে রয়েছে! ওই দেখ বুড়োটার অবস্থা, দেখতে পাচ্ছ তাকে?'

দেখলাম—সেই দেওয়ালে টাঙানো যীশুর ছবির নীচেই বিছানার উপর দুটি লোক রয়েছে, তার একজন বাড়ীওয়ালি নিজে, আর একজন সেই নবাগত নাবিক অতিথি। তার সাদা ধবধবে পা দুখানা কালো বিছানা-ঢাকার মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে। অদূরে আর একখানা বিছানায় সেই পঙ্গুস্থবির বাড়ীওয়ালির বাপ ঝুঁকে পড়ে ওদের দিকে চেয়ে রয়েছে, নড়বার চড়বার শক্তিটুকুও নেই তার।

পিছন ফিরে বাড়ীওয়ালার দিকে তাকালাম। চেঁচিয়ে হাসি আসছিল, অনেক কষ্টে সে হাসি চেপে রাখলাম।

বাড়ীওয়ালা চুপি চুপি আমায় বললে, 'বুড়োটাকে দেখলে ত?' ব'সে ব'সে দেখছে?' এই বলে আবার নিজে উঁকি দিল।

জানলার দিকে গিয়ে ব'সে পড়লাম। এই দৃশ্য দেখে আমার সকল চিন্তা সকল ভাব নির্দয়ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল—লেখার সেই চমৎকার মতিটুকুও একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, ও দেখে আমার মেজাজ খারাপ হ'ল কেন? আমার কি? যখন স্বামী নিজেই স্বেচ্ছায় সম্মতি দিয়েছে, শুধু তাই নয়, তাতে বেশ আমোদ পাচ্ছে, তখন তাতে আমার মনে কোন রকম দুঃখ হওয়ার ত কোনই হেতু নেই। তারপর বৃদ্ধের কথা, সে বৃদ্ধ, তা ছাড়া আর কিছু নয়। হয় ত বুড়োটা দেখতেও পায় নি। হ'তে পারে সে ব'সে শুধু ঝিমোচ্ছে। হয় ত বা ও মরেই আছে, ও যদি এখন মরেও যায় ত আমি তাতে আশ্চর্য হব না। আমার বিবেক তাতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না।

জোর ক'রে মনের সব অসম্বদ্ধ ধারণাগুলি দূরে সরিয়ে কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসে গেলাম। একটা জায়গায় এসে এই লিখলাম—"ঈশ্বরের এই আদেশ এবং তাই আমার কাছে আইন, জ্ঞানী গুণীরাও এই আদেশই দিয়ে থাকেন এবং আমি ও আমার বিবেকও এই আদেশ দিই ···! জানলার বাইরে তাকিয়ে এই লোকটার বিবেক কি বলে তাই ভাবতে শুরু ক'রে দিলাম। ভিতরের ঘরে কি গোলমাল হচ্ছে কানে এল। যাক, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। হয় ত বুড়োটা মরে গেছে,—মরুক। গোলমাল কিসের, তা নিয়ে আমার ভাববার দরকার নেই। আমি কেন তা ভেবে মরছি? চুপ করে থাক মন! "আমি ও আমার বিবেক এই বলি। ··· কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, সব যেন আমার পিছনে লেগেছে। লোকটা বার বার উঁকি মারছে, স্থির হয়ে একমিনিটও দাঁড়াতে পারছে না। থেকে থেকে তার চাপা হাসি আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করছিল। বাইরে রাস্তায়ও কি যেন

গোলমাল হচ্ছিল, তাতেও আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল। একটা ছেলে রাস্তার ওদিককার ফুটপাথে রোদের মধ্যে ব'সে ছিল। ছেলেটা দেখলাম বেশ হাসিখুশি—যেন কোনই ভয়ডর নেই—ব'সে ব'সে আপনার মনে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ নিয়ে খেলছে—কারুর সঙ্গে লাগেও নি। হঠাৎ ছেলেটা লাফ দিয়ে উঠে গালাগলি শুরু ক'রে দিল এবং পিছন ফিরে রাস্তার মাঝখানে এসে একটা লোককে দেখতে পেল—লোকটা বেশ বয়স্ক, কটা ও লাল্‌চে দাড়ি, সামনের দোতলার জানালায় ঝুঁকে ছেলেটার মাথায় থুথু ফেলেছে। রাগে দুঃখে ছেলেটা গম্‌গম্‌ করতে লাগল এবং ভাষায় যত গালাগালি আছে সব নিঃশেষ করতে লাগল। লোকটা কিন্তু হাসছিল। এইভাবে মিনিট পাঁচেক হয় ত কেটেছে। ছেলেটার কান্না দেখব না ব'লেই সেদিক থেকে নজর ফেরালাম।

'আমি ও আমার বিবেক এই বলি। ··· তারপর কলম আর অগ্রসর হ'ল না। শেষটা সবই কেমন গুলিয়ে গেল; এমন কি, এতক্ষণ যা-কিছু লিখেছি সবই যেন বাজে মনে হ'ল—কোন কাজেই লাগবে না। মধ্যযুগে 'বিবেক' শব্দটা লোকে জানত কি? শব্দটা ত সব প্রথম আবিষ্কার করেন নাট্যকার শেক্সপীয়র। তা হ'লে ত দেখছি এই লেখা কোন কাজেই লাগবে না। একবার সবটা লেখায় চোখ বুলিয়ে গেলাম। এবং সন্দেহের সমাধানও সঙ্গে সঙ্গেই করলাম। হঠাৎ একটা নতুন ভাব মনের মধ্যে হানা দিল এবং নতুন ভাবে নাটকখানা শেষ করবার জন্যে একটা সুবিপুল আকুলতা জন্মাল।

বাড়ীওয়ালা আমায় নিঃশব্দে বার হয়ে যেতে ইঙ্গিত করলে, সেদিকে নজর না দিয়ে উঠে দরজার কাছে গেলাম এবং বেশ গ্রামভারী চালে দৃঢ়তার সঙ্গে হেঁটে চলে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আমার সে পূর্বেকার ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলাম। লোকটা ত সেখানে ছিল না, সুতরাং খানিক্ষণ সেখানে বসতে আর বাধা কি? তার কোন জিনিসই অবশ্য

আমি ছুঁব না, এমন কি, তার টেবিলের সামনে গিয়েও বসব না, কেবল একটিবার দরজার পাশের চেয়ারখানায় বসব মাত্র, তাতেই আমি খুশি হব। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাগজ-পত্র সব বার করলাম। মিনিট কয়েক বেশ চমৎকার কাটল। কোন্ কথার পৃষ্ঠে কোন্ কথা লিখব—সব মাথার মধ্যে গজ্ গজ্ করতে লাগল এবং অবিরাম লিখে চললাম। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খস্‌খস্ ক'রে লিখে যাচ্ছি, মাথাটা বেশ পরিষ্কার, মনটাও খুশিতে ভরা এবং এমনি আপনা হারিয়ে গিয়েছিলাম যে, বাহ্যিক জ্ঞান পর্যন্তও আমার তখন লুপ্ত। কেবল কাগজ-কলমের খস্‌খস্ শব্দ আমার কানে আসছিল।

হঠাৎ মাথায় এল, নাটকের কোন একটা জায়গায় গীর্জার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি করাতে হবে। ভাবটা ভারী ভাল লাগল। লেখা অতি দ্রুত চলল। সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পেলাম। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কি করব ভেবে পেলাম না। ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে আসনেই বসে রইলাম, একদিকে অজানা বিপদের আশঙ্কা, অপর দিকে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক—দুটাই আমায় পেয়ে বসল, আকুল হয়ে কান পেতে রইলাম, তখন পেন্সিলটা আমার হাতে ছিল। আর একটি অক্ষরও লিখতে পারছিলাম না। নীচে থেকে যুগল মূর্তি এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

আমার কৃতকার্যের কৈফিয়ত দিবার পূর্বেই বাড়ীওয়ালি সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, 'ওখানে কে বসে ?'

জবাব দিলাম, 'মাফ কর আমায়...' আর কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না। বাড়ীওয়ালি লাফ দিয়ে দরজার সামনে গিয়ে যতটা গলায় দেয়, চীৎকার ক'রে উঠল, 'এক্ষুনি যদি বেরিয়ে না যাও ত আমি পুলিশ ডাকব।'

উঠে দাঁড়ালাম।

অস্পষ্ট স্বরে বললাম, 'তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যেই

প্রতীক্ষা করছি। ঘরের কিছুই আমি স্পর্শ করি নি, এইখানে চেয়ারে বসেছিলাম মাত্র।'

লোকটা বললে, 'বেশ ত, তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। তাতে আর এমন কি অপরাধ হতে পারে? যাক, ওঁকে একটু থাকতে দাও; উনি—'

ইতিমধ্যেই আমি সিঁড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। এই অতি স্থূলকায় স্ত্রীলোকটার ব্যবহারে হঠাৎ আমি রেগে গেলাম, কেন না, আমাকে তক্ষুনি তাড়াবার জন্যে ও আমার পিছন পিছন এল, মুখের মত জবাব ঠোঁট পর্যন্ত এসেই থেমে গেল। কিন্তু তখনই মনে হ'ল যে, চুপ ক'রে থাকাই ঠিক হবে, বিশেষত, এই নবাগত নাবিক অথিতিটির প্রতিও ত আমায় কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত, তাই চুপ ক'রে রইলাম। ও আমায় অবিশ্রান্ত গালাগালি করতে করতে আমার পিছনে পিছনে এল, প্রতি পদক্ষেপেই আমার রাগ বেড়ে যাচ্ছিল।

আঙিনায় গিয়ে পৌঁছলাম। ধীরে ধীরে পা ফেলছিলাম আর ভাবছিলাম যে, ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে যাওয়া উচিত কি-না। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আপনার মনে প্রতিশোধের জন্যে কঠোরতম গালাগালি আওড়াচ্ছিলাম, এমন জবাব ওকে দিতে হবে যেন তা শুনেই ও আঁতকে ওঠে—পথ চলতে চলতে হঠাৎ কেউ পেটে লাথি খেলে মাথা ঘুরে পড়ে মরে যায়, গাল দিয়ে তেমনই ওকে আহত করতে হবে। ফটকের সামনে একটা লোক বাড়ীতে ঢুকছে। লোকটা সম্মান দেখাবার জন্যে একবার টুপিটা স্পর্শ করলে। এবং বাড়ীওয়ালির কাছে গিয়ে আমার কথা জিজ্ঞাসা করল। শুনলাম, কিন্তু পিছন ফিরে আর চাইলাম না। কয়েক পা যেতেই লোকটা এসে আমার হাতে একখানা লেফাপা দিল। হেলা-ফেলা ভাবে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে লেফাপাখানা ছিঁড়ে ফেললাম—দেখলাম তাতে দশ ক্রোনারের একটা নোট রয়েছে

কিন্তু চিঠি বা একটা অক্ষরও কোথাও লেখা নেই। লোকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কোন্ দিশি মূর্খামি? কার কাছ থেকে চিঠি এনেছ?'

লোকটা জবাবে বলল, 'আমি তা বলতে পারি নে! একটি মহিলা আপনাকে দেবার জন্যে আমায় দিয়েছেন।'

আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। লোকটা চলে গেল।

নোটখানি পুনরায় লেফাপার মধ্যে রাখলাম এবং লেফাপাখানা মুঠোর মধ্যে ডেলা পাকিয়ে ধরলাম; অদূরে ফটকে বাড়ীওয়ালা তখন আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক তার মুখ লক্ষ্য করে নোটের ডেলাটা ছুঁড়ে দিলাম। একটা কথাও বললাম না, এমন কি, একটা শব্দও উচ্চারণ করলাম না,—কেবল একবার পিছন ফিরে দেখলাম, বাড়ীওয়ালি ডেলাটা কুড়িয়ে দেখছে তাতে কি আছে।... হ্যাঁ, অমনই ক'রেই মুখের মত জবাব দিতে হয়, তাতেই আত্মসম্মান বজায় থাকে। একটা কথা নেই, কি দিচ্ছে তা বলা নেই—কাগজের মধ্যে নোট ডেলা ক'রে অত্যাচারী পাওনাদারের মুখের উপর অবলীলাক্রমে ছুঁড়ে দেওয়া! ওর মত পশুকে এমনই ক'রেই শিক্ষা দিতে হয়।...

যখন টমটেগ্যাদেনে পৌছলাম—রাস্তাটা যেন আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল; মাথাটা যেন খালি—ভোঁ ভোঁ করছে, টলতে টলতে সামনেকার বাড়ীর দেয়ালটা ধরে টাল্ সামলালাম। এক পা-ও এগোতে পারছিলাম না, যেন সর্বাঙ্গে খিল ধ'রে গেছে, ওই একই অবস্থায় দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে রইলাম। মনে হ'ল, যেন এখনই জ্ঞান হারাব। এতটা উত্তেজিত হওয়ায়ই ওরূপ দৌর্বল্য দেখা দিয়েছে। জোর ক'রে পা দুটো টেনে তুলে ফুটপাথের উপর ঠুকতে লাগলাম। দেহের জড়তা দূর করবার জন্যে আরও অনেক উপায় অবলম্বন করলাম। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করা, ভ্রূ কুঞ্চিত করা এবং হতাশভাবে চক্ষু ঘুরান—সব

কিছু সনাতন প্রক্রিয়া অবলম্বন করলাম, কিছু কাজও হ'ল। ক্রমে মাথাটা অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এল। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, সর্বনাশের আর বিলম্ব নেই। হাত দুটো প্রসারিত ক'রে দেয়াল থেকে নিজেকে সরাবার জন্যে ধাক্কা দিলাম। তখনও রাস্তাটা যেন আমার চোখের সামনে তাণ্ডব নৃত্য করছিল। রাগে দুঃখে ফোঁপাতে লাগলাম। এবং আমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে কঠোর অন্তরদ্বন্দ্ব শুরু হ'ল। এবং প্রাণপণে নিজেকে চাঙা করতে চেষ্টা করলাম। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি এটা অবশ্য আমার ইচ্ছে নয়; না, তা কিছুতেই হতে পারে না। দাঁড়িয়ে মরব, তবু হাল ছেড়ে দেব না। একটা ছোট টানা-গাড়ী আস্তে আস্তে আসছিল, দেখলাম তাতে প্রচুর আলু রয়েছে; কিন্তু নিছক রাগের বশে ও গোঁড়ামিতে মনে ক'রে বসলাম, ও আলু নয়,—বাঁধা কপি। কি বলছি তা আমার কানে আসছিল এবং জেনেশুনেই যে এ রকম মিথ্যা ভাবছি তার জন্যে নিজেকে গাল দিলাম; আত্ম-নির্যাতন বেশ ভাল ভাবেই হয় এই উদ্দেশ্যে গালাগালি বার বার আবৃত্তি করলাম। আমার সুবিপুল পাপের কথা ভাবতেই আমি ক্ষেপে গেলাম। শূন্যে তিনটি আঙুল ঘুরিয়ে তুড়ি দিয়ে ঈশ্বরের নাম নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে শপথ ক'রে বললাম, ওগুলি সত্যিসত্যিই বাঁধা কপি। এবং মুখের ঘাম মুছে, বার দুই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একরকম জোর ক'রেই শান্ত হলাম। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে, অপরাহ্ন হয়ে আসছে। আবার নিজের অবস্থার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। খিদেটা সতিই ভারী অপমানজনক, একটা বিরাট কলঙ্ক। এদিকে ঘণ্টা কয়েক বাদেই রাত্রি হবে। কাজেই সময় থাকতেই তার প্রতি-কার করা উচিত। যে যাত্রীগৃহ থেকে আমি বিতাড়িত হয়েছি, কেন জানি নে, সেই বাড়ীর দিকেই আমার চিন্তা প্রধাবিত হ'ল। সেখানে ত কোনমতে আর আমি যেতে পারি নে; কিন্তু তবু কি সে গৃহের

কথা না ভেবে পারি! সত্য বলতে কি, স্ত্রীলোকটি যে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে তাতে একটুও অন্যায় সে করে নি, আর সে অধিকারও পূর্ণমাত্রায়ই তার আছে। টাকাপয়সা নিয়মিত দিতে পারব না, অথচ একজন আমার থাকা-খাওয়া যোগাবে—এটা আশা করাই অসঙ্গত। অধিকন্তু, ও আমায় খেতেও ত দিয়েছে; এমন কি কাল রাত্তিরে ওকে বিরক্ত করা সত্ত্বেও ও আমায় খানিকটা রুটি-মাখন দিয়েছিল। আমার খাওয়া হয়নি জেনেই দয়া ক'রে আমায় খেতে দিয়েছিল, এ ওর মহত্ত্ব; সুতরাং ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আমার কিছুই নেই। ওখানে সিঁড়িতে যখন বসেছিলাম, তখন মনে মনেই নিজের অসঙ্গত আচরণের জন্যে ওর কাছে মার্জনা চেয়েছি বার বার। বিশেষত, চলে আসবার মুখে যে ব্যবহারটা করেছি তা দস্তুরমত অকৃতজ্ঞের মত হয়েছে—ওর মুখ লক্ষ্য ক'রে টাকাগুলি ছুঁড়ে দেওয়াটা ত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।...

দশ ক্রোনার। একবার শীস্ দিলাম। যে চিঠিখানা লোকটা এনে দিল, তা কে দিয়েছে? তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত হয়ে গেল এবং তখন বুঝতে পারলাম এর মূল কোথায়। দারুণ দুঃখে লজ্জায় ভারী ম্রিয়মান হয়ে পড়লাম। আপনার মনে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলাম—'ল্যাজালি'! বার কয়েক নামটা আওড়ালাম। এবং একবার পিছন ফিরে তাকালাম। এই কালই না আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম যে, যদি কখন ল্যাজালির সঙ্গে দেখা হয় ত তাকে উপেক্ষা করব এবং যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলব? উপেক্ষা করা চুলায় যাক, তার কৃপার উদ্রেক করিয়ে তার কাছ থেকে হাত পেতে ভিক্ষা গ্রহণ করলাম! না, না, না; অধঃপতনের কি কিছু বাকি রইল! তার সামনেও ত যথোচিত ভব্যতা বজায় রাখতে পারি নি। আমি ডুবছি —কেবল ডুবছিই—চারিদিক থেকেই—যে দিকে ফিরি সেই দিক

দিয়েই অতলের তলে তলিয়ে যাচ্ছি—দেহে মনে প্রাণে—আজ আমি ফতুর, এই অধঃপতন থেকে আর আমার উঠবার শক্তি নেই, আর আমার মুক্তিও নেই—না, কখনও না! এই ত চরম! অজানা অনামা লোকের দান ফিরিয়ে না দিয়ে হাত পেতে তা গ্রহণ করা, ছুটো পয়সা হাতে আসার এতটুকু সম্ভাবনাতেই এই হীন কাঙালপনা—সে অর্থ শুধু গ্রহণ করা নয়, তা আবার জীবিকার জন্যে ব্যয় করা—অথচ এ সবেতেই একদিন আমার আন্তরিক ঘৃণা ছিল—এর চাইতে চরম অধঃপতন আর কি হতে পারে।

আচ্ছা, কোন উপায়ে কি এই দশ ক্রোনার ফিরিয়ে পাওয়া যায় না? বাড়ীওয়ালির কাছে গিয়ে টাকাটা ফেরত চাইলে নিশ্চই সে দেবে না। ভেবে দেখতে হবে, ভেবে চিন্তে একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। যেমন-তেমন ক'রে চেষ্টা করলে তা হবে না—আমার সমগ্র কর্মশক্তি ও সত্তা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে—তবেই না এই দশ ক্রোনার অর্জন করতে পারব। তাই একাগ্রতার সঙ্গে এই সমস্যা-সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে লেগে গেলাম।

হয় ত চারটে বেজেছে। আর কয়ঘণ্টা বাদেই ত থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হতে পারত। এখনও যদি নাটকখানা সম্পূর্ণ করতে পারতাম!

সেখানে ব'সে ছিলাম সেইখানেই পকেট থেকে কাগজপত্র সব বার করলাম, এবং সংকল্প করলাম, বাকি দৃশ্য কয়টা যেমন ক'রে হোক শেষ করবই। ঘর্মাক্ত কলেবরে আগাগোড়া বিষয়টা ভেবে নিলাম এবং যতটা লেখা হয়েছে, সবটা একবার প্রথম থেকে পড়ে নিলাম কিন্তু কোন লাভ হ'ল না। না, ফাঁকি চলবে না! গোঁড়ামি কোন কাজের নয়, বিশেষত এ অবস্থায় গোঁয়ার্তুমি মরণকে ডেকে আনবে। তাই একান্ত মনোযোগের সঙ্গে লিখতে শুরু ক'রে দিলাম—যেমন ক'রে

যত শীঘ্র সম্ভব, আর তা হ'লেই
...ের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে। নিজেকে এই ব'লে লেখায় প্রবর্তিত করলাম যে, এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো উচিত্ হবে না; জেনে শুনেই নিজেকে এই মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত করলাম এবং আমার যেন ভাষার জন্যে এতটুকু ভাবনা নেই, কলমের ডগায় আপনা থেকেই লেখা বার হয়ে আসছিল।

মাঝে মাঝে লিখতে লিখতে আপনার মনে মুগ্ধ হয়ে ব'লে উঠছিলাম, 'চমৎকার!' 'বাঃ, কি সুন্দর!' আর কলম অবিশ্রান্ত চলেছে। আচ্ছা, এখানটায় ত তেমন ভাল শোনাচ্ছে না! প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ত পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন বেশ একটু উগ্র, তেজাল। সন্ন্যাসীর কথোপকথনের সঙ্গে মধ্যযুগের কোন নাম গন্ধও ত খুঁজে পাচ্ছিনে। রেগে পেন্সিলটা দাঁতে কামড়ে ভেঙ্গে ফেললাম, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, লেখা কাগজগুলি দু টুকরা ক'রে ছিড়ে ফেললাম, প্রত্যেকটি পাতা টুকরা টুকরা ক'রে ছিড়লাম, টুপিটা রাস্তার উপর পড়ে গেল, দু পায়ে তা পিষলাম। আপন মনেই চুপি চুপি ব'লে উঠলাম, 'মরলাম! ওগো তোমরা শোন,—আমি মরলাম!' এই কয়টি শব্দ ছাড়া আর একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পরলাম না, কেবল টুপিটা মাড়িয়ে চ্যাপটা করে ফেললাম।

কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে পাহারাওয়ালা আমায় লক্ষ্য করছিল। পাহারাওলাটা মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, ওর লক্ষ্য ছিল আমারই উপর। মাথা তুলতেই আমাদের চারি চোখের মিলন হ'ল। ও হয় ত অনেকক্ষণ থেকেই ওখানে দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য করছে। টুপিটা মাটি থেকে তুলে মাথায় প'রে ওর সামনে গেলাম।

'কটা বেজেছে?' ওকে শুধালাম।

অনুবাদকের কথা

'বুভুক্ষা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালে। অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়, কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে পুনঃপ্রকাশ এতদিন সম্ভব হয় নি।

'বুভুক্ষা' বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ক্নুট হামসুনের 'সুলট্' বা 'হাঙ্গার'-এর অনুবাদ। অনুবাদ-সাহিত্য আমাদের দেশে খুব বেশি সমাদর এর আগে পায় নি। এর মূল কারণ, আমার মনে হয়, অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব কিংবা ভাষা—এ দু-এর একটা ধারাকে অবলম্বন করে। তার ফলে মূল সাহিত্যের সৌরভ ও সজীবতা অনুবাদ-সাহিত্যে বজায় থাকে না। 'বুভুক্ষা'য় ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

'বুভুক্ষা'র পরিচয় সম্পর্কে কোন কথা বলা যে নিষ্প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি নে যে, বর্তমান জগতে আজ যে সমস্যা উদগ্র আগুনের মত জ্বলে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, 'বুভুক্ষা' তারই বাস্তব রূপ। 'বুভুক্ষা'র এই বাস্তবতা কল্পনার বিলাস নয়, মানুষের বুকে যে দুর্বার ক্ষুধা তিলে তিলে জ্বালিয়ে তুলেছে পৃথিবীর শ্মশানে জীবন্তের চিতা, 'বুভুক্ষা' সেই দুর্বার ক্ষুধার নির্মম ইতিহাস।

'বুভুক্ষা' প্রকাশের অধিকার যাঁরা দিয়েছেন, এ সুযোগে তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি—বিশেষ ক'রে শ্রদ্ধাভাজন হামসুন ও তাঁর প্রকাশক কোপেন-হেগেন-এর প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী গিল্‌ডেন্‌ডাল্কে ভোগান্‌ডেল্ নরডিস্ক ফর্‌লাগ-কে।

প্রচ্ছদপট এবারে এঁকেছেন স্নেহাস্পদ আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

১১ই ভাদ্র,
১৩৫১ সাল

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

দশেক ক'রে আমায় সাহায্য করা ওর পক্ষে খুব সহজ নয়। বেচারী গরীব, মেয়েটি সত্যিই আমায় ভালবেসেছে; ··· ব'সে ব'সে এই সবই ভাবতে লাগলাম। ও যে আমায় সত্যি সত্যিই ভালবেসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেচারী!

পাঁচটা বেজে গেছে। আবার স্নায়বিক দৌর্বল্যে আক্রান্ত হলাম। মাথাটা যেন ফাঁপা—শোঁ। শোঁ। শব্দ হতে লাগল। সোজা সামনের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ ক'রে চেয়ে রইলাম। খিদে এইবার আমায় একেবারে নির্মম ভাবে আক্রমণ করল এবং বলা বাহুল্য, ভারী কষ্ট পেতে লাগলাম। সামনের দিকে যখন চেয়ে বসেছিলাম, তখন দূরে একটা মানুষের আকৃতি নজরে এল, ক্রমে সেই আকৃতি স্পষ্ট দেখতে পেলাম এবং তাকে চিনতে পারলাম। সেই ডাক্তারখানার সামনে কেক্-রুটিওয়ালি বুড়ীটা, সেই যাকে একদিন থামকা অনেকগুলি টাকা-পয়সা দিয়েছিলাম। গা মোড়ামুড়ি দিয়ে বেঞ্চির উপর কাত হয়ে ব'সে ভাবছি। হ্যাঁ, সেই বুড়ীই ত ঠিক সেইখানটায় সেই টেবিলখানায় কেক্-বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে! বার কয়েক শীশ্ দিয়ে আঙুল-গুলি মটকালাম এবং আড়মোড়া ভেঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে ডাক্তারখানার দিকে গেলাম। না, বোকামি আর চলবে না! পাপ হবে? কে বললে? তাই ব'লে আমি ঠকতে পারিনে; অত বেশি যে উদারতা দেখাবে তার মরণ নিশ্চয়। ···

একটু তফাৎ থেকে বুড়ীর টেবিলে কি কি আছে দেখে নিলাম, পরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, যেন ওর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে এমনই ভাবে মাথা নেড়ে মৃদু হাসলাম এবং আমি যে আসব এটাও যেন ওর জানা আছে, এই ভাবেই কথাটা পাড়লাম।

'নমস্কার! আমায় চিনতে পারছ না তুমি?'

'না, মনে পড়ছে না ত।' ও ধীরে জবাব দিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আবার মৃদু হাসলাম, ভাবখানা এই যে, এটা যেন ওর একটা ব্যঙ্গ, আমায় চেনে না—এ যেন ওর একটা ভাণ মাত্র। তাই বললাম, 'একদিন না তোমায় গোটা কয়েক টাকা ও কয়েক আনা খুচরা পয়সা দিয়েছিলাম, মনে পড়ে? কিছু না ব'লেই সেদিন দিয়েছিলাম, যতদূর মনে পড়ে কিছুই তোমায় বলি নি; কাউকে কিছু দিতে গিয়ে বলাটা আমি পছন্দ করি নে; ভাল লোকের সঙ্গে যার কারবার, যে নিজে ভাললোক, তার পক্ষে কথায় কথায় সামান্য ব্যাপারে চুক্তিনামা লেখা-পড়া করার দরকার হয় না। হাঃ হাঃ! আমিই একদিন তোমায় টাকা দিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ে?'

'না,—তবে—তবে—সে কি তুমি? হাঁ, হাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে। ...'

সে দানের জন্য সেদিন বুড়ী ধন্যবাদ জানাবার সুযোগও পায় নি, আজ হয় ত এখনই তা জানাবে, তাই তাকে বাধা দিয়ে টেবিলের উপরকার খাবার থেকে কোন্‌টা খেতে পারি তাই দেখতে লাগলাম। বললাম, 'হাঁ, তার বিনিময়ে আমি এখন কিছু কেক নেবো।'

প্রস্তাবে ও যে ঠিক রাজী হ'ল তা মনে হ'ল না।

ফের ওকে বললাম, 'এখন খান কয়েক কেক আমি নেব, একবারেই সবটা নেব না, এই ধর—প্রথম কিস্তি। একদিনে সবটা নিয়ে গিয়ে কি করব, অত ত আর লাগবে না।'

'তুমি সেই টাকার বদলে আজ কেক নিতে চাইছ, না?'

'হাঁ, নেবো বই-কি।'—বলে বিকট হাসি হেসে উঠলাম, যেন আমি যে কেক নিতেই এসেছি তা প্রথমেই ওর বোঝা উচিত ছিল। এই বলেই টেবিল থেকে একখানা কেক তুলে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে দিলাম।

বুড়ীটা দেখতে পেয়ে এমন অঙ্গভঙ্গি করলে যাতে বুঝা যায় যে, ও

ও খনিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর পকেট থেকে ঘড়িটা বার করল কিন্তু ওর দৃষ্টি আমারই দিকে নিবদ্ধ।

'প্রায় চারটে,' ও জবাবে বলল।

'ঠিক,' বললাম, 'প্রায়-চারটেই হবে। তুমি বেশ কাজের লোক, তোমার কথা মনে রাখব।' ব'লেই তার কাছ থেকে চ'লে গেলাম। ও পরমবিস্ময়ে আমার দিকে হা ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ঘড়িটা তখনও ওর হাতে।

রয়্যাল হোটেলের সামনে পৌঁছে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। পাহারাওয়ালাটা তখনও একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে—দৃষ্টি তার আমার দিকেই।

হাঃ, হাঃ! এমনি ক'রেই ওদের মত জানোয়ারের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়! কি চরম মার্জিত নির্লজ্জ দুঃসাহসিকতা। এমনই ক'রেই এই সব জানোয়ারকে বশে আনতে হয়, ধর্মের ভয়—জবর ভয়! ··· একরকম অদ্ভুত তৃপ্তিতে মনটা ভ'রে উঠল, গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইতে শুরু ক'রে দিলাম। প্রতিটি শিরা-উপশিরা দারুণ উত্তেজনায় ফুলে উঠেছে। অথচ কোন রকম ব্যথা বেদনাই অনুভূত হচ্ছিল না, এমন কি, কোন রকম অসুবিধাই যে আমার আছে তাও মনে হচ্ছিল না— সারাটা বাজার ঘুরে বেড়ালাম, শরীর-মন দু-ই বেশ হাল্কা। এক একটা দোকানের সামনে এক একবার দাঁড়াই, আবার ঘুরি। শেষটায় গীর্জার সামনেকার বেঞ্চিটায় বসে পড়লাম। ক্রোনার দশটা ফেরত দেব, কি দেব না, তা নিয়ে কোন ভাবনাই আর তখন ছিল না। একবার যখন তা হাতে এসেছে, তখন আমারই; কাজেই কার কাছ থেকে এল তা ভাববার কোনই সুসঙ্গত কারণ নেই। বিশেষত, টাকাটা যখন আমাকেই পাঠান হয়েছিল, আর যখন আমারও টাকার খুবই প্রয়োজন তখন তা আমাকে গ্রহণ করতেই হবে, যে লোকটা

চিঠিটা নিয়ে এসেছিল তাকে ফেরত দেবার কোনই মানে নেই। ফেরত দেবার কোন দরকারও নেই। কাজেই তা নিয়ে আর মাথা ঘামানও বাহুল্য।

বাজারে লোকজনের যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে তা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলাম এবং বাজে বিষয়ে মনঃসংযোগ ক'রে মনটাকে চাঙা ক'রে তুলতে চাইলাম। কাজে কিন্তু তা হ'ল না; ক্রোনার দশটা তখনও আমায় উদ্‌ব্যস্ত ক'রে রেখেছিল। অবশেষে ঘুষি পাকিয়ে রেগে উঠলাম। টাকাটা ফেরত দিলে ল্যাজালি মর্মাহত হবে। তা হ'লে, কেনই বা তা ফেরত দেব? আমার সব কাজই যে ভাল এটা মনে করবার কোন কারণ নেই। মাথা ঝেঁকে ব'লে ওঠলাম, 'না, ধন্যবাদ!' ব্যাপারটা যে কোন্ দিকে ধাওয়া করছে বুঝতে পারলাম। আবার রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লাম। যখন সুযোগ ছিল তখনও বাসাটা ঠিক রাখতে পারি নি। না; আরও একটু আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা দরকার। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল, না, সামান্য ব্যাপারও আর সইতে আমি রাজী নই, ঢের সয়েছি। তুচ্ছ দশটা ক্রোনার হবে আমার পথের বাধা! অসম্ভব! ··· বাসা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে কেন হঠাৎ রাস্তায় বার করেছি তার জন্যে নিজেকে তীব্র ভাষায় জবাবদিহি করলাম।

আর সব বিষয়ে যা হবার তাই হবে। দশটা ক্রোনার আমি চাই নি, এক মুহূর্তও তা আমার হাতে ছিল না—এমন লোককে দিলাম যার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কখনও আমার দেখাও হয় ত হবে না। আমি এ রকমেরই মানুষ; ঋণ এমনই ক'রেই পরিশোধ ক'রে থাকি, শেষ কপর্দক দিয়েও ঋণ শোধ দিই। ল্যাজালিকে যদি ঠিক ঠিক চিনে থাকি ত এ টাকাটার জন্যে সে কখনও দুঃখ প্রকাশ করবে না, কাজেই রাগের মাথার ব'সে ব'সে কেন লিখছি? আমি ত জানি, মধ্যে মধ্যে ক্রোনার

কেক আমার দিকে ছুঁড়ে দিল এবং দাঁত কিড়মিড় ক'রে আমায় চলে যেতে অনুরোধ করল।

আমি চলে এলাম।

এই বুড়ীর মত অসৎ কেকওয়ালি আর দেখা যায় না।

বাজারের সহস্র লোকজনের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কেকগুলি একে একে খেলাম এবং আপনার মনেই আমাদের দু'জনকার কথাবার্তা, আচরণ সব খতিয়ে দেখলাম; বুড়ীর নির্লজ্জতার কথা বার বার আওড়ালাম, শেষটায় এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছলাম যে, আমার ব্যবহার কোথাও এতটুকু অসঙ্গত হয় নি, আমি নিষ্কলঙ্কই রয়েছি। লোকজনের সামনেই কেকগুলি খেলাম এবং খেতে খেতেই আপনার মনে ও সব বিচার-বিতর্ক করলাম।

একে একে কেকগুলি প্রায় সবই উদরসাৎ হ'ল। কিন্তু তবু আমার ক্ষুধার শান্তি হ'ল না। কি যম ক্ষুধাই না আমার পেয়েছে, দুনিয়া শুদ্ধ সব খাবার খেলেও বুঝি আমার সে বিরাট বুভুক্ষা মেটে না! প্রথমেই একখানা ছোট্ট কেক না খেয়ে বাঁচিয়ে রাস্তার ধারের সেই গরীব ছেলেটিকে দিব ঠিক করেছিলাম,—সেই ছেলেটি যার গায়ে উপর থেকে একটা লোক থুথু দিয়েছিল। কেকগুলি সব খাওয়ার পর সেই ছোট্ট কেকখানা তখন অবশিষ্ট ছিল। ছেলেটির কথা একবারও কিন্তু ভুলি নি, তার সেই করুণ বিমর্ষ কচি মুখখানি সারাক্ষণই আমার মনে জেগে ছিল। এখন গিয়ে কি তাকে সেখানে দেখতে পাব?

কায়ক্লেশে সেইখানটায় গিয়ে পৌছলাম। নাটকের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে যেখানটায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম সেখানটা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে এলাম, দেখলাম আশেপাশে তখনও দু-চার টুকরো কাগজ ইতস্তত পড়ে আছে, যে পাহারাওয়ালাটাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে গিয়েছিলাম তার পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়ির সামনে যেখানটায় বসে ছেলেটি খেলা করছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

দেখলাম ছেলেটা সেখানে নেই! রাস্তায় একজনও নেই—একেবারে ফাঁকা—সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল ছেলেটিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। হ'য় ত সে ঘরে চলে গেছে। কেকখানা মাটিতে রেখে বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে তথ্খুনি সেখান থেকে চলে এলাম এবং আপনার মনে বললাম, ছেলেটি বাইরে বেরিয়ে নিশ্চয় কেকখানা পাবে। বাইরে এসে সর্বাগ্রেই কেকখানা তার নজরে পড়বে।' খুশিতে তৃপ্তিতে আমার চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠল, এই বিশ্বাস নিয়ে চ'লে এলাম যে, ছেলেটি নিশ্চয় কেকখানা পাবে।

আবার বন্দরে এসে পৌছলাম।

তখন আর ক্ষুধার জ্বালা ছিল না, কেবল অতগুলি খাবার খেয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। নতুন ক'রে সব ভাবনা চিন্তা তখন আমায় পেয়ে বসল।

অচ্ছা, একটা জাহাজের নোঙরের কাছি যদি চুপি চুপি কেটে দিই? যদি হঠাৎ 'আগুন, আগুন' ব'লে চেঁচিয়ে উঠি? বন্দরের দিকে আরও খানিটা এগিয়ে গেলাম এবং সামনেই একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স পড়ে আছে দেখে হাতজোড় ক'রে তাতেই ব'সে পড়লাম, এবং মাথাটা যে ঘুরছে, সবকিছুই যে গুলিয়ে আসছে, তা বেশ টের পাচ্ছিলাম। নড়াচড়া না ক'রে ঠায় ব'সে রইলাম, আমার যেন কিছু করবার নেই। সামনেই সেই রুশ-পতাকাধারী জাহাজখানা; সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

রেলিং-এ ভর দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে বেশ সম্ভ্রান্ত কর্মচারী বলেই মনে হ'ল। উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে আলাপ জুড়ে দিলাম। আলাপ করবার অবশ্য কোন বিষয়ই আমার ছিল না এবং ভদ্রলোক যে আমার

কেক-বিস্কুটগুলো আগলাতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে এবং তার জিনিস এমনই ভাবে লুণ্ঠিত হয় এটা সে কখনও আশা করে নি।

'দেবে না, সত্যি দেবে না?' বললাম।' 'আচ্ছা মেয়েমানুষ ত!' ও কি বলতে চায় যে, একজন এসে ওকে খামকা কতকগুলি টাকা-পয়সা দিয়ে যাবে এবং ফিরে আর কখনও সে তা দাবি করবে না! টাকা-পয়সাগুলি অমনিভাবে ওকে ছুঁড়ে দেওয়ায় ও কি তখন এই মনে করেছিল যে, ও-গুলো চুরির পয়সা! না, ও তা মনে করতে পারে না কিছুতেই। ও রকম ভাবে দেওয়াটা সত্যি আমার পক্ষে অন্যায় হয় নি। আমার সে দেওয়াকে 'দান' হিসাবে গ্রহণ করাই ওর পক্ষে সঙ্গত; আর আমার বিশ্বাস, ও তাই গ্রহণ করেছে। না, না, ওর সম্বন্ধে কোন রকম খারাপ ধারণা করা আমার উচিত নয়, ও সত্যি ভাল মেয়ে।

আচ্ছা, তা হ'লে আমিই বা কেন ওকে টাকাগুলি দিতে গেলাম! বুড়ীটা তখন ভারী রেগে গিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু ক'রে দিল। অমনি ভাবে কেন ওকে টাকা দিয়েছিলাম তাই ওকে বললাম, বলায় আড়ম্বর ছিল না মোটেই, কিন্তু জোর ছিল যথেষ্ট। এ আমার স্বভাব, বিশেষত প্রত্যেক মানুষের সততায় আমার আস্থা আছে। কেউ আমার দানের প্রাপ্তিস্বীকার করতে চাইলে তাকে এই বলে নিষেধ ক'রে থাকি, 'না, তোমার আর রসিদ দিতে হবে না। ঈশ্বর ত জানলেন যে আমি দিলাম।'

কিন্তু তবু স্ত্রীলোকটা আমার কথার মর্ম গ্রহণ করতে পারল না। তখন অগত্যা আমায় অন্য উপায় অবলম্বন করতে হ'ল, কেন না, গোলমালটা বেশি পাকতে দেওয়া ঠিক নয়। ও কি জীবনে আর কখনও কারুর কাছ থেকে এমনই ভাবে আগাম টাকা পায় নি! ওকে শুধালাম, যারা আগাম দিতে পারে—এই ধর যেমন বড়লোকেরা, তাদের

ত পয়সার অভাব নেই, ইচ্ছে করলেই ত আগাম দিতে পারে। বেশ, ওর জীবনে সে অভিজ্ঞতার সুযোগ আসেনি বলে আমি তার জন্যে লোকসান সইব! অন্যান্য দেশে এ রকম দস্তুর হামেসা দেখতে পাওয়া যায়। ও হয়ত জীবনে কখনও নিজের জন্মভূমি ছেড়ে আর কোথাও যাবার সুযোগ পয়নি। না!—তবেই বোঝ! ওর ত এ বিষয়ে মতামত দেবার কোনই সঙ্গত অধিকার নেই ··· টেবিল থেকে পর পর আরও খানকয়েক কেক তুলে নিলাম।

ও রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে টেবিলে থেকে আর কিছু যেন না নিই তারই ব্যবস্থা করল। অর্থাৎ আমায় বাধা দিল, এমন কি, আমার হাত থেকে একখানা কেক ছিনিয়েও নিয়ে জায়গা মত রেখে দিল। আমিও ক্ষেপে গেলাম, টেবিলে থাপ্পর মেরে পুলিশ ডাকার ভয় দেখিয়ে বললাম যে, আমি কোন রকম গোলমাল করতে চাই নে।

যে পয়সা জমা আছে তার বিনিময়ে এখন জিনিস নিতে হ'লে ওর ভাঁড়ারের সব কিছুই নিতে হয়, কেন না, বেশ মোটা টাকাই ত সেদিন ওকে আমি দিয়েছিলাম। তা ব'লে সবটাই কিছু আমি নিতে চাইছি নে, এই অর্ধে'ক নিলেই যথেষ্ট, আর ভবিষ্যতে কখনও ওকে বিরক্ত করতে আসব না। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন, ওর মত জীবের সঙ্গে যেন আর কখনও আমার সাক্ষাৎ না হয়। ··· অবশেষে ও কতকগুলি কেক—প্রায় চার-পাঁচখানা হবে,—আমার দিকে ঠেলে দিয়ে সেইগুলি নিয়েই সরে পড়তে মিনতি জানাল। বলা বাহুল্য, তবু ওর লাভ ছাড়া লোকসান এতটুকুও হ'ল না। ও আমায় ঠকাল এইটেই আমি ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলাম। বললাম, 'জান, এ রকম অন্যায়ের শাস্তি আছে! ঈশ্বর করুন, তোমার মত ঠক বদমাশের সারাজীবন কয়েদ হোক!' ও আরও একখানা

১৮৮৮ সাল। 'কোপেনহেগেন পলিটিকান' পত্রের বৃহৎ আপিসের দ্বারে জীর্ণবাস পরিহিত এক যুবক দাঁড়িয়ে। যুবক হয় ত জন্ম থেকেই পথচারী। সর্বাঙ্গে তার পান্থ-জীবনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে—ছেঁড়া জামায়, শুকনো মুখে, তামাটে রঙে, ক্ষুধিত দৃষ্টিতে।

যুবক বার কয়েক ইতস্তত করে অবশেষে আপিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা সম্পাদকের ঘরে গিয়ে উপস্থিত।

সম্পাদক এড্ওয়ার্ড ব্রাণ্ডেস ডেন্মার্কের খবরের কাগজ-জগতের নেতা।

সম্পাদক আপন মনে কাজ করছিলেন।

যুবক ছেঁড়া জামার ভেতর থেকে বার করল একখানি পাণ্ডুলিপি। অসীম সাহসে পাণ্ডুলিপিখানি টেবিলের উপর এগিয়ে দিল।

মুখ না তুলেই, পাণ্ডুলিপির আকার দেখে সম্পাদক তা ফিরিয়ে দিলেন। ফেরাতে গিয়ে দেখলেন—শ্রান্ত যৌবনের একটি রেখা-মূর্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। একেবারে টাটকা ছবি, কালির আঁচড়গুলোও এখনো পরিষ্কার করা হয় নি।

সম্পাদক পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে নিলেন প'ড়ে দেখবেন ব'লে।

পথে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে; শীতের সন্ধ্যা, কুয়াসায় গভীর।

যুবক পথ চলছিল।

কুয়াসার মধ্যে দিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল; কি যেন হারিয়ে ফেলেছে।

রাত্রি তখন গভীর; সে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল একটা বাড়ীর সামনে। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে নিল। ঘরে ঘরে আলো নিবে গেছে। দেখে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে গেল। হামাগুঁড়ি দিয়ে সে ঘরে গিয়ে উঠল। অথচ তারই ঘর, তবে সে ভাড়া দিতে পারে নি।

একটা শীর্ণ মোমবাতির বুকে একটুখানি আলো জলে উঠল। সে আলোয় যুবক দেখল—একখানি ডাকের চিঠি, লেফাপা। লেফাপা

ছিঁড়তেই একখানি দশ-ক্রোনার নোট প'ড়ে গেল। দাতার নাম খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেল—এড্ওয়ার্ড ব্রাণ্ডেস।

সম্পাদক ব্রাণ্ডেস পাণ্ডুলিপিখানি বাড়ী নিয়ে গিয়ে পড়তে বসলেন। পাতা কয়েক পড়তে না পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন,—এ যে নব সূর্যোদয়।

গল্পের নায়ক যেখানে ঘর-ভাড়ার টাকা দিতে না পেরে রাত্রির অন্ধকারে হামাগুঁড়ি দিয়ে চোরের মত নিজের ঘরে ঢুকছে—সেইখানে আসতেই তাঁর মনে হ'ল, হয় ত ঠিক এমনই ক'রেই এ যুবকও আজ রাত্তিরে নিজের ঘরে ফিরবে! তৎক্ষণাৎ যুবকের ঠিকানায় তিনি একখানি দশ-ক্রোনার নোট পাঠিয়ে দিলেন।

সেই রাত্রেই সেই পাণ্ডুলিপি হাতে ক'রে সম্পাদক ব্রাণ্ডেস বিখ্যাত সমালোচক ও প্রকাশক লুণ্ডেগার্ড-এর বাড়ী উপস্থিত হলেন। পাণ্ডুলিপি হাতে দিয়ে বললেন, 'এ শুধু প্রতিভার দান নয়,—মানবাত্মার মর্মন্তুদ কাহিনী। ডস্টয়েভ্স্কির বংশধর।'

বিস্মিত সমালোচক বললেন, 'তাই না কি? কি নাম বইটার?'

'বুভুক্ষা।'

'লেখক?

'ক্নুট হাম্সুন্।'

লুণ্ডেগার্ডের সঙ্গে সেদিন সমগ্র জগতও একটি নতুন নাম শুনতে পেল; এবং স্মরণ ক'রে রাখল চিরদিনের জন্য।

পাঁচই অগ্রহায়ণ

১৩৩৫ সাল

কথার জবাব দেবেন তাও অবশ্য আশা করি নি। বললাম, 'মহাশয়, আপনারা কি আজ রাত্তিরেই জাহাজ ছাড়িবেন ?'

'হাঁ, একটু বাদেই'—ভদ্রলোক জবাব দিলেন। তিনি সুইডিস ভাষায় কথা কইলেন।

'আচ্ছা, আপনাদের কি লোকের দরকার আছে ;'

আমার তখন মনের অবস্থা এরূপ যে, ক্যাপ্টেন কি জবাব দিবে তাতে যেন আমার কিছু আসে যায় না। তবু কিন্তু জবাবের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

'না, লোকের দরকার নেই,' সে জবাব দিল ; 'তবে, একটি ছোক্‌রা পেলে নিতে পারি।'

'ছোক্‌রা !' নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ থেকে চশমাটা খুলে পকেটে রাখলাম। এবং সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডেকের উপর হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম।

পরে বললাম, 'কাজ কিছুই আমি জানি নে, তবে দেখিয়ে দিলে সব কিছুই করতে পারব। আপনারা কোথায় যাবেন ?...'

'আমরা এখন যাব লীথ্‌ এবং সেখান থেকে কয়লা বোঝাই করে কার্ডিজ পৌছাব।'

ভদ্রলোকের দিকে আকুল দৃষ্টি হেনে বিনীতস্বরে বললাম, 'বেশ হবে। যেখানেই হোক, আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি কাজ করতে প্রস্তুত।'

ভদ্রলোক বলল, 'এর আগে কখনও সামুদ্রিক জাহাজে গিয়েছ কোথাও !'

'না, যাই নি ; তা হোক, আমায় যা করতে বলবেন, আমি তাই করব।'

ভদ্রলোক আপনার মনে খানিকক্ষণ কি ভাবলাম।

আমি কিন্তু মনে মনে স্থির ক'রে বসলাম যে, এ যাত্রায়ই আমি ওঁদের সঙ্গে যাব। জাহাজ থেকে আর কিছুতেই নামব না।

শেষটায় আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি অনুমতি করেন? আমি ত আপনাকে বলেইছি যে, যা করতে বলবেন, আমি তাই করব। আমায় যা করতে বলবেন তার চাইতে কিছু বেশি যদি না করতে পারি ত আমার পরম দুর্ভাগ্য। সব কাজেই আপনার সাহায্য করব। আমায় নিয়ে চলুন।'

'বেশ, তাই হোক, একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখা যাক না। যদি না পার, তোমায় ইংলণ্ডেই রেখে আসব।'

'বেশ, তাই হবে'—পরমানন্দে জবাব দিলাম। 'এবং যদি না পোষায় ত ইংলণ্ডেই থেকে যাব'—এই কথা পুনরায় উচ্চারণ করলাম।

ক্যাপ্টেন আমায় কাজে নিযুক্ত করলেন।...

চোখের সামনে ক্রিশ্চিয়ানা শহরটি, তার প্রত্যেকটি গৃহের জানলা স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোয় সুষমামণ্ডিত, শরীর আমার দুর্বল, রুগ্ন, কিন্তু তবুও আমি সেই দিগন্তবিস্তৃত নীল ফিয়র্ডের কোলে দাঁড়িয়ে একবার সোজা হয়ে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে ব'লে উঠলাম—বিদায়! বিদায়!

শেষ